ড. সালমান আল আওদা

মাআলে মুস্তফা

[সিরাতে রাসূলের সুরভিত পাঠ]



অনুবাদ : ফারুক আজম

মাআল মুস্তফা

(সিরাতে রাসূলের সুরভিত পাঠ)

ড. সালমান আল আওদাহ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ নভেম্বর, ২০২০
অনুবাদস্বত্ব : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
প্রচ্ছদ : হাশেম আলী
প্রচ্ছদ ক্যালিওগ্রাফি : নাঈমা তামান্না
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৮২৫৪-৯৪-৩

প্রকাশকের কথা

তামাম দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছে একটি নাম—মুহাম্মাদ ﷺ। কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষের বুকের গহিনে তাঁর বসবাস। লাখো-কোটি দরুদ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর শানে। দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তর থেকে অনুসরণ করছে কোটি মানুষ। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। বর্তমান সময়ের ভাষায় তিনিই পৃথিবীর 'বেস্ট সেলিব্রেটি'।

প্রিয় নবিজির পুরো জীবনটা দুনিয়াবাসীর কাছে উন্মুক্ত বই। তাঁর জীবন-পৃষ্ঠা উলটিয়ে যা ইচ্ছে আমরা পড়তে পারি, শিখতে পারি। প্রতিটি অধ্যায় মণি-মুক্তোয় ভরপুর। এই মহামানবের সমগ্র জীবন আমাদের হিদায়াতের পথ ও পাথেয়।

পৃথিবীর সকল সেলিব্রেটি অন্তত কিছু না কিছু 'একান্ত ব্যক্তিগত' বলে গোপন করে। কিন্তু দেখুন না আমাদের নবিজিকে; সবকিছুই তিনি উন্মুক্ত করেছেন উম্মতের জন্য। নবিজির বহির্জীবন নিয়ে বলেছেন সাহাবিগণ, ঘরের জীবন নিয়ে বলেছেন উম্মুল মুমিনিন। তাঁরা নবিজির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছেন এবং সেগুলো দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। এমনভাবে নবিজিকে রেকর্ড করা হয়েছে, সাড়ে চোদ্দোশো বছর পরেও মনে হয় যেন, তিনি এই তো কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বাবা-মা কিংবা শিক্ষকের চেয়েও নবিজিকে বেশি জানি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের চেয়েও নবিজিকে বেশি উপলব্ধি করতে পারি এবং ভালোবাসি। আমাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু 'উসওয়াতুন হাসানা' প্রিয় নবিজি।

নবিজির জীবন নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশকিছু কাজ হয়েছে, সামনে আরও হবে। গার্ডিয়ান সচেতনভাবেই বাংলা সিরাহ নিয়ে এই কাজটা পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ধরে নিন, সিরাহ সমুদ্রে এটা এক ফোটা পানি মাত্র। সমুদ্রে এক ফোটা পানি ঢেলেছেন বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার, সৌদি আরবের কারাবন্দি মজলুম আলিম ড. সালমান আল আওদা। আমরা দুআ করছি, রাব্বুল আলামিন তাঁকে হিফাজত করুন। এই গ্রন্থ প্রচলিত সিরাহ নয়; নবিজির জীবনের সাথে আমাদের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে ফেরার এক প্রচেষ্টার নাম 'মাআল মুস্তফা'। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক জনাব ফারুক আজম। লেখক, অনুবাদক এবং গ্রন্থটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'মাআল মুস্তফা' গ্রন্থে আমরা নবিজিকে আরেকবার জীবনের সাথে মিলিয়ে নেব, তাঁর জীবন থেকে পাথেয় কুড়িয়ে নেব, ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ নভেম্বর, ২০২০

অনুবাদকের কথা

পৃথিবী তখন ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন। চারদিকে অন্ধকারের কালো থাবা। অন্যায়-উৎপীড়ন, অনিয়ম- অবিচার, জুলুম-অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট সমাজ জীবন। কোথাও কোনো নিয়ম নেই, নেই সুবিচারের নিশ্চয়তা। বাহুবল ও পেশিশক্তি সেখানে শেষ কথা। ক্ষমতার জোর ও প্রতিপত্তির দণ্ডের কাছে ডুকরে কেঁদে উঠে মানবতা। অধিকারহারা মানুষের চাপা আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে যায়। বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অস্ফুট স্বর শোষকের গর্জনের কাছে ক্ষীণ হয়ে আসে। নিষ্ঠুর সমাজ নির্বিকার তাকিয়ে রয়। পাথুরে হৃদয়ে কি আবেগের ঢেউ খেলে? মরুভূমির শূন্য বিয়াবানে কি শীতল জলের ধারা পাওয়া যায়? সেখানে তো কেবল খরখরে শূন্যতা। মরুচারী বেদুইনরাও হয়ে গিয়েছিল মরুভূমির মতোই; ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য আর কঠোর।

মরুচারী বেদুইনরা ছিল স্বেচ্ছাচারী, উন্মাদ। বেপরোয়া বল্গাহীন তাদের জীবনধারা। কথায় কথায় নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া কিংবা সামান্য বিষয় নিয়ে প্রতিপক্ষের মস্তক উঁড়িয়ে দেওয়া ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে বেড়াত যুদ্ধ-হানাহানির অভিশাপ। মৃত্যুকালে পিতা পুত্রকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার, প্রতিশোধ নেওয়ার অসিয়ত করে যেত। এমনই ছিল তাদের প্রতিশোধস্পৃহা, প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষোভ ও রোষ। অবলীলায় নিজের জীবন বিলিয়ে দিত। এমনই বোকা, নির্বোধ ও প্রতারিত ছিল তারা। তাদের এই আত্মঘাতী জীবনাচার দেখে যেকোনো বিবেকবান মানুষের হৃদয় সমবেদনা ও করুণায় ভরে উঠবে। মানুষেরই যদি তাদের দেখে দয়া হয়, তাহলে মানুষের রবের কেমন হবে; যাঁর দয়ার ভান্ডার সমুদ্রের অথই জলরাশির চেয়েও বেশি।

আল্লাহর দয়া হলো। সেই দয়ার প্রস্রবণ ধূলির ধরায় নেমে আসে। আবির্ভাব হয় মহামানবের, রাহমাতাল্লিল আলামিনের।

মরুভূমিতে প্রাণ ফিরে আসে। উষর রুক্ষ পৃথিবী সুফলা হয়ে ওঠে। এ যেন ফুলফোটা পাখিডাকা বসন্তের আগমন! চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। উৎসবের আমেজ শুরু হয়। চারদিকে খুশির ঝিলিক। আমিনার গৃহে এক চাঁদের টুকরো জন্ম নিয়েছে। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবের মনে বাঁধভাঙা উল্লাস। তিনি তড়িঘড়ি করে কাবার পথে পা বাড়ালেন। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁর চাঁদের টুকরো নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ–প্রশংসিত। সবাই এসে জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা আব্দুল মুত্তালিব! আপনি কোনো পূর্বপুরুষের নামে নাতির নাম রাখলেন না কেন?' আব্দুল মুত্তালিবের স্পষ্ট জবাব—'আমার ইচ্ছে—আসমান-জমিনের সবাই আমার নাতির প্রশংসা করুক। সমগ্র জাহান তাঁর প্রশংসায় মুখর হোক। তাই আমার নাতির নাম হবে মুহাম্মদ—প্রশংসিত।

সময় বয়ে চলে। আমিনার গৃহের সেই নবজাতক ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠে। যে-ই তাঁকে দেখে, তাঁর মায়াময় চেহারার মায়ায় পড়ে। তাঁর কোমল আচরণের, অনুপম গুণাবলির প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যায়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীর সংখ্যা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন সবার আস্থা ও ভরসার পাত্র; এমনকী ঘোর শত্রুর কাছেও রাসূল ছিলেন পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। হয়ে উঠলেন পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ—'উসওয়াতুন হাসানা'।

এই মহান বিপ্লবী ও সংস্কারকের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা এবং তার শিক্ষা নিয়েই রচিত হয়েছে 'মাআল মুস্তফা'। এটা কোনো গড়পড়তা সিরাত গ্রন্থ নয়। নবি-জীবনের আদ্যোপান্ত বিবরণও এখানে পাবেন না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতাও এখানে রক্ষা করা হয়নি। কিছুতেই এই বই বাজারের আর দশটা সিরাত গ্রন্থের সাথে মেলে না। এই বই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর আঙ্গিক ও বিন্যাস, মাত্রা ও ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। এই বইয়ে রাসূলের জীবনের নানা দিক, নানা রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনের নানা সংকট, সমাজের নানা টানাপোড়েন, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে। তাই এই গ্রন্থ সাধারণ কোনো নবি-জীবনী তো নয়-ই; বরং রুগ্ণ মানবতার তরে এক মহা পথ্য-প্রেসক্রিপশন; যার সেবন ও অনুসরণে তার সুস্থতা ও আরোগ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবকিছুর মূলেই যেহেতু মানুষের জীবন, সেই জীবনের পরতে পরতে যে বাধা ও বিপত্তি রয়েছে, তার মহৌষধ হলো এই গ্রন্থ। এখানেই শেষ নয়; আরও আছে। মুসলিম বিশ্ব আজ কোন সমস্যায় জর্জরিত, কী তার সমাধান? ফিলিস্তিন সংকটের উত্তোরণ কোন পথে? ইসলামি দল ও মুসলিম শাসকদের সমস্যা কোথায়? মুসলিম স্কলারদের চিন্তার প্রান্তিকতার কারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে দায়ী কে—এন্তার সব বিষয়ের সমাধান খোঁজা হয়েছে সিরাতের শীতল ছায়ায়। এক ধাপ বাড়িয়ে বলতে পারি—মুসলিম জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায়ের বিপর্যয় পর্যন্ত মোটামুটি সব বিষয়কে সিরাতের জ্যোতিতে দেখার এক প্রয়াশই হলো এই গ্রন্থ।

ফারুক আযম
৪ নভেম্বর, ২০২০

সূচিপত্র

ভাসে চোখের তারায় তারায়—এক

নবিজির জীবন : বইয়ের খোলা পাতা

মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়ে নবুয়তের সমাপ্তি করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি।’ সূরা আহজাব : ৪০

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানবতার জন্য আদর্শরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সূরা আহজাব : ২১

এই আয়াত থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়, রাসূল ﷺ-এর জীবন তাঁর চারপাশের সকলের জন্য ছিল বইয়ের খোলা পাতার মতো; বন্ধু ও শত্রু, পুরুষ ও নারী, বড়ো ও ছোটো, কাছের ও দূরের নির্বিশেষে সবার কাছেই তাঁর জীবন ছিল স্পষ্ট, পরিষ্কার। কোথাও কুয়াশার আচ্ছন্নতা নেই; বরং রোদ ঝলমল দিনের মতোই উজ্জ্বল। সবাই তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি জানত; তাঁর ব্যক্তিগত ও সাধারণ ব্যাপারগুলো নিয়েও প্রত্যেকে ওয়াকিবহাল ছিল। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—যা বাইরের মানুষের পক্ষে জানা দুরূহ ছিল, সেগুলোও উম্মুল মুমিনিনরা মানুষের স্বার্থে সবিস্তারে সবার কাছে পৌঁছে দিতেন; বিন্দুবিসর্গও বাদ পড়ত না। অথচ ব্যাপারগুলো ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। তাই আজ আমরা দীর্ঘতর সময় পরও তাঁর অন্দরমহলের খবরগুলো জানি। তাঁর খাওয়া ও পান করার শিষ্টাচার, সফরের ধরন ও ঘরের রুটিন, জাগরণের অবস্থা এবং বিছানায় ঘুমানোর পদ্ধতি; এমনকী তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার কথাও আমাদের কাছে অবিদিত নয়।

মানুষের জীবনের অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার থাকে, থাকে একান্ত কিছু বিষয়—যা আমরা তেমন গুরুত্বের চোখে দেখি না কিংবা তা নিয়ে খুব একটা ভাবিও না। অনেক বড়ো বড়ো মানুষ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনে এমন অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার থাকে—যা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়,

সেসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করি না। আমাদের খুব কাছের মানুষ, খুব কাছের আপনজন, বাবা-মা কিংবা শিক্ষকদের জীবনের ছোটোখাটো ও সাধারণ বিষয়গুলো আমাদের চোখে পড়ে না। এমনকী নিজেদের জীবনেও এমন ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা তেমন একটা আগ্রহী না। আমরা অনেকেই হালকাচালে লঘু মেজাজে অনেক কাজ করি ফেলি। আর সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলি—'আমি তো এত ভেবে করিনি।' আবার অনেক সময় কৃতকর্মটির সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা নিয়ে আড়ষ্টতা বোধ করি। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জীবনের সবকিছু; ছোটো থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ও আমরা সবিস্তারে জানি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর জীবনটা আমরা জানি; তা যেন বইয়ের খোলা পাতা। তাঁর জীবনে কোথাও কোনো খাদ নেই। সর্বাঙ্গ স্বচ্ছ এক অনিন্দ্যসুন্দর জীবন!

সংরক্ষিত জীবনী

মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, রাসূলের জীবন সংরক্ষণের; একেবারেই সবিস্তারে, খুঁটিনাটিসহ। আপনি যখন রাসূলের জীবনীর ওপরে লেখা মৌলিক গ্রন্থগুলো হাতে নেবেন—যেমন : ইমাম তিরমিজির *আশ শামায়েল আল মুহাম্মাদিয়া* এবং আলবানির *মুখতাসারা* ইত্যাদি, অবাক নয়নে দেখবেন—সেখানে তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা আছে। এমনকী সেসব গ্রন্থগুলোতে চুলে ও মাথায় পাক ধরার মতো তুচ্ছ বিষয়েরও যথাযথ বিবরণ আছে। হজরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'আমি নবিজির চুলে ও মাথায় গুণে গুণে চোদ্দোটি শুভ্র চুল পেয়েছি।' মুখতাসারুশ শামায়েল

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

> 'তাঁর মাথায় ও চুলে বিশটিও শুভ্র কেশ নেই।' বুখারি ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৫৯০০

অন্য বর্ণনায় আছে—

> 'যখন আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে তুলে নেন, তখনও বার্ধক্য তাঁর ওপর একেবারে জেঁকে বসেনি। ওফাতের দিন তাঁর চুল ও দাড়ি মিলে ৩০টির বেশি পাকা চুল পাওয়া যায়নি।' কাশফুল মুশকিল ৩/২২২

নবিজির জীবনী এতটাই সংরক্ষিত, তাঁর পাকা দাড়ি ও চুলে সংখ্যাও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে; এমনকী সেই কেশগুলোর অবস্থানও নির্ধারিত আছে!

সিরাতে নববির সবচেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল দিক হলো—এসব সংরক্ষণের নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য নবিজির চরিত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী এক অনুপম রীতিতে সিরাতে নববির সংরক্ষণ করেছেন। এই উম্মাহর আলিম, ইতিহাসবিদগণ সিরাত সংরক্ষণে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছে। আর এই কাজে তাঁরা পূর্ববর্তী সকল জাতিকে পেছনে ফেলেছেন। এই ময়দানে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে অন্য কোনো জাতির তুলনাই চলে না। অন্যান্য জাতি নিজেদের নবি ও রাসূলের ব্যাপারে যা লিখেছে, তা মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর ওপর লিখিত গ্রন্থের তুলনায় অতি নগণ্য!

আপনি যদি কোনো ইহুদিকে মুসা ؑ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, সে বড়োজোর কিছু দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত কথা বলতে পারবে। সে কথার না আছে কোনো ভিত্তি, আর না আছে কোনো বাস্তবতা।

কিন্তু মুসলিম আলিমগণ রাসূলের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য ব্যাপারেও নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনার পরম্পরা অতি নিখুঁত ও নির্ভেজাল; কোথাও কোনো কালিমার লেশ নেই। বর্ণনাকারীদের নামও অতি যত্নে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এমনকী সেই যুগে বর্ণনাকারীদের প্রায় পাঁচ লাখ নাম পাওয়া যায়! অথচ এই মহান আলিমদের কাছে কোনো ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টাইপরাইটার ইত্যাদি উন্নত ছাপার যন্ত্র ছিল না। কিন্তু তাঁদের স্মরণশক্তি ও মুখস্থ করার ক্ষমতা ছিল অভাবনীয়। এমনকী এই স্মরণশক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতাকেও হার মানায়। তাঁদের এই প্রখর স্মরণশক্তি ও অমানুষিক শ্রম ব্যবহৃত হয়েছে রাসূলের সুন্নাহ ও নির্দেশনাকে সংরক্ষণে, তাঁর জীবনীর সুরক্ষায়।

নিষ্কলুষ জীবনী

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে দিয়েছেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ এবং তাঁর ভেতর-বাহিরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করেছেন। 'সিরাত' পড়তে গিয়ে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো—সমগ্র সিরাতই ভালোবাসা ও প্রীতির দিকে আহ্বান করে; এমনকী তাঁর বাহ্যিক রূপও। আপনি যখন নবিজির সমস্ত দেহাবয়ব ও আকৃতির পূর্ণ বর্ণনা পড়বেন, যেমন : তাঁর চুল, বাহ্যিক রূপ, চেহারার সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-অবয়ব ইত্যাদি, তখন আপনার হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রাণ ভরে উঠবে ঈমানি শক্তিতে।

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং মানুষের সঙ্গে লেনদেন ছিল আরও আশ্চর্যের। তাঁর সবকিছুই সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে তোলে। আর তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের আলামত। মুহাম্মাদ-এর নামে সাক্ষ্য দেওয়ার দাবিই হলো—তাঁর প্রতি সত্য ও স্বচ্ছ ভালোবাসা পোষণ করা।

সিরাত পাঠে ভালোবাসার সৃষ্টি

নিঃসন্দেহে সিরাত পাঠ এবং সিরাত গবেষণায় এই ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। বড়োই পরিতাপের বিষয়—যদি দৈনন্দিন তাসবিহ পাঠের মতোই সিরাতের নির্দিষ্ট কোনো অংশ পড়া হতো,

প্রতিদিনের জন্য একটা অংশ নির্ধারিত থাকত, তাহলে রাসূলের সাথে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হতো; শুধুই নামের অনুসরণ হতো না। রাসূলের জীবনের নানা পর্যায় ও পরিবর্তনের সাথে পরিচয় ঘটত, তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হতো। তাঁর দিনাতিপাতের ধরন ও প্রকৃতি, কার্যাবলি ও নানা অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত। আর প্রকৃত ব্যাপার হলো—আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, হৃদয় ও মন তাঁকে অনুসরণের জন্য তত বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

এখনকার সময়ে দেখুন, অনেক মুসলিম যুবক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ইউটিউব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে অনেক তারকা, ক্রীড়াবিদ, অ্যাথলেটদের ‘লাইফস্টাইল’ সম্পর্কে জানে। তাদের সম্পর্কে বেশ ধারণা রাখে এবং তাদের অন্ধভাবে অনুকরণ করে। শুধু অনুকরণই নয়; বরং অনেকে আছে যারা অনুকরণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। এর মূল কারণ হলো—প্রতিনিয়তই তাদের দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা, তাদের জীবন ও জীবনের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।

আজ রক্ষণশীল সমাজে বেড়ে ওঠা, দ্বীনদার পরিবারে জন্ম নেওয়া কোনো তরুণীর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। তার পোশাকে, চুলের বিন্যাসে, কাজের ধরনে, ভাষার ব্যবহারে এবং হাস্যরসিকতায় কথিত ‘মডেল’ ও ‘স্টার’দের অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়। তার স্বপ্নের মানুষ হলো শিল্পী, সিনেমা তারকা কিংবা টেলিভিশনের উপস্থাপিকা। তাদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে তার স্বপ্ন, ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ হচ্ছে। তার পছন্দের মডেলই একমাত্র তার অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে এটাই অধিকাংশ মুসলিম তরুণদের মনের অবস্থা।

কারণ, তার কাছে এর চেয়ে উত্তম আদর্শের সন্ধান জানা নেই। এর চেয়ে আলোকিত প্রদীপ্ত জীবনের মশাল হাতে এগিয়ে আসা কোনো মডেলের খোঁজ নেই। তার টেবিলে পড়ে আছে হাল সময়ের তারকাদের অর্ধনগ্ন ছবিপূর্ণ ম্যাগাজিন। অধুনাকালের ফ্যাশন শো’তে অংশ নেওয়া যুবতিদের কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গি।

তাই এদের কাছে তুলে ধরতে হবে রাসূলের হেরার জ্যোতিতে ভাস্বর দীপ্তিময় জীবন, ওহির আলোয় স্নাত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি। সিরাতের শিক্ষা ও কুরআনের দীক্ষাই পশ্চিমা আকাশ সংস্কৃতির বানে ভেসে যাওয়া তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে। দিশাহীন পথভোলা পথিককে প্রকৃত গন্তব্যের দিশা দিতে পারে।

সিরাতের সাথে প্রজন্মের সম্পর্ক উন্নয়ন

এই প্রজন্মের কাছে আমাদের দায় আছে। তাদের কাছে আমাদের গৌরবময় অতীত এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমুজ্জ্বল জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

আমরা যদি আমাদের সন্তান ও নতুন প্রজন্মের কাছে রাসূলের জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সঠিকরূপে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে তারা সিরাত পাঠের প্রকৃত স্বাদের সন্ধান পাবে। বিকল্প খুঁজতে যাবে না। অলীক, কৃত্রিম সারবত্তাহীন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর পেছনে ছুটে জীবনের অপচয় করবে না।

সিরাতের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত গতি

সিরাতের পাঠকের কাছে একটা ব্যাপার বেশ চোখে পড়বে তা হলো—রাসূলের জীবনের সাদামাটা প্রকৃতি এবং সহজেই ক্ষমার করার বিরল গুণ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘আপনি বলে দিন, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; আর আমি কোনো মিথ্যা দাবিদার নই।’ সূরা সাদ : ৮৬

সিরাতের কোথাও কোনো কৃত্রিমতা, স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং সামান্যতম জটিলতাও দেখা যায় না। কিন্তু আপনি যখন কোনো বড়ো আলিম বা বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনী পড়বেন, অবাক হবেন যে, তাদের জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপার আছে—যা সাধারণের পক্ষে আমল করা দুরূহ। মানুষ যখন সেই সব ব্যাপার পড়তে যায়, তখন নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেকে অসহায় ও দুর্বল মনে হয়। কিন্তু আপনি যখন আল্লাহর রাসূলের সিরাত পড়বেন, তখন অবাক হয়ে দেখবেন—তা আপনার সাধ্যের মধ্যেই আছে। তাঁর অনুসরণ করা আপনার পক্ষে কোনো ব্যাপারই না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক মহান মানুষের জীবনী পড়েছি। যেমন ধরুন, চার ইমামের জীবনী, ইসলামের অন্যান্য বরেণ্য ইমামদের জীবনী, সাহাবা ও তাবেয়িদের জীবনী ইত্যাদি। তাঁদের জীবনী পড়তে গিয়ে একটা অবাক করা বিষয় লক্ষ করলাম, তাঁদের সবার ব্যক্তিত্বের স্তর ও পর্যায় এতটাই ওপরে যে, আমার পক্ষে সেখানে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের ও আমার মধ্যে ব্যবধান বিশাল। তাঁদের অনেক কাজই আমার পক্ষে করা দুরূহ। তাঁদের অনুসরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূলের জীবনী পড়লে মনে হয়, আমার পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। আমি করতে পারব। এটা তো আমার জীবনের সাথে মিলে যায়। মনে হয়, প্রতিটি মানুষের পক্ষেই এমন জীবন গঠন করা সম্ভব। বেশ সহজ ও সাদামাটা জীবন; কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সামাজের নির্দিষ্ট কোনো ঘরানার জীবন নয়।

তাই সুন্দর জীবনের আদর্শ অনুপ্রেরণা হতে পারে আল্লাহর রাসূলের সিরাত; খোদায়ি আলোয় আলোকিত জীবন।

সাধারণের জন্য সিরাত

রাসূল ﷺ-এর জীবনে হাজারো জীবনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লুকিয়ে আছে। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, সংগঠক, যোদ্ধা, সমাজকর্মী, বিচারক, শিক্ষক, বাবা, ভাই, স্বামী ও আদর্শ তরুণ। তাই প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষ নবিজির জীবনে খুঁজে পাবে উত্তম আদর্শ, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

রাসূলের সিরাতে একজন শাসক ন্যায়নীতি ও সুশাসনের উত্তম রূপ খুঁজে পাবে। জনগণের অধিকার ও সম্পদ রক্ষার সবক পাবে। নিপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে দাঁড়ানো এবং তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। প্রতিটি কাজকেই সঠিক পদ্ধতিতে করার উদাহরণ দেখতে পাবে।

রাসূলের সিরাতে একজন আলিম মানুষের কাছে ইলম ও জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে। একজন দায়ি কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে অবিচল থাকতে হয়, সেই শিক্ষাও পাবে। অন্যদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার রীতি ও কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে।

একজন পিতা সিরাতে সন্তানের সাথে মেলামেশার প্রকৃতি ও ধরন জানতে পারবে। তাদের পর্যায় ও পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব হবে। একজন স্বামী সিরাতে স্ত্রীর সাথে আচরণের আদর্শ রীতি খুঁজে পাবে। তেমনিভাবে একজন স্ত্রী রাসূলের সিরাতে, নির্দেশনায়, নারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া উপদেশে স্বামীর সাথে আচরণের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবে। বিপদের সময় শক্ত ও অবিচল থাকার শিক্ষা পাবে।

এভাবে ধনী-নির্ধন, সুস্থ-অসুস্থ, পথিক ও গৃহী, বিজয়ী ও পরাজিত প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আদর্শ নির্দেশনা খুঁজে পাবে। কেউ যদি ঘোর বিপদে পড়ে, তার চারপাশের পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসে, সে-ও নিজের করণীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। আল্লাহর রাসূলের জীবনীতে প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সঠিক ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের শিক্ষা আছে। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্যই সিরাতে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষা ও পথনির্দেশ।

এই উম্মি নবি মহান আল্লাহর অনেক বড়ো এক নিয়ামত ও রহমত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।’ সূরা আম্বিয়া : ১০৭

তিনি শুধুই মুসলমানদের জন্য রহমত ছিলেন না, কোনো নির্দিষ্ট জাতির (যেমন আরব জাতি) জন্য রহমত ছিলেন না; বরং তাঁর আনীত সত্য, হিদায়াত ও আলোক প্রবাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত ও করুণা ছিল। তাঁর করুণাধারায় সিক্ত হয়ে মানুষের রক্তারক্তিতে বিপন্ন পৃথিবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, অর্থহীন রক্তারক্তি বন্ধ হয়েছে।

এই পৃথিবীতে রাসূলের আগমনের ফলে দুর্বল অসহায় মানুষের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। সমগ্র মানবতার স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। সবকিছুই ছিল আল্লাহর রহমত ও করুণা। এই পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতি মহান রবের অশেষ করুণাধারার একটা প্রবাহ হলো—রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব।

সভ্যতার স্থপতি

এই আরব জাতি ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর। লিখতে-পড়তে জানত না। হিসাব করার জ্ঞান ছিল না তাদের। এমন মানুষগুলো ইসলামের পরশে সম্পূর্ণ পালটে যায়। তারা হয়ে উঠে ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতার নির্মাতা। এই সভ্যতা প্রাচীন সব সভ্যতাকে হার মানিয়েছে। সমস্ত সভ্যতার নির্যাস এসে মিশেছে এই সভ্যতায়। ফলে এই সভ্যতা হয়ে উঠেছে অনন্য, তুলনারহিত। সমগ্র মানবগোষ্ঠী অবাক হয়ে দেখেছে, তাদের বিশাল বিশাল বিজয়ী কাফেলা। এই বিজয়গুলো কঠোরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন করে অর্জিত হয়নি; বরং প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে অর্জিত হয়েছে। এই সভ্যতা দেশজয়ের আগে অন্তর জয় করে নিয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন—

‘কল্যাণ, সঠিক পথ, মর্যাদা ও আভিজাত্যের রাসূল
আভিজাত্যের প্রতিটি চরণই শুরু হয় আপনার নাম দিয়ে
আপনার ওই সুন্দর গুণ নিয়ে অনেক ভেবেছি
বারবার আমার হৃদয় বলেছে মুহাম্মাদের নাম শুনেছি।’

সম্পূর্ণ নিরক্ষর অসভ্য একটা জাতি রাসূলের পরশে এসে হয়ে যায় বিশ্ব জয়ের নায়ক। রাসূল নামের পরশপাথরের ছোঁয়ায় তারা হয়ে উঠে সোনার মানুষ—যার কিরণচ্ছটা লেগে জনপদের পর জনপদ আলোকিত হয়েছে।

ভাসে চোখের তারায় তারায়—দুই

সাহায্য করুন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও

কবি বলেন—

'মুহাম্মাদ আপন দাওয়াত দিয়ে পৃথিবীকে মুক্ত করেছে,
তাদের দেখানো পথে আমাদের জন্য রয়েছে শক্তি ও প্রাণ,
তিনি না হলে আবু জাহেলরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেই যেত,
আবস এবং জুবইয়ান গোত্র রক্তের বন্য বয়ে দিত!'[১]

রাসূল ﷺ-এর সিরাতের কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। নেই কোনো গোপনীয় ব্যাপার; বরং রাসূলের সিরাত যেন খোলা গ্রন্থ, সুস্পষ্ট কিতাব। মক্কায় পৌত্তলিক মুশরিকরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল। মদিনায় তাঁর চারপাশে ছিল ইহুদি, মুনাফিক ও পৌত্তলিকরা; বরং সমগ্র আরব উপদ্বীপই ছিল পৌত্তলিকতার বিস্তৃত প্রান্তর, ক্রীড়াভূমি। মক্কার উপকণ্ঠে প্রতিমা স্থাপিত ছিল। শত্রুরা তাঁকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আটছিল! অথচ রাসূল ﷺ তাদের ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের দিন গণক্ষমা ঘোষণা করেন। সারা জীবন যারা তাঁকে হত্যা করতে নানা অপকৌশল এঁটেছিল, তাদের অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন।

নবিজির প্রতি কুরআনের সতর্কবাণী

আপনি রাসূলের ঘরের অবস্থা দেখে অবাক হবেন। কুরআন ঘোষণা করছে—

> 'স্মরণ করুণ! আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাঁকে বলছেন—"আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন।" আপনি অন্তরে যা গোপন করেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। আপনি মানুষের ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা অধিক সংগত।' সূরা আহজাব : ৩৭

১. কবি ওয়ালিদ আল আজমি

মনে করুন আপনার পিতা বা ‘শাইখ’ একটা ভরা মজলিসে আপনার উদ্দেশ্যে বললেন—‘হে অমুক! তুমি এমন কিছু ব্যাপার গোপন করছ, যা আল্লাহ ফাঁস করে দেবেন। তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহকে ভয় করা অধিক সংগত।’ তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? নিশ্চয় কুণ্ঠাবোধ, অস্বস্তি ও চাপা ভয় ঘিরে ধরবে। আপনি ভাববেন, এ কথা বলার উপযুক্ত জায়গা তো এটা নয়। কথাটা তো একান্তে বলা উচিত ছিল।

অথচ এই মহান নবিকে সপ্তম আসমানের ওপর থেকে তাঁর প্রভু আহ্বান করছেন, তাও আবার কুরআনের মাধ্যমে–যার তিলাওয়াত কিয়ামত অবধি চালু থাকবে। আল্লাহ বলছেন—

> ‘আপনি হৃদয়ে যা গোপন করেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিক সংগত।’ সূরা আহজাব : ৩৭

তারপর রাসূল ﷺ যুবক, বৃদ্ধ, নব মুসলিম নির্বিশেষে সকল সাহাবাদের সেই আয়াত পড়ে শোনান। তাঁরা এই আয়াত তিলাওয়াত করবে, নামাজে পড়বে এবং মানুষের কাছে তুলে ধরবে। বিভিন্ন বইয়ে লেখা হবে। মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদিরাও শুনবে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। এত কিছুর পরও নবিজি এতটুকুও বিচলিত হননি। এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। একটিবারের জন্যও ভাবেননি, শত্রুরা এই আয়াত ব্যবহার করে তাঁকে মন্দ বলতে পারে, কুৎসা রটনা করতে পারে, তাঁর শুভ্র-স্বচ্ছ জীবনে কালিমা লেপন করতে পারে।

রাসূলের সিরাত একেবারে খোলামেলা, স্পষ্ট। কোথাও কোনো জটিলতা নেই। তাঁর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীর কিছুই তিনি লুকাননি। আয়িশা رضي الله عنها বলেন—

> ‘যদি রাসূল ﷺ তাঁর ওপর অবতীর্ণ আয়াতের কোনো কিছু গোপন করতে চাইতেন, তবে এই আয়াত গোপন করতেন—“স্মরণ করুণ! আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাঁকে বলছেন–“আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন।” আপনি অন্তরে যা গোপন করেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। আপনি মানুষের ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা অধিক সংগত।’ সূরা আহজাব : ৩৭

এখানেই শেষ নয়। একবার অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নবিজির কাছে এলেন। তিনি নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—‘আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন।’

রাসূল ﷺ তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন তিনি অনেক ব্যস্ত; মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলছেন। তাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের আগমনে একটু বিরক্ত হলেন। কারণ, এই সময় তিনি অন্যদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষে

এই আচরণ সহ্য করা সম্ভব হয়নি। মহান আল্লাহ আসমান থেকে নবিজিকে সতর্ক করলেন। জিবরাইল ﷺ খোদার বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন। মানুষ তা তিলাওয়াত করে, নামাজে পড়ে। উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করে। দূরের ও কাছের মানুষ তা শোনে। অথচ তখন তিনি তুচ্ছ কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন না; দাওয়াতের কাজই করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অন্ধ সাহাবির সঙ্গে নবিজির এই আচরণ মেনে নিতে পারেননি। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে অন্ধ ব্যক্তিটি এলো। আপনি কীভাবে জানবেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তাঁর উপকারে আসত। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। আর যে আপনার নিকট ছুটে এলো, সে ভয় পায়। আপনি তাঁকে উপেক্ষা করলেন।’ সূরা আবাসা : ১-১০

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-এর এই আচরণকে অবজ্ঞা করেছেন, অথচ তা কোনো তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। ছোটোখাটো ব্যাপার হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না; বরং যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন তা দাওয়াতেরই অংশ। অথচ তাঁর প্রভু তাঁকে এই কাজের জন্য সতর্ক করলেন। তাঁকে জানিয়ে দিলেন, সব মানুষই সমান। যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে, নম্রতা নিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং সত্যের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষা করে, সে-ই গুরুত্ব পাওয়ার উপযুক্ত। সেই ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত, তার কথা শোনা উচিত।

এর চেয়ে আরও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, একবার মদিনায় একটা চুরির ঘটনা ঘটল। মানুষ চোরকে নিয়ে নানা কথা বলতে লাগল। কিছু ইহুদির দিকে সন্দেহের তির ছোড়া হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ ছদ্মবেশী মুসলিমদের সন্দেহ করতে লাগল। রাসূল ﷺ এই ছদ্মবেশী মুসলিমদের নির্দোষ প্রমাণ করার প্রতি ঝুঁকেছিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো—

> ‘নিশ্চয় আমি আপনার কাছে সত্যতার সাথে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন—তা অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার করতে পারেন। কিছুতেই বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে তর্কে জড়াবেন না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান; তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা নিজেদের প্রতারিত করে, কিছুতেই তাদের পক্ষ নিয়ে বিবাদে জড়াবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করে না।’ সূরা নিসা : ১০৫, ১০৬, ১০৭

আমরা যদি মদিনায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা বিচার করি, দেখতে পাব—মদিনার সমাজে নানা ধরনের মানুষের বাস। ইহুদি, মুনাফিক, মুমিনসহ আরও অনেকেই একসঙ্গে বাস করে। নানা গোত্রে বিভক্ত মদিনাবাসী। প্রতিটি পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালা সত্যকে আলিঙ্গন করা,

আমানতদারিতা, ধৈর্য ও অবিচলতা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা শেখাচ্ছেন। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-কে সতর্ক করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে। কুরআন জানিয়ে দিচ্ছে, চোর হলো মুসলিম বেশধারী মুনাফিকরা; ইহুদিরা নয়—যাদের দিকে সন্দেহের তির ছোড়া হচ্ছে। এমন স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতাই নবি ﷺ-এর জীবনের সাথে যায়। কারণ, তাঁর জীবন সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের কোথাও কোনো অস্পষ্টতা ও আবিলতা নেই। নিখাদ অনিন্দ্যসুন্দর অনুকরণীয় জীবন।

রাসূলের চুলের বিবরণ

রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বর্ণনা পড়লে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সিরাত গবেষকগণ রাসূল ﷺ-এর শরীর-কাঠামোর বাহ্যিক রূপ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই। এমনকী চুলের বর্ণনাও অতি নিপুণভাবে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এর চুল কোঁকড়ানো ও কুঞ্চিত ছিল না, আবার একেবারে খাড়াও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের ছিল—কোমল ও মোলায়েম। কোনো কোনো সময় লম্বা হতো, তখন একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসত। আবার কখনো ছোটো হতো, তখন কান পর্যন্ত চলে আসত।

নবি ﷺ চুলের যত্ন নিতেন। আয়িশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন—

> 'রাসূল ﷺ যখন চুলে চিরুনি চালাতেন, মনে হতো তাঁর চুলগুলো যেন বালির রাস্তা; কোথাও কোনো উঁচু-নিচু নেই। চিরুনির সাথে সাথে ভাঁজ হয়ে পড়ত।' বায়হাকি : ৩০০

উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ একবার মক্কায় এলেন, তখন তাঁর চুলে চারটি সিঁথি ছিল।' অন্য বর্ণনায় এসেছে—'আমি রাসূল ﷺ-এর মাথায় চারটি বেণি দেখেছি।' তিরমিজি : **১৭৮১**

রাসূলের পবিত্র চেহারার বিবরণ

সিরাত গবেষকগণ নবিজির চেহারার নিঁখুত বর্ণনা দিয়েছেন, কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি। রাসূল ﷺ-এর চেহারা ছিল গোল। তবে একেবারেই গোল ছিল না; বরং অনেকটা পূর্ণ চাঁদের মতো গোল, চাঁদমুখ। চেহারার রং ছিল শুভ্রতার মাঝে লালের মিশেল; দুধে আলতা রং, যেন সূর্যের কিরণ লেগেছে অথবা চাঁদের আলো পড়েছে।

রাসূল ﷺ-এর কপাল ছিল প্রশস্ত। আয়িশা رضي الله عنها বলেন—

> ‘তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দীপ্তিময় কপালের অধিকারী। ঘন চুলের নিচে যখন তাঁর কপালের আভা ফুটে উঠত, ভোরের অরুণোদয়ের সময় বা গোধূলি বেলায় যখন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর কপালখানি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠত, যেন কোনো দোদীপ্যমান বাতি ঝিকমিক করছে। তাঁর দুই চোখ ছিল বড়ো বড়ো ও উজ্জ্বল, যেন সুরমা মাখা। তাঁর নাক খাড়া এবং নাকের মাঝখানটা ছিল একটু উঁচু। দুই গাল ও চোয়াল ছিল হাতের তালুর মতো মসৃণ, শুভ্র ও অবিচল। তাঁর মুখ ছিল মাংসল, দাঁত ছিল সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি। তিনি মেসওয়াক ব্যবহার করতেন, মুখের যত্ন নিতেন। দাড়ি ছিল ঘন, কিন্তু বেশি বড়ো ছিল না; বরং মাঝামাঝি পর্যায়ের ছিল। দাড়িতে তেল ও সুগন্ধি লাগাতেন। সর্বদা পরিপাটি করে বিন্যস্ত করে রাখতেন।’ বায়হাকি : ৫৪৯

রাসূলের শরীরের বিবরণ

রাসূল ﷺ-এর শরীর ছিল মাঝামাঝি আকৃতির। একেবারে বেখাপ্পা লম্বাও ছিলেন না, আবার অতিরিক্ত খাটোও ছিলেন না; মাঝামাঝি পর্যায়ের ছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর পোশাকের বিবরণ

রাসূল ﷺ পোশাক সংশ্লিষ্ট কথা হলো, নবিজি যা পরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, এমন সব কাপড়ই পরতেন। দুর্লভ বিরল কাপড়ের খোঁজ করতেন না। আবার যা আছে তা প্রত্যাখ্যানও করতেন না। রুমি জুব্বা, লুঙ্গি ও পাগড়ি পরতেন, সাথে চাদর গায়ে দিতেন। নবিজি পরিচ্ছন্ন ও উত্তম কাপড় পছন্দ করতেন। কিছুতেই বাড়াবাড়ি করতেন না—যা অহংকারের পর্যায়ে চলে যায়। কাপড় প্রলম্বিত করতেন না; এমন সংস্কৃতির চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিবর্গের সাথে চলতেন।

তিনি বলেন—

> ‘যারা গর্বভরে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন না।’ সহিহ বুখারি : ৫৭৮৩

নবিজির বিনয়

নবি করিম ﷺ কৃত্রিমতা বিবর্জিত এবং অহংকারমুক্ত ব্যক্তিদের কাছে এক অনুপম আদর্শ। নবি ﷺ সাধারণ মানুষের মতোই খেতেন, পান করতেন, কাপড় পরতেন এবং উঠাবসা ও বাহনে আরোহণ করতেন। একদিন তিনি একটা চৌকিতে ঘুমালেন; চৌকির একপাশে কোনো বিছানা ছিল না। তাই খাটের খসখসে স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগে।

তিনি কখনো কখনো মাটিতে বসে পড়তেন। এমনকী কখনো কখনো মাটিতে বসেই খেতেন। চাটাই পেতে বসতেন; তাঁর মধ্যে কোনো আড়ম্বরতা ছিল না।

একদিন আনাস ইবনে মালিকের দাদি মুলাইকা নবিজিকে দাওয়াত দিলেন। নবিজির জন্য খাবারের আয়োজন করলেন। নবিজি গেলেন এবং খাবার খেয়ে তাঁদের বললেন—'এসো, আমি তোমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করব।' আনাস ﵁ বলেন—

> 'আমাদের একটা চাটাই ছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এর রং ফিকে হয়ে কালো হয়ে যায়। আমি তাতে পানি ছিটিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। নবিজি তাতে নামাজে দাঁড়ালেন। আমি ও এক ইয়াতিম বালক তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধারা আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন, তারপর চলে গেলেন।' সহিহ বুখারি : ৩৮০

অথচ রাসূল ﷺ যদি চাইতেন, তাহলে তাঁর জন্য সমগ্র পাহাড় স্বর্ণ ও রৌপ্যে ভরে যেত। কিন্তু তিনি সাদামাটা ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবন বেঁচে নিয়েছেন। সব ধরনের কৃত্রিমতা ও আড়ম্বরতা ত্যাগ করেছেন। মানুষের কাছে যেতে চেয়েছেন। তাদের কাজে শরিক হয়েছে। নিজের কষ্ট চেপে রেখেছেন। সাধ্যের বাইরে কারও ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি।

আবু তালিব : ছায়া ও মায়ার পৃথিবী

খোদায়ি রহস্য

খোদায়ি বিধানের অংশ হিসেবেই নবি ﷺ আবু তালিবের পরশে বড়ো হয়েছেন। আবু তালিব তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, ছায়া দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। ছায়ার মতোই আগলে রেখেছেন। অথচ তিনি স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেননি! এ এক অন্তহীন রহস্য। তিনি যদি মুসলিম হতেন, তাহলে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা হয়তো সম্ভব হতো না। কারণ, মুসলমান হয়ে গেলে আপন গোত্র ও সমাজের কাছে নিজের অবস্থান ফিকে হয়ে যেত। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মে অবিচল থাকার কারণে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা হ্রাস পায়নি—যা নবি ﷺ-এর কাজে লেগেছে। হয়তো কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের এই দিকটা বিবেচনায় নিয়েই কিছু বলতে সাহস পায়নি!

কুরাইশ নেতারা তাঁর কাছে এসে বলল—'এই ছেলে (মুহাম্মাদ ﷺ) তো এমন এমন কথা বলছে, এমন এমন কাজ করছে। আপনি যদি তাঁকে আমাদের হাতে সঁপে দেন, তবে আমরাও আপনাকে তাঁর পরিবর্তে আমাদের কোনো একজন সন্তান দেবো।' তখন তিনি বললেন—'এ তো ভারি অন্যায়-অবিচারের কথা! তোমাদের সন্তান আমি পেলে-পুষে বড়ো করব, ফল ভোগ করবে তোমরা। তার পরিবর্তে আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো এবং তোমরা তাঁকে হত্যা করবে! খোদার শপথ! এটা কিছুতেই হতে পারে না। উটনী যখন আপন সন্তান হারিয়ে ফেলে, মমতাশূন্য হয়ে যায়। সন্তান হারানোর বিরহ সইতে পারে না, অন্যের প্রতি তার আর মমত্ববোধ জাগে না।'

আরেক দিনের কথা। এবারও কুরাইশের নেতারা আবু তালিবের কাছে এলো। তারা বলল—'আবু তালিব! আপনি আমাদের মাঝে বেশ বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি। এ ছাড়াও আপনার একটা আলাদা অবস্থান রয়েছে। কিন্তু তারপরও আমরা আপনার ভাতিজাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। দিন দিন সে আমাদের বিরক্তি বাড়িয়েই চলেছে, জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর সহ্য হচ্ছে না। এবার তাঁর হাত থেকে নিস্তার চাই। তা না হলে হয়তো আমরা তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হব। সে আমাদের প্রভুদের মন্দ বলে, পূর্বপুরুষদের বোকা বলে এবং সর্বোপরি আমাদের ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এখন যদি আপনি চান, আমাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

অন্যথায় দায়মুক্ত হয়ে যান; তাঁর অভিভাবকত্ব থেকে সরে আসুন। এই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমরা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছি। আপনার সাথে ঝামেলায় জড়াতে চাই না। অহেতুক কোন্দল সৃষ্টি করতে চাই না; বরং মুক্তি চাই। তাই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করুন। আমাদের কথা ভেবে দেখবেন এবং সিদ্ধান্ত জানাবেন।'

আবু তালিব রাসূল ﷺ-কে ডাকলেন। কাছে এনে কোমল কণ্ঠে বললেন—'ভাতিজা! তোমার স্বজাতি আমার কাছে এসেছিল। তারা এমন এমন বলেছে। তাদের কথা আমায় আহত করেছে। আমি এখন বুড়িয়ে গেছি। তোমাকে আগলে ধরে বেঁচে আছি। আমার ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না। তোমার স্বজাতির অপছন্দনীয় ব্যাপারগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখো। কারণ, এসব ব্যাপার আমাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে।'

রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন, তিনি চাচার জন্য একটা বিপদ ডেকে এনেছেন। তিনি বিপর্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানোর এবং সাহায্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

জবাবে রাসূল ﷺ বললেন—'চাচা! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রেখে আমাকে এই কাজ ছেড়ে দিতে বলে, আমি মৃত্যু পর্যন্ত ছেড়ে দেবো না। আল্লাহ একদিন এই কাজের পতাকা উড্ডীন করবেনই।' এ কথা বলতে বলতে রাসূল ﷺ-এর দুই গণ্ড বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে চলে যেতে চাইলে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন—'এ দিকে এসো ভাতিজা।' রাসূল ﷺ তাঁর কাছে গেলেন। তখন আবু তালিব বললেন—'ভাতিজা! যাও, আর যা ভালো মনে হয় করো। খোদার কসম! এ দেহে প্রাণ থাকতে কখনোই আমি তোমাকে কোনো শক্তির কাছে সঁপে দেবো না।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে—আবু তালিব বলল, 'তোমার এই চাচাতো ভাইয়েরা মনে করে, তুমি তাদের কষ্ট দিচ্ছো। তাদের বৈঠক ও ইবাদতগৃহে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সুতরাং তাদের থেকে একটু সতর্ক থাকবে। তারা সুযোগ পেলে তোমাকে কষ্ট দিতে পারে।' রাসূল ﷺ এ কথা শুনে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। একটু থেমে আশপাশের লোকজনকে বললেন—'তোমরা কি এই সূর্যকে দেখতে পাচ্ছ?' তারা বলল—'হ্যাঁ।' তিনি বললেন—'তোমাদের প্রস্তাবিত বিষয়গুলো হলো, একটা ছোট্ট পিদিম। পক্ষান্তরে ইসলাম হলো, আকাশের সূর্য। আমি পিদিমের জন্য সূর্য ত্যাগ করব?' তখন আবু তালিব বললেন—'খোদার কসম! ভাতিজা, আমরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব না। সুতরাং তুমি আপন কাজে ফিরে যেতে পারো।'

কিছুদিন পর কুরাইশের সর্দাররা আবার তাঁর কাছে এলো। তিনি তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাফ জানিয়ে দেন, তাঁর পক্ষে কিছুতেই রাসূল ﷺ-কে বারণ করা সম্ভব নয়। এই কথা শুনে তারা রেগে ফেটে পড়ে, হুমকি দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে সবাইকে একত্রিত করার এবং সম্মিলিত মিত্রশক্তি গঠন করার ভয় দেখায়। ঠিক তখনই আবু তালিব সবাইকে অবাক করে দিয়ে জোরালোভাবে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দেন।

আবু তালিব রাসূল ﷺ-এর ওপর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবেই তারা তা করেছিল। উৎপীড়নমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সেই চুক্তিনামা কাবার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। চুক্তিপত্রের বিষয় ছিল—বনু হাশিম ও তাদের অধীনস্থ সকলের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের সাথে কোনো প্রকার বিকিকিনি চলবে না; এমনকী বিয়ে পর্যন্ত করা যাবে না।

এই উৎপীড়নমূলক চুক্তিপত্র ছিল অন্যায় ও জুলুমের সূচনা। এই কৌশলই ইসলামের শত্রুরা যুগে যুগে ব্যবহার করেছে।

কুরাইশ বংশ এই ন্যক্কারজনক কাজ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এর ফলাফল ছিল খুবই ভয়াবহ। বনু হাশিম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁদের কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে শুকনো চামড়া খেতে শুরু করে। কিন্তু কিছুতেই খাওয়া যেত না, পেট মোচড় দিয়ে উঠত। মাথা গুলিয়ে যেত। বমি আসত। তারপরও চোখ-মুখ বন্ধ করে গিলে ফেলত। বনু হাশিমের এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট দেখে কিছু হৃদয়বান মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। তাদের মনুষ্যত্বে আঘাত লাগে। তাঁরা এই অবিবেচক চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে, চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু তা হাতে নিয়ে তাঁরা অবাক হয়ে পড়ে। উইপোকা চুক্তিনামা গিলে খেয়ে ফেলেছে! এই ঘটনা প্রচ্ছন্ন আভাস দেয়—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অন্যায়-অবিচার প্রশ্রয় দেন না।

রাসূল ﷺ-কে সাহায্য করার জন্য আবু তালিব বারবার এগিয়ে এসেছেন। আবু তালিব ও বনু হাশিমের কিছু সুবিবেচক মানুষ নবিজিকে রক্ষায় নির্দ্বিধায় এগিয়ে এসেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, চারপাশ থেকে ছায়া দিয়েছেন। এসবের অনেক অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, রহস্য আছে।

যে তাৎপর্যটা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো—এই মানুষগুলো যদিও ঈমান আনেনি, কিন্তু তাঁদের নির্দিষ্ট একটা অবস্থান ও স্তর আছে। প্রত্যেকেরই রয়েছে আপন আপন স্থান ও অবস্থান। যেমন : আবু তালিবের কথাই ধরি। তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। রাসূল ﷺ তাঁর হিদায়াতের ব্যাপার বেশ আগ্রহী ছিলেন; এমনকী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একেবারে 'মরণকালে' এসেও বলেছেন, 'হে চাচা! আপনি বলুন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আমি তার ওপর ভর করেই কিয়ামতের দিন আপনার হয়ে সুপারিশ করব।' জবাবে আবু তালিব বললেন—'যদি কুরাইশরা আমাকে এই বলে লজ্জা না দিত—একমাত্র ভীতিই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে প্রণোদনা জুগিয়েছে, তবে আমি তা বলে তোমার চোখ জুড়াতাম!'

আবু তালিব মৃত্যুশয্যাতেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত ঈমানের সাথে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি মরতে মরতে বলছিলেন—'আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে মারা গেলাম।'

আবু তালিবের মৃত্যু ইসলামের ওপর হয়নি। তারপরও সমস্ত মুসলিম তাঁর এই মহান কীর্তির কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। যারাই সিরাত লিখেছেন, নবিজীবনের এই অধ্যায় বেশ গুরুত্ব দিয়েই তুলে ধরেছেন। আবু তালিবের অভাবনীয় মহানুভবতা ও উদারতার কথা বর্ণনা করেছেন;

বরং কুরআনই তাঁর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা বলেছে। কিন্তু সেই ভালোবাসা দ্বীনের স্বার্থে ছিল না। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো, তাঁকে হিদায়াত দিতে পারো না।' সূরা ক্বাসাস : ৫৬

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ আবু তালিবকে ভালোবাসতেন। তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন ছিল, তিনি তাঁকে হিদায়াতের পথে আনতে চেয়েছিলেন।

এ থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়, তা হলো—অনেক অমুসলিমের ইসলামের প্রতি অনুরাগ জন্মে, ইসলাম গ্রহণ করতে মন চায়, কিন্তু তাদের নিজেদের কিছু দায় থাকে। আপন কাজ ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান থাকতে হয়। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না—এই ব্যাপারটাও আমাদের মাথায় রাখা উচিত। অথচ কাফিরদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো—

> 'যারা কুফুরি করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তিনি তাদের আমল নষ্ট করে দেন।' সূরা মুহাম্মাদ : ১

এরা কুফুরি করার পাশাপাশি আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছে। এতে তাদের কুফুরি দ্বিগুণ হয়েছে। কুরআনে এমনও ইরশাদ হয়েছে—

> 'যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আমি তাদের শাস্তির ওপর শাস্তি দেবো।' সূরা নাহল : ৮৮

কারণ, এই প্রকারের কাফিররাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং অহেতুক যুদ্ধ করে।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সব কাফির এক নয়। কাফিরদের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণি আছে। এজন্যই এই মানুষগুলোর সাথে আচরণে ও চলাফেরায় আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। তাদের সাথে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে লেনদেন করা উচিত। কারণ, একমাত্র আমাদের উত্তম আচরণ ও অনুপম গুণাবলিই তাদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। হয়তো আজ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, গতকাল সে এই ব্যাপারে চিন্তা করছিল। এক মাস আগে পড়েছে। বছরখানেক আগে শুনেছে আর ইসলামকে জানতে চেষ্টা চালিয়েছে। সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। তারপর আলোর এই দিগন্তে এসে শামিল হয়েছে। আলোর কাফেলায় সমবেত হয়েছে। হতে পারে আপনি যে অমুসলিমের মুখোমুখি হচ্ছেন, সে এই দ্বীনের পথে অনেক দূর হেঁটেছে। এই জন্য আমাদের উচিত হলো—আল্লাহর পথে অন্তরায় না হওয়া; বরং আমরা এমন মানুষ হব, যাদের উত্তম আচরণ ও উন্নত আদর্শে মানুষ এই দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হবে। আর এ কথাও মনে রাখা উচিত, কাফিররাই দাওয়াতের ক্ষেত্র, উর্বর ভূমি।

দহনকাল

প্রেম ও বিরহ

নবুয়তের দশম বছর। চাচা আবু তালিব হঠাৎ করেই মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে রাসূল ﷺ ভেঙে পড়েন, মর্মাহত হন। তাঁর প্রিয় চাচা ঈমান নিয়ে মরতে পারেননি, ব্যাপারটা তাঁর চিন্তাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমনকী একপর্যায়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়—

> ‘আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাঁকে আপনি হিদায়াত দিতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, তাঁকে হিদায়াত দিতে পারেন।’ সূরা ক্বাসাস : ৫৬

রাসূল ﷺ আবু তালিবকে ভালোবাসতেন। তাই তাঁর হিদায়াতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর ব্যাকুলতা ছিল অনেক বেশি। তাঁকে ঘিরে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা চাননি। খোদায়ি প্রজ্ঞা বোঝার সাধ্য কার? তাই আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দিলেন। কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

রাসূল ﷺ তাঁর চাচার মৃত্যুতে খুবই ব্যথিত হন। অথচ তাঁর চাচা ঈমান আনেননি। নবুয়ত স্বীকার করেননি, তারপরও চাচার মৃত্যুতে তাঁর ভেঙে পড়ার কিছু কারণ আছে।

প্রথম : রাসূল ﷺ-কে তাঁর চাচা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়েছেন। মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কুরাইশের দুঃসাহস বেড়ে যায়। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করেনি।

দ্বিতীয় : চাচা কুফুরি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, ঈমান নিয়ে নয়। কুফুরি এই দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবতাবোধকে অস্বীকার করে। আর ইসলাম মানুষের মানবিক গুণাবলিকে অস্বীকার তো করেই না; বরং তার ভিত আরও শক্ত করে এবং মার্জিত করে। এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায় একটা ঘটনায়। নবি ﷺ বলেছেন—

> ‘একজন মহিলা একটা কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে গেলেন। আবার অন্যদিকে অন্য একজন মহিলা একটা বিড়ালকে বন্দি রাখার কারণে জাহান্নামে যায়।’ সহিহ বুখারি : ৭৪৫

এই ঘটনা থেকে আমরা একটা ব্যাপার বুঝতে পারি, প্রতিটি জীবের প্রতি উত্তম আচরণের প্রতিদান আছে। সুতরাং ইসলামের এই শিক্ষা যেন আমরা বিস্মৃত হয়ে না পড়ি। কিছুতেই যেন অমানবিক ও নিষ্ঠুর না হই।

তাই নবিজি তাঁর চাচার মৃত্যুতে ব্যথিত হন। কারণ, ইসলাম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার কথা বলে।

ইসলামে উন্নত মূল্যবোধ

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের রীতি ও কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার। দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধের কথা তুলে ধরতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিটি মানুষ জানবে, ইসলামের মূল ভিত্তিই মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি, জলে ও স্থলে তাদের চলার বাহন দিয়েছি, উত্তম রিজিক দিয়েছি এবং যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের মধ্যে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' সূরা বনি ইসরাইল : ৭০

মাক্কি জীবনে কুরআনের সম্বোধন ছিল—'ওহে মানুষ'। তারপর মাদানি জীবনে সম্বোধনে পরিবর্তন আসে। তখন হয়ে যায়—'হে ঈমানদারগণ'। ইরশাদ হয়েছে—

> 'হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে জানার সুযোগ পাও। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো—যে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান।' সূরা হুজুরাত : ১৩

কুরআনের এই শিক্ষা যেন আমরা কিছুতেই ভুলে না যাই।

খুবাইব ইবনে আদির কথা নিশ্চয় মনে আছে। মৃত্যুর মুখে দৃঢ় ও অবিচল খুবাইব। মক্কার এক সংকীর্ণ কক্ষে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের সামনে হত্যা করা হবে। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো বিকার নেই; নেই কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। একটু আগে ক্ষৌরকর্ম সেরেছেন, যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তাঁর হাতে এখনও সেই ক্ষুর। এমন সময় তাঁর কক্ষে একটি বাচ্চা আসে। যারা তাঁর হত্যার আয়োজন করছে, তাদের বাচ্চা। তিনি শিশুটিকে আদর করলেন। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে শিশুটিকে হত্যা করতে যাননি! এই ছিল শত্রুদের সাথে মুসলমানদের আচরণ। তাই আমরা যেন কিছুতেই শত্রুতার বশে অন্ধ হয়ে না যাই। প্রতিশোধপরায়ণতা যেন আমাদের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে না দেয়।

নবুয়তের এই বছরটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটা 'আমুল হুজন' তথা দুঃখের বছর, দহনকাল নামে পরিচিত। এই বছরের নানা ঘটনা মুসলমাদের মানবিক হতে শেখায়। শক্রুদের সাথে আচরণের উত্তম রীতি ও পন্থা শেখায়। অন্যের জন্য—এমনকী সে ঘোর শত্রু হলেও—চিন্তিত হতে শেখায়। কেউ যদি ঈমানের সাথে মরতে না পারে, তার জন্য ব্যথাতুর হতে শেখায়। ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে মুসলিমরা যেন কিছুতেই বিস্মৃত না হয়।

তায়েফের দিন

ভয়াবহ বিপদ

একদিন রাসূল ﷺ আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘরে গেলেন। তাঁর সাথে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধুর গল্প। ফেলে আসা পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করলেন। আয়িশা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-কে বদর, উহুদ ও আরও নানা যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করে বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উহুদের দিন তো বেশ বিভীষিকাময় ছিল। অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, আবার অনেকে ঘোরতর আহত হয়েছে। এমনকী যুদ্ধের একপর্যায়ে আপনার চেহারা ফেটে যায়, রক্ত বের হয়, আপনার সামনের পাটির দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। আচ্ছা, এর চেয়েও ভয়াবহ কোনো দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল?' জবাবে নবিজি ﷺ বললেন–'হ্যাঁ, এসেছিল। আয়িশা! তোমার জাতির অকথ্য নির্যাতন তো আমি সহ্য করেছি, কিন্তু সবচেয়ে নিদারুণ কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল "আকাবা"র দিন। আমি বনু সাকিফের তিনজন ব্যক্তির কাছে আমার বক্তব্য পেশ করছিলাম। এরা ছিল আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলাল, আমর ইবনে উমরের ছেলে মাসউদ ও হাবিব।'

এই তিন ব্যক্তি ছিল বনু সাকিফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রাসূল ﷺ তাদের সাথে বসে আলাপ করেন। তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসার আবেদন করেন। জবাবে তাদের একজন বলল—'খোদা কি অন্য কাউকে পাননি, যে তোমাকে পাঠিয়েছে?' অন্য একজন বলল—'তোমাকে যদি আল্লাহ পাঠিয়ে থাকে, আমি কাবা ঘরে আস্ত একটা গিলাফ দেবো।' তৃতীয়জন বলল—'আমি কখনোই তোমার সাথে কথা বলব না। যদি তুমি রাসূল হয়ে থাকো, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলা আরও বিপজ্জনক।' রাসূল ﷺ তাদের কথা শুনে মর্মাহত হন। বিষণ্ন মন নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।

রাসূল ﷺ আয়িশা رضي الله عنها-কে বলেন—'আমি বিষণ্ন মন নিয়ে চলে এলাম।' রাসূল ﷺ-এর এই বিষণ্নতা কিংবা দুশ্চিন্তা বৈষয়িক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিল না। তাঁর একমাত্র উৎকণ্ঠা ছিল দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ নিয়ে, মানুষের দ্বীনি দাওয়াত গ্রহণ করা নিয়ে। এটাই প্রকৃত নিষ্ঠাবান দায়ির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ যেমনটা বলেছেন—

‘তারা যদি এই কথার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে হয়তো আপনি তাদের জন্য অতিরিক্ত আফসোস করে করে নিজেকে শেষ করে দেবেন।’ সূরা কাহফ : ৬

নবি ﷺ উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলছেন। তাঁর মধ্যে একধরনের ঘোর কাজ করছে। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে; এমনকী তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে মিশে গিয়েছে। ‘ক্বরনুল সাআলিব’-এ গিয়ে তাঁর চিন্তা শেষ হয়, ঘোর কাটে। তাঁর ঘোর কাটার উপলক্ষ্য ছিল জিবরাইলের আগমন। জিবরাইলের আগমনের সময় আকাশে একখণ্ড মেঘের দেখা মিলত। জিবরাইল সালাম দিয়ে বলেন—‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে হওয়া আপনার জাতির আলাপ শুনেছে। তাদের প্রতিউত্তরও শুনেছে। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন; তাদেন ব্যাপারে যা মন চায় আদেশ করুন।’ তিনি বললেন—‘আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা ডাকলেন এবং সালাম করে বললেন—“হে মুহাম্মাদ ﷺ! আল্লাহ আপনার ও আপনার স্বজাতির মাঝে হওয়া আলাপ শুনেছেন। আমি পাহাড়ের কর্তৃত্বের অধিকারী ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন; যা আপনার মন চায় আদেশ করুন। আপনি যদি চান, আমি তাদের এই দুই পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।’

এই ঘটনা থেকে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হলো—দ্বীনের বিরোধিতা শুধুই এই ছোট্ট দলটা করেনি; বরং রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার, মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং তাঁর সাথে হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করার ঘটনা অনেক দীর্ঘ।

সুতরাং এই সংস্কৃতি নতুন নয়। দ্বীনের পথে রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। দাওয়াতের শাশ্বত সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে সব ধরনের ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে। নবি ﷺ-কে অতি কুৎসিত ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, কষ্ট দেওয়া হয়েছে। অথচ আরবদের মাঝে অন্যের প্রতি দুরাচার করার সংস্কৃতি ছিল না। আরব জাতি ছিল উদারতা ও অনুপম গুণাবলির জন্য বিখ্যাত। অথচ তারা ইসলামের ঘোর বিরোধিতা করেছে। সাহাবারা যখন হাবশাতে হিজরত করলেন, তখন কুরাইশরা তাঁদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠাল। সেখানে তারা নবি ﷺ ও সাহাবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাল। হাবশার বাদশার কাছে গিয়ে আবেদন করল, তিনি যেন এদের তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বের করে দেন। আপন দেশে পাঠিয়ে দেন। তারাই এদের ব্যাপার দেখবে। তারাই এদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।

দীর্ঘশ্বাস

পাহাড়ের কর্তৃত্বের অধিকারী ফেরেশতা রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করল, মক্কাবাসীকে দুই পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার। রাসূল ﷺ বললেন—‘বরং আমি আশায় আছি, তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে আল্লাহ এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন—যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।

তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবে না।' এই ছিল নবিজির দৃষ্টিভঙ্গি, সুদূর প্রসারিত ও সুবিস্তৃত। কারণ, তিনি কাজের পরিণতি ও ঘটনার ফলাফল জানতেন। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হবে, তাদের শিক্ষা দেওয়ার এই তো মোক্ষম সুযোগ! এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। আমাদের কাউকে যদি এমন পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব দেওয়া হতো, আমরা খুশিতে লাফ দিয়ে উঠতাম। বেশ জুতসই প্রস্তাব তো! বাপধনকে এবার আসল মজা দেখাব। বলতাম, তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও! এই হলো সাধারণ গড়পড়তা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ, তারা নবিজি ﷺ-এর মতো করে কোনো ব্যাপারের বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা দেখতে পায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গিও পেছনে কয়েকটা ব্যাপার কাজ করে—

প্রথম : এই জাতিটা হলো মুশরিক ও পৌত্তলিক জাতি। আল্লাহর পবিত্র ঘরেই আল্লাহর সাথে শরিক করে। কাবা ঘরেই ঢুকিয়েছে ৩৬০টি মূর্তি। সকাল-সন্ধ্যা মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়।

দ্বিতীয় : এই জাতির মত ও অবস্থানের বিরুদ্ধে শক্ত ও দৃঢ় প্রমাণ আছে। রাসূল ﷺ তাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তারা তাঁর সত্যতা, আমানতদারিতা ও বংশ-পরিচয় জানে। তাঁর অবস্থান ও মান-মর্যাদাও জানা। এতদ্সত্ত্বেও তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

তৃতীয় : তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং প্রত্যেক জায়গায় তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ : তারা বিভিন্ন আরব গোত্রকে ইসলামের পথে আসতে বাধা দিয়েছে। বিভিন্ন মৌসুমে যেমন : হজ ও মেলার সময় রাসূল ﷺ বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজের দাওয়াত তুলে ধরতেন। রাসূলের দাওয়াত শুনে তারা নিজেদের মধ্যে চিন্তা-বিনিময় করত, শলা-পরামর্শ করত। অনেকে বলত—'সে যা বলে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর স্বজাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত। আর তারাই তো আরবদের সর্দার, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এখন যে লোকের প্রতি তারা ঈমান আনেনি, তাঁর ওপর আমরা কী করে ঈমান আনব? তাদের অতিক্রম করে কিছু করা ঠিক হবে? এ তো আমাদের জন্য সমীচীন নয়। আর তা ছাড়া আমাদের দীর্ঘদিনের প্রচলিত লোকাচার ও পরম্পরাও সে কথা বলে না। হয়তো একসময় মিথ্যাবাদীদের পরিসমাপ্তি ঘটবে, প্রতিবন্ধকতা দূর হবে, তখন মানুষ দলে দলে দাওয়াত গ্রহণ করতে শুরু করবে!'

পঞ্চম : ভূমিকম্প, মাটি-ধস কিংবা দুই পাহাড়ের সাথে মিশিয়ে দিয়ে এই লোকগুলোর মৃত্যু একটা দারুণ রোমাঞ্চের সৃষ্টি করবে। বেশ চমকপ্রদ একটা গল্প ও দারুণ ঘটনার সৃষ্টি করবে। তখন দূরের ও কাছের লোকেরা বলবে—'তিনি যদি নবি না হতেন, তাহলে এটা কিছুতেই হতো না। আল্লাহর তাঁকে সাহায্য করেছেন। তাঁর শত্রুদের গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।' এতে হয়তো লোকেরা দ্রুতই ইসলামের পথে আসত!

এটাই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরল মতামত। কিন্তু আমরা যদি রাসূল ﷺ-এর বিষাদমাখা প্রতিউত্তর দেখি—যেখানে তিনি বলেন—'বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের উত্তরপুরুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন, যে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।' তবে আমরা তাঁর দৃষ্টির গভীরতা আঁচ করতে পারি।

অমূল্য পাঠ

এই ঘটনার কিছু ইঙ্গিত

প্রথম : স্বজাতির হিদায়াতের জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রচণ্ড ব্যাকুলতা ছিল। যদিও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তবুও তিনি আশাবাদী ছিলেন—তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

দ্বিতীয় : রাসূল ﷺ কিছুতেই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাননি; বরং চেয়েছেন আল্লাহ যেন তাদের সুযোগ দেন। এতে রাসূল ﷺ-এর উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য নবিদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। কারণ, অনেক নবিই আপন জাতির ওপর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। স্বজাতির জন্য শাস্তি ডেকে এনেছিলেন। যেমনটা নুহ عليه السلام-এর ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নুহ عليه السلام-এর ঘটনা বর্ণনা করেন—

> 'নুহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই কাফিরদের মধ্যে হতে কোনো বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না।' সূরা নুহ : ২৬

তৃতীয় : রাসূল ﷺ-এর রিসালাহ ও নবুয়তের ভিত্তি ছিল রহমত। তাই তিনি জাতির প্রতি দয়ার্দ্র ছিলেন। তাদের মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তারা শিরক ও কুফুরি নিয়ে মরবে—তা তিনি মেনে নিতে পারেননি।

চতুর্থ : এতে রাসূল ﷺ-এর অবিচলতা ও পাহাড়সম দৃঢ়তার প্রতি আভাস পাওয়া যায়। বিপদে ও কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা রাসূল ﷺ-এর প্রকৃতিতে মিশে গেছে। তাই শত তিক্ততা, লাগাতার যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অবিরাম কষ্টের প্রবাহ তাঁকে টলাতে পারেনি। আমাদের ওপর যদি এই কষ্টের ছিটেফোঁটাও নেমে আসত, তাহলে আমরা নিয়ন্ত্রণহীন হতবিহ্বল হয়ে পড়তাম। বিরক্তি চলে আসত। আশাহীন হতাম। সবকিছুই ধ্বংস হওয়ার কামনা করতাম। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর মাঝে আশ্চর্য এক স্থিরতা ও অভাবনীয় মৌনতা ছিল। এমনকী কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন অবিচল-অনড়। ভয়াবহ বিপদের মুখেও পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতেন।

পঞ্চম : রাসূল ﷺ-এর জবাব ছিল—'বরং আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন, যে আল্লাহর ইবাদত করবে।' নবিজির এই কথায় এই দ্বীনের প্রকৃতি ঠিক করে দেয়। এই দ্বীনের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো—বিবেকের পরিমিতিবোধ এবং নির্বাচনের স্বাধীনতা। এই মানুষগুলো একসময় কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ে। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর হয়ে যায়, বলয় ভেঙে পড়ে। তখন তাদের ঘোর কেটে যায়। ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হয়। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আমি অচিরেই তাদের মাঝে এবং দিগন্তে দিগন্তে আমার নিদর্শন দেখাব, যেন তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।' সূরা ফুসসিলাত : ৫৩

তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তাদের কেউ নবিজিকে হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, আবার কেউ তাঁকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

বরং কুরাইশের অনেক দুর্ধর্ষ বীর যেমন : খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান প্রমুখ যারা একসময় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তার দাওয়াতি মিশন প্রতিহত করেছিল, তাঁরা আজ ইসলামের সর্দার, নেতা, আলিম, ইমাম। আল্লাহ তাঁদের মধ্যে কল্যাণ ও সুসময় এনেছেন। তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্যে নয়; বরং তাঁদের মধ্য থেকেই তৈরি হয়েছে ইসলামের বীর সেনানী। ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কারণ, রাসূল ﷺ দলিল ও প্রমাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো ও স্থায়ী নিদর্শন হলো আল কুরআন। কুরআনই রাসূল ﷺ-এর সত্যতা, তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার বড়ো দলিল। তাতে এমন অনেক আয়াত ও মুজিজা রয়েছে, যার প্রতি মানুষ অভিভূত হয়, ঈমান আনে। কুরআনের এই মুজিজা কেবল রাসূল ﷺ-এর জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়; বরং চিরস্থায়ী ও চিরভাস্বর। তাই রাসূলপরবর্তী প্রজন্মও এই মুজিজার অলৌকিকতায় মুগ্ধ হয়েছে; ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

দেশ নয়; হৃদয় জয়

হ্যাঁ, রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের ধৈর্য ও অবিচলতা ছিল পাহাড়সম। সেই ধৈর্যের ফল পেতে দেরি হয়নি; আল্লাহ তাঁদের বিজয় দিয়েছেন। নবিজি মৃত্যুর আগেই বিজয়গাঁথা দেখেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এসেছে এবং আপনি মানুষদের দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখেছেন। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা করুন এবং ইসতেগফার করুন। নিশ্চয় তিনি অধিক তওবা কবুলকারী।' সূরা নাসর : ১-৩

এটা নিছক কোনো সাধারণ বিজয় নয়। নয় শুধুই পরাশক্তির দমন কিংবা তাদের কর্তৃত্বের অবসান; বরং তা কুরআনের আয়াত ও দলিলের সত্যতা ও অকাট্যতার প্রমাণ। আর খোদায়ি বিজয় এবং সাধারণ সম্রাটদের বিজয়ের তফাত কিন্তু এখানেই। খোদায়ি বিজয়ে কোনো প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন থাকে না। শত্রুতা ও প্রতিহিংসার চর্চা থাকে না। সম্রাটের বিজয়ে থাকে সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব উপার্জনের মোহ, প্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'সেই আখিরাতের গৃহ আমি তাদেরই দেবো, যারা পৃথিবীতে প্রতিপত্তি চায় না, বিশৃঙ্খলা চায় না। আর উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকিদেরই হবে।' সূরা ক্বসাস : ৮৩

ইসরা ও মিরাজ

বড়ো নিদর্শন

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তিনি পবিত্র ও মহিমাময়; যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় সফর করিয়েছেন, যার চারপাশ বরকতময়; তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।’ সূরা ইসরা : ১

রাসূল ﷺ-এর মক্কার জীবন ছিল খুবই ভয়াবহ ও দুর্যোগপূর্ণ। নির্যাতন, নিপীড়ন, চারপাশের মানুষের মিথ্যা অপবাদ ও অবাধ্যতা তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। চিন্তায়, কষ্টে ও মানসিক যাতনায় নবিজি ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তাঁর পাশে ছিলেন। চারপাশ থেকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখতেন তাঁকে। তারই সূত্র ধরে আসে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবির প্রতি বিরাট পুরস্কার।

কুরআনে ইসরার স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত আয়াতে তার বর্ণনা এসেছে। ‘ইসরা’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ—রাতে হাঁটাচলা করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সফর করান, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সফরের সময় পরিধি ছিল কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কালের ইতিহাসের সামান্য অংশ মাত্র। কিন্তু তা ছিল খোদায়ি মুজিজার এক বিস্ময়কর রূপ। হিজরতের মাত্র এক বছর আগে রবিউল আওয়াল মাসে এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল; অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এমনটাই মনে করেন। আবার অনেকে রজব মাসের কথাও বলেছেন। তবে অধিক বিশুদ্ধ ও নিকটবর্তী মত হলো রজব মাস।

নবিজি ﷺ তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। জিবরাইল عليه السلام একটা ‘বোরাক’ নিয়ে এলেন। বোরাক হলো খচ্চর আকৃতির একটা বাহন। এটাতে করে রাসূল ﷺ-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সমস্ত নবি-রাসূল তাঁর আসার অপেক্ষায় আছেন। রাসূল ﷺ সবাইকে সাথে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। তিনি নামাজের ইমামতি করলেন। নবিরা যেখানে সওয়ারি বাঁধতেন, ঠিক সেখানেই বোরাককে বেঁধে রাখা হলো। আজও সে স্থানটি ‘বোরাকের দেয়াল’ নামে পরিচিত। ইহুদিরা অবশ্য এই স্থানটাকে ‘মুবকি দেয়াল’ নামে অবহিত করে থাকে।

তারপর নবিজিকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। ধীরে ধীরে আসমানের সমস্ত দরজা খুলে যায়। প্রথম আসমান, তারপর দ্বিতীয় এভাবে সবকটা আসমানের দরজা খুলে যায়। শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় পৌঁছালেন, সেখানে কলমের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ওখানেই আল্লাহ তায়ালা নবিজির ওপর অনেক ওহি নাজিল করেন। আল্লাহর অনেক নির্দশনও প্রত্যক্ষ করেন।

নিদর্শন ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা

প্রথম : বিশুদ্ধ হাদিসগুলো দেখলেই এই ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত রূপ ফুটে ওঠে। এ ছাড়াও কিছু কিতাব যেমন : 'আল ইসরা ওয়াল মিরাজ'-এ সবিস্তারে বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে, এই কিতাবের লেখক ইবনে আব্বাস। কিন্তু এই কিতাবটা বিভিন্ন লৌমহর্ষক ঘটনা, মিথ্যা কল্পকাহিনি এবং নানা উদ্ভট তথ্যে ভরপুর। এই কথাগুলোর কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। বিশুদ্ধ সনদ কিংবা সুস্থ মস্তিষ্ক—কোনোটাই এই ব্যাপারগুলো মেনে নেয় না। এই ব্যাপারগুলো ইনিয়ে-বিনিয়ে ঈমান ও নবুয়তের দাবি তুলে ধরে। অনেকটা কল্পকাহিনি, কিংবদন্তি, পুরাণ কাহিনির মতোই অতিরঞ্জন, ভীতিকর এবং গায়ে কাঁটা দেওয়া বর্ণনায় ভরপুর। এসবের কোনো ভিত্তি নেই। আমাদের পবিত্র ধর্মে এসব মনগড়া কথার কোনো স্থান নেই। তাই এসবের পিছু ছোটা কিছুতেই কাম্য নয়। কারণ, এগুলো মন-মগজে প্রভাব ফেলে, আচ্ছন্ন করে তোলে।

দ্বিতীয় : ইসরার ঘটনা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট, বাস্তব; তন্দ্রা জড়ানো আচ্ছন্নতায় মোড়া নয়। অনেকে দাবি করে, আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে ঘুমের ঘোরেই সফর করিয়েছেন। এমন দাবি ভিত্তিহীন ও অসার। কারণ, ইসরা যদি ঘুমেই হয়ে থাকে, তাহলে সে এমন কী হাতি-ঘোড়া হলো? এই ঘটনা তো এত বড়ো করে বলার কিছুই নেই। আচ্ছা আমাদের মাঝে কে এমন আছে—যে রাতের আঁধারেই স্বপ্নের মধ্যে দূরপ্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তর পর্যন্ত সফর করতে পারবে? সবাই যদি আকাশে উড়তে পারে, আসমানে উঠতে পারে, তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

আর এটা তো জানা কথা, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বহুমুখী ও তীব্র আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের প্রশ্ন ছিল—'এমন দাবিও কি মানুষ করতে পারে? এক রাতে কীভাবে সে শাম এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে যেতে পারে—যেখানে আমাদের দীর্ঘ কয়েক মাস উটের ওপর সফর করতে হয়? মুহাম্মাদ কী করে এই দীর্ঘ পথ এক রাতে পাড়ি দিয়ে আবার ফিরেও এসেছে? তাও আবার বিছানার ওম শেষ হওয়ার আগেই!'

কুরআনের বর্ণনা এবং মুশরিকদের এমন প্রশ্ন থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইসরা বাস্তবেই সংগঠিত হয়েছিল। ইসরা আত্মিক ও শারীরিকভাবেই হয়েছিল। কেউ কেউ বলে, আত্মিকভাবেই হয়েছিল; শারীরিকভাবে নয়। কথাটা দুর্বল ও নড়বড়ে। কেউ কেউ দাবির সাথে কিছু সাহাবার নাম জড়িয়েছে। যেমন : মুয়াবিয়া رضي الله عنه, আয়িশা رضي الله عنها প্রমুখ। কিন্তু এমন দাবির সত্যতা মেলে না। বাস্তবতা হলো—অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ইসরা শারীরিক ও আত্মিক দুইভাবেই হয়েছে। এতেই এই ঘটনার মূল তাৎপর্য, রহস্য ও মহিমা লুকিয়ে আছে।

তৃতীয় : ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ঘটে মাক্কি জীবনের একেবারে শেষের দিকে, হিজরতের কিছু আগে। এই ঘটনা এমন সময়ে ঘটার পেছনে একটা তাৎপর্য হচ্ছে—মক্কাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সাথে সম্পৃক্ত করা। আসমানি বার্তা প্রেরিত হওয়া স্থানগুলোর মাঝে মিল তৈরি করা, একই সুতোয় গেঁথে রাখার প্রয়াস চালানো। এই মিল কিছুতেই কিয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হবে না; নবিজির হাতে তো নয়-ই। তাই কুরআনে দেখতে পাই—

> ‘ত্বিন ও জায়তুনের শপথ! শপথ সিনাই পর্বতের এবং এই নিরাপদ নগরীর।’
> সূরা ত্বিন : ১-৩

এই আয়াতে নবিদের অনেক জায়গাকে এক স্থানে এনে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈসা ﷺ-এর পদধূলি ধন্য স্থানসমূহ যেমন : শাম, নাসেরা, ফিলিস্তিন; মুসা ﷺ-এর বেড়ে উঠা স্থানসমূহ যেমন : সিনাই পর্বত ও তার আশপাশে ফিলিস্তিনের অঞ্চলসমূহ এবং রাসূল ﷺ-এর স্মৃতিধন্য নিরাপদ মক্কা ইত্যাদির মাঝে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা।

আসমানি বার্তার মিল এবং ভূমির অভিন্নতা

এই বোধ ও চিন্তা আসমানি বার্তাসমূহের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে। ইসলামি ভূখণ্ডরূপে ভূখণ্ডের পরিচিতি পায়। এই চিন্তাই পবিত্র স্থানসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই স্থানগুলো এই উম্মাহর ইতিহাস ও জীবনের বাস্তবতায় এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই বিবেচিত হয়ে আসছে; বরং দ্বীনের অংশে পরিণত হয়েছে। এজন্যই নবিজি ঘোষণা করেছেন, মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করলে মিলবে এক লাখ নামাজের সওয়াব। মসজিদে নববিতে মিলবে এক হাজার নামাজের সওয়াব। মসজিদে আকসায় একবার নামাজ আদায়ে কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনা অনুসারে মিলবে এক হাজার নামাজের সওয়াব। আবার কোনো হাদিসের বর্ণনা অনুসারে পাঁচশত নামাজের সওয়াব। এ ছাড়াও কোনো কোনো হাদিসে দুইশত নামাজের সওয়াব এবং পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব মেলার কথাও এসেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এই স্থানগুলোর আলাদা একটা মর্যাদা রয়েছে। এই জায়গাগুলোতে জিয়ারতে যাওয়া হয়। যেমন : হাদিসে এসেছে—

> ‘সওয়াবের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদে সফর করা জায়েজ; মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববি।’ সহিহ বুখারি : ১১৭৯

ইসলামের এই উচ্চতর বোধ ও চিন্তাকে আমাদের লালন করা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন মসজিদে আকসার ওপর নেমে এসেছে বর্বরোচিত আক্রমণ। এই পবিত্র ভূখণ্ড অনেক দিন ধরেই লুটেরা ইহুদিদের কবজায়। তারা এই মসজিদকে ধীরে ধীরে বিলীন করে দিতে চায়।

সেই লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে বের করার ছলে মসজিদের চারপাশে খনন করছে। উগ্রবাদীদের জায়গা করে দিচ্ছে, তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। মসজিদুল আকসা পোড়ানো থেকে শুরু করে নিচে বড়ো বড়ো সুড়ঙ্গ করছে এবং এক তথাকথিত 'আকৃতি' খুঁজে বের করার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার—এরা স্বীকার করেছে, যখন তারা ইহুদি নির্দশন খুঁজতে গিয়েছে, তখন নতুন নতুন ইসলামি নিদর্শন বেরিয়ে এসেছে! বিস্ময়কর সব ইসলামি প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে তারা নিজেরাই থমকে গেছে। কারণ, এটা ইসলামি ভূখণ্ড! এই ভূখণ্ডের ইতিহাস ইসলামের হাত ধরে চলেছে।

সমস্ত নবিদের ধর্ম

মুহাম্মাদ ﷺ যে ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা-ই একমাত্র ইসলাম নয়; বরং সমস্ত নবিরাই ইসলাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা মুসা ও ঈসা عليهما السلام-এর ধর্মের প্রতিও ঈমান আনি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারই মুহাম্মাদ ﷺ পেয়েছেন। ইসরার এই বিস্ময়কর ঘটনা মূলত সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। এই মহান স্থানগুলোর মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং সেগুলো গভীরভাবে আঁকড়ে ধরার কথা বলে। মুসলমানদের ইতিহাস এই স্থানগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা তুলে ধরে। তাই কোনো শাসক কিংবা শাসিত, কোনো দল কিংবা রাষ্ট্র—কারও পক্ষেই এই ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের সরে আসার কথা বলার অধিকার নেই। এই ভূখণ্ড কেনাবেচার জন্য নয়। এমনকী এই ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের একচুল পরিমাণ অধিকার থেকেও সরে আসা যাবে না। কারণ, এই ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে মুসলমানদের গৌরবগাঁথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ইতিহাস; বরং তাদের ধর্মের সাথে মিশে আছে। যদি বর্তমান প্রজন্ম এই ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে না পারে, কিংবা অধিকার উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে ফিরিয়ে আনতে না পারে, তার অর্থ এই নয়—সত্য বিলীন হয়ে গেছে, মিথ্যাই সত্যরূপ নিয়েছে। অপশক্তি ও অপহরণ কিছুতেই সত্যের মাপকাঠি পরিবর্তন করতে পারে না। হয়তো আগামী প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের ব্যর্থতা ভুলিয়ে দেবে। আপন শক্তিবলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তাই আমাদের এই স্থানগুলোর মাঝে যে মিল ও বন্ধন রয়েছে—তা মনে রাখা অতীব জরুরি।

চতুর্থ : ইসরার ঘটনার একপর্যায়ে রাসূল ﷺ সমস্ত নবিদের সঙ্গে নিয়ে এই পবিত্র ভূখণ্ডে নামাজ আদায় করেন। এরই ভেতর দিয়ে পরোক্ষভাবে আসমানি রিসালাহ বা বার্তার পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। রাসূল ﷺ সমস্ত নবিদের উত্তরাধিকারী। তিনি শেষ কিতাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে এই দ্বীনের পূর্ণতা এসেছে। বান্দাদের ওপর খোদার রহমতের পূর্ণ বারিধারা বর্ষিত হয়েছে। সমস্ত মানুষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম খুঁজতে যায়, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সূরা আলে ইমরান : ৮৫

রাসূল ﷺ শেষ কিতাব, সৎপথের আলোকবর্তিকা এবং চূড়ান্ত দ্বীন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই প্রত্যেকের উচিত, রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে চলা এবং তাঁকে অনুসরণ করা। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পর কারও পক্ষেই নবিজির পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই সত্তার কসম! এই জাতির কোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান আমার কথা শোনার পরে মৃত্যুবরণ করেছে অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান আনেনি, সে জাহান্নামি।' সহিহ মুসলিম : ১৫৩

রাসূল ﷺ শেষ নবি। তাঁর দ্বীন হলো চূড়ান্ত দ্বীন।

অন্তহীন স্বপ্ন

এই বোধ ও চিন্তা আমাদের হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার করে, নতুন স্বপ্ন বোনায়—এই পবিত্র ভূখণ্ড অচিরেই তার বৈধ মালিকের কাছে ফিরে আসবে। এই ভূখণ্ডের প্রতি আমাদেরও দায় আছে। তাই শুধু অপেক্ষা করে থাকলে হবে না; বরং এই ভূখণ্ড রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর পথে লড়ে যাওয়া বীর সেনানীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। নবি ﷺ বলেছেন—

> 'বাইতুল মুকাদ্দাসেই আবির্ভূত হবে বিজয়ী সম্প্রদায়।' সুনানে আবু দাউদ : ৪৫৭

বাইতুল মুকাদ্দাসের চত্বরে শত্রুদের পদানত করবে, আল্লাহর শাসন কায়েম করবে। তাদের শত্রু কিংবা বিরোধী কেউ বিজয়ী সম্প্রদায়ের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে; খোদায়ি শাসন চালু করবে। তার আগে কেউ তাদের টলাতে পারবে না। যারা এই কাজ করতে পারবে না, তাদের পক্ষে দুর্দিনে মসজিদে একটা বাতি জ্বালানো কিছুতেই এর চেয়ে কম নয়।

আমাদের উচিত, এই চিন্তা বাস্তবায়নে দুর্বার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, ইসরার ঘটনার সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটন এবং মানুষের কাছে এর প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরা। কারণ, এই ঘটনার মাঝেই লুকিয়ে আছে এই ভূখণ্ড ফিরে আসার কথা। সময়ের হিসেবে দীর্ঘ হোক, স্বল্প হোক কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'অবশ্যই কিছু সময় পরে তার সংবাদ জানতে পারবেন।' সূরা সাদ : ৮৮

অদৃশ্যে বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত

ঘটনার বিবরণ

ইসরা ও মিরাজকে কেন্দ্র করে মক্কায় প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটা ঘটনা বেশ নজর কাড়ে, তা হলো—একদিন কিছু লোক আবু বকর ﵁-এর কাছে এসে বলে—'আচ্ছা, তোমার বন্ধু কি বলছে শুনেছ কি?'

তিনি বললেন—'কী বলেছে?'

এবার তারা সুযোগ পেয়ে হাসি চাপতে চাপতে বলল—'সে নাকি এক রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে এবং আকাশেও পরিভ্রমণ করে এসেছে!'

আবু বকর ﵁ জানতে চান, 'সত্যই কি তিনি এমন কথা বলেছেন?' তাঁর কণ্ঠে বিশেষ কিছু ছিল।

এটা বুঝতে পেরে তারা বলল—'অবশ্যই বলেছে।'

এবার আবু বকর ﵁ বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা না করেই বললেন–'যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন।'

সেদিন থেকেই বরং তার আগে থেকেই তাঁর নাম সিদ্দিক, সত্যবাদী। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'ওই ব্যক্তি যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছে।' সূরা জুমার : ৩৩

আবু বকর ﵁ ছিলেন সত্যবাদী। তিনি আসমান থেকে রাসূলের কাছে সংবাদ আসার ব্যাপারকে সত্যায়ন করেছিলেন। তিনিই প্রথম রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন, যখন সবাই তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। তিনিই প্রথম ইসরা ও মিরাজের ঘটনাকে সত্যায়িত করেন।

কিন্তু যে ব্যাপারটা নবিজিকে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত করেছিল তা হলো—যখনই আবু বকরকে এ কথা বলা হলো, তখনই তিনি কোনো প্রকারের দ্বিধা ছাড়াই বললেন—'যদি তিনি বলে থাকেন,

তাহলে অবশ্যই সত্য বলেছেন।' নবিজির সমস্ত কথাই তিনি কোনো কুণ্ঠাবোধ ছাড়াই সত্য বলে মেনে নেন। এটা অনেক বড়ো তাৎপর্য বহন করে। নিশ্চয় ধর্মের ভিত্তি হলো অদৃশ্যের ওপর। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে।' সূরা বাকারা : ৩

মানুষ একমাত্র ওহির মাধ্যমেই আখিরাত, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম এবং আল্লাহসংক্রান্ত ব্যাপার জানতে পারে। তাই মুসলিম ও কাফিরের মাঝে বড়ো পার্থক্য হলো—মুসলিম গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, পক্ষান্তরে কাফির আনে না; বরং সে বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

গায়েব ও কুসংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব

আমাদের 'গায়েব' ও 'কুসংস্কারের' মধ্যে তফাত জানতে হবে। গায়েব কোনো অদৃশ্য মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয় নয়; বরং তার উর্ধ্বে। আকল-বুদ্ধি তা ধারণ করতে পারে না। যদি সমগ্র মানবগোষ্ঠী মিলে নিজের বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়, নির্ঘাত ব্যর্থ হবে। কারণ, তাদের কাছে এমন কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই, যার ওপর নির্ভর করে অনুমান করবে। ব্যাপারটা মানুষের বুদ্ধি বা আকলের সীমার বাইরে। সীমিত বুদ্ধি দিয়ে কি অসীম কিছুকে ধারণ করা সম্ভব? আল্লাহসংক্রান্ত জটিল ও ব্যাপক বিষয়গুলো ধারণ করা কি মানুষের সীমিত বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব?

সুতরাং গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় মানুষের বুদ্ধির অনুকূলে নয়; সাধ্যের বাইরে। অথচ কুসংস্কার, লোকাচার ইত্যাদি মানুষের বুদ্ধির সীমার মধ্যেই আছে। আর মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি তা গ্রহণ করে না; বরং প্রত্যাখ্যান করে। তাই মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও আচারে গড়ে উঠা ব্যাপার; শরিয়াহতে যার কোনো ভিত্তি নেই, তা-ই কুসংস্কার। অনেক মুসলমান কুসংস্কার ও গায়েব এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলে। অনেক মুসলিম দেশই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে আব্দুল আজিজ ইবনে বাজের একটা বই আমার হাতে আসে। বইটা শাইখ আহমদের তথাকথিত ওসিয়ত নিয়ে। তিনি মনে করেন, তাঁর হাতে হারামের চাবি আছে। তিনি এক লম্বা স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্ন বেশ উদ্ভট ব্যাখ্যায় ভরপুর। মনে মনে বললাম, এমন ব্যাপার নিয়েও কি বই লিখতে হয়? এই ব্যাপারটা মোটামুটি প্রায় সাধারণ মানুষের জানা। তাহলে বই লেখায় প্রণোদনা দিয়েছে কে? দেখলাম, এই ব্যাপারটা প্রতিবছরই নতুন নতুন রূপে ফিরে আসে। মানুষ আমাকে মোবাইলে মেসেজ দিয়ে, ইমেইল করে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে, আলোচনা সভায় এ সংক্রান্ত অহরহ প্রশ্ন করে, যেন ব্যাপারটা এই প্রথম মানুষের সামনে এসেছে! অথচ আমাদের অনেক আগেই শাইখ রশিদ রেজা এই ব্যাপারে তাঁর ফতোয়ার বইয়ে লিখেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মানুষ কেন এই ব্যাপারগুলো অবলীলায় গ্রহণ করে? এই কুসংস্কারগুলো যত দ্রুতই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে তা বিশ্বাস করে!

ইসলামি মানস

ইসলামি মানস হলো—স্বচ্ছতা ও সততার পরাকাষ্ঠা; যেকোনো ব্যাপার ও তথ্য গ্রহণ করা না করার মানদণ্ড। ইসলামি মানস দলিল ও প্রমাণে বিশ্বাস করে, ঠিক যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে—

> ‘বলুন! যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।’ সূরা বাকারা : **১১১**

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোনো রকম দলিল-প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চিত জেনে রেখ, কাফিরগণ সফলকাম হতে পারে না।’ সূরা মুমিনুন : **১১৭**

অর্থাৎ এই লোকগুলো আল্লাহকে ছাড়া অন্য সত্তার ইবাদত করে অথচ তার ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এটা তো সুনিশ্চিত—শিরকের কোনো ভিত্তি নেই, নেই কোনো প্রমাণ। কিন্তু তারপরও যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভরতার স্বার্থে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রমাণ ও দলিলের অবতারণা হয়। যখন শরয়ি ব্যাপার হয়, তখন প্রমাণও শরয়ি উৎস থেকে হয়। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রমাণও ভিন্ন হতে পারে।

এই কথা অবধারিত, মুসলিম জাতি সমগ্র পৃথিবীর পরিচালক। অথচ সেই জাতির প্রাত্যহিক জীবনাচারে, ইবাদতে এবং দৈনন্দিন কর্মে কুসংস্কারের পরিমাণ লক্ষ করুন!

অতীত ও বর্তমানের তারতম্য

আজ মুসলিম জাতি এক মহান ঘোষকের দিকে তাকিয়ে আছে—যার মায়াভরা ডাক তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করবে, তাকে জাগিয়ে দেবে। আজ এই উম্মাহ বড়োই দিশাহীন, পথভোলা। আল্লাহ নির্দেশনা থেকে দূরে সরে গেছে। তাঁর পছন্দ ও সন্তুষ্টিমূলক কাজ বর্জন করেছে। নবির শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা অমান্য করছে। অথচ নবির শিক্ষায় আলোর পথ পেয়েছিল তাঁর অসংখ্য সাহাবা। আবু বকর ﷺ-এর কাছে যখন নবির ইসরা ও মিরাজের খবর এসেছিল, তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন—‘যদি তিনি এমন কথা বলে থাকেন, তবে সত্য বলেছেন।’

এই বিবেক বা মানসই হলো অত্যধিক মূল্যবান রত্ন। সুস্থ বিবেকই মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে। মনুষ্যত্বকে পরিণিত করে। তাই মানুষের বিবেক কিছুতেই কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে থাকতে পারে না। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো—আমি যখনই কোনো মুসলিম দেশ সফর করেছি, হতাশ হয়েছি; সমস্ত দ্বীনি পরিবেশই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মসজিদের পাশেই বিভিন্ন মাজার।

তাতে বিরামহীন নৃত্য-গান পরিবেশিত হচ্ছে। কিছু মানুষ কবরের চারপাশ জুড়ে বসে আছে, তাবিজ-কবজ করছে, গায়েবের সন্ধান দিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অলীক কথাবার্তা বলছে। তাদের দাবি—তারা সব রকমের বিপদ-আপদ, রোগ-বালাই অতি দ্রুত নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে! মানুষ তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অবলীলায় তাদের কথা গিলছে, মেনে চলেছে! নানা উদ্ভট পদ্ধতি মেনে জীবন-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে চলেছে।

দ্বীন : কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম

একটা ব্যাপার ভেবে বেশ অবাক হই, যে দ্বীনের আবির্ভাব হয়েছিল কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাতের তরে, সেই দ্বীনের অনুসরারীরা অবলীলায় কুসংস্কারে ডুবে আছে! তাদের মন-মগজে, অন্তরে কুসংস্কারের প্রবল ছাপ। মুসলমানদের ইবাদতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, তাদের নামাজে, জিকিরে সর্বোপরি ইবাদতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে। আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থা তো আরও নাজুক। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ঢুকে পড়েছে কুসংস্কার। আজ কুসংস্কার যেন মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সত্য ধর্ম কখনোই কুসংস্কারের সাথে আপস করবে না; বরং শেষ পর্যন্ত এর বিরদ্ধে লড়ে যাবে, মূলে কুঠারাঘাত করবে। কুরআন ও হাদিসের মূল শিক্ষায়, রাসূল ﷺ-এর জীবনে, সাহাবা ও সোনালি যুগের মানুষদের জীবনে এমন হাজারো উদাহরণ রয়েছে। কোনো কোনো বরেণ্য ইমাম বলেছেন—

> ‘কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যদি আমার হৃদয়ে পেরেক ঠুকা হয়, তবুও কুরআন ও হাদিসের দলিল ছাড়া আমি তা গ্রহণ করব না।’

অনেক সময় দ্বীনের বেশে ঢুকে পড়া কুসংস্কারের জন্য মানুষের আবেগ ও ভাবাবেগ কাজ করে। তবুও কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়া তা গ্রহণ করা যাবে না।

সংস্কারকদের ভূমিকা

আমরা বাস্তবতা বুঝতে পারি। অনেক মুসলমান এখনও দ্বীনি শিক্ষা থেকে বেশ দূরে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব পড়ে আলিম, দায়ি ও প্রচারমাধ্যমের ওপর। এসব ক্ষেত্রে সঠিক ইসলামি মানস ও বিবেক গঠনে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত—মুসলিম মানস কখনোই কুসংস্কার গ্রহণ করবে না এবং তার ডাকে সাড়া দেবে না; বরং সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধিই তার কাছে সবকিছুর মানদণ্ড হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘বলুন! যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো।’ সূরা বাকারা : ১১১

মুসলমানের কাছে তার সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধিই সত্যের মানদণ্ড। সে কিছুতেই কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন ছাড়া কোনো কুসংস্কার গ্রহণ করতে যাবে না। আজ কুসংস্কার মুসলমানদের কথায়, বক্তব্যে, বৈঠকে, আলোচনা সভায় ইত্যাদিতে ঢুকে পড়েছে। বরং অনেক মুসলমান কিছু কুসংস্কারকে কুসংস্কার মানতেই নারাজ। কারণ, তার মাঝে কুসংস্কার চেনার জ্ঞান নেই; সে দ্বিধায় পড়ে যায়।

তাই আলিমদের উচিত মুসলমানদের অজ্ঞতার পরিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা, যেন সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। কিছুতেই যেন ওহি ও কুসংস্কারের মাঝে গুলিয়ে না যায়। কুসংস্কার যেন কিছুতেই দ্বীন হিসেবে জায়গা করে নিতে না পারে! ইসলাম কুসংস্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা কি এই কুসংস্কার দূর করতে পারব? হয়তো! আশায় বুক বেঁধে আছি।

ইসলামে নামাজের অবস্থান

নামাজ ফরজ হওয়া

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যখন নবিজি ﷺ মিরাজে গেলেন, সপ্তম আসমানের ওপর থেকে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ এলো, তখন রাসূল ﷺ ঊর্ধ্ব আসমানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন, রাত-দিন ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান। তারপর তিনি মুসা عليه السلام-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসা عليه السلام জিজ্ঞেস করলেন—'আপনাকে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?'

তিনি বললেন—'আমাকে ৫০ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এ কথা শুনে মুসা عليه السلام বনি ইসরাইলের সাথে ঘটা তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করলেন। বনি ইসরাইল জাতি তাদের নবিদের সাথে তুমুল বিবাদে লিপ্ত হতো। তাই তিনি রাসূল ﷺ-কে বললেন—'আমি আপনার বহু আগেই মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক বড়ো। বনি ইসরাইলের সাথে আমার বেশ বোঝাপড়া হয়েছে। নবুয়তের ময়দানেও অভিজ্ঞতা আছে!' তারপর রাসূল ﷺ-কে বললেন—'সুতরাং এবার আল্লাহর কাছে গিয়ে নামাজের ওয়াক্ত কমানোর জন্য অনুরোধ করুন।'

একটা ব্যাপার লক্ষ করুন, নবিরাও নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও উপদেশ ভাগাভাগি করেন। অথচ তাঁরা সবাই একই পথের পথিক। তাই তাঁরা একে অপরের কাছে নিজেদের এবং উম্মাহর জন্য উপদেশ ভাগাভাগি করেন। মুসা عليه السلام-এর কথা শুনে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে ফিরে যান। বিধান আরও হালকা করে দিতে আবেদন করেন। তারপর আবার মুসা عليه السلام-এর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। মুসা عليه السلام আবারও তাঁকে একই কথা বলেন। নবিজি আবারও আল্লাহর কাছে আবেদন করেন। এভাবে প্রতিবারই পাঁচ ওয়াক্ত করে কমিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত নামাজ পাঁচ ওয়াক্তে এসে দাঁড়ায়। তারপরও মুসা عليه السلام আগের কথাই বলেন—'আবার আপনার রবের কাছে যান, কমানোর আবেদন করুন। কারণ, আপনার জাতি এটা সহ্য করতে পারবে না।' নবি ﷺ বলেন—'আবারও আল্লাহ তায়ালার কাছে যেতে আমার লজ্জা লাগছে।' এমন সময় নবি ﷺ শুনতে পেলেন,

কেউ একজন তাঁকে বলছে—'আমি আমার ফরজ দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছি, বান্দাদের ওপর দায়িত্ব কমিয়ে দিয়েছি এবং প্রতিটার প্রতিদান দশগুণ করেছি।' তিনি বললেন–'তা পাঁচ ওয়াক্ত এবং পাঁচ ওয়াক্ত ৫০ ওয়াক্তের সমান। আমার কথা কিছুতেই পরিবর্তিত হয় না।' খোদায়ি অমীয় বাণী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী।

সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত

এটাই ছিল এই উম্মাতের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির। নবিজির শেষ চক্করে এই তাকদির নির্ধারিত হয়। শুরুটা হয়েছিল ৫০ ওয়াক্ত দিয়ে। কারণ, মূল দায়িত্ব কিন্তু ওই ৫০ ওয়াক্তই; তারপর ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেছে। মানুষ যেন নিজেদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়ার উদারতার কথা জানে। মূল 'ফরজ' বা দায়িত্ব বহাল আছে—সওয়াব ও প্রতিদানের বিচারে। কারণ, এই জাতির প্রতিটি ভালো কাজের জন্য দশগুণ প্রতিদান বরাদ্দ। পাঁচ ওয়াক্তে নামাজের মূল সওয়াব বা প্রতিদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ গুণ—যা ৫০ ওয়াক্তের সমান! তাই তিনি বলেছেন—'তা পাঁচ ওয়াক্ত, অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে পাঁচ ওয়াক্ত।' আবার বলেছেন—'তা-ই পঞ্চাশ ওয়াক্ত, অর্থাৎ প্রতিদানের বিচারে।' আল্লাহ যদি চান, নিজ অনুগ্রহে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রাচুর্যময়।

'আমার ফরজ অর্পণ করে দিয়েছি'—এ কথার মূল ইঙ্গিত হলো পাঁচ ওয়াক্তের দিকে। তাই নববি যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত আলিমদের মত হলো, রাত ও দিন মিলিয়ে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত।

রুহের মিরাজ

রাসূল ﷺ আসমানে উঠে কিছু দূর যাওয়ার পরে কলমের ধ্বনি শুনতে পেলেন। কলমের ধ্বনি তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে, ব্যাপারটার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে প্রণোদনা দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর উম্মাহকে বদলা দিয়েছেন; নামাজকে তাদের হৃদয়ের মিরাজ করেছেন। তাই নামাজ এক আল্লাহর জন্যই আদায় করতে হয়। এক আল্লাহর কাছেই সিজদাবনত হতে হবে, অন্য কোনো সত্তার কাছে নয়। এটাই ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করে, এক ও অমুখাপেক্ষী মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী করে তোলে—আল্লাহ না কারও কাছ থেকে জন্ম নিয়েছেন, না কাউকে জন্ম দেন। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। নামাজ মানুষের মনকে সতেজ ও সজীব করে। দূর করে দেয় সব ধরনের পঙ্কিলতা, কদর্যতা ও মানসিক দৈন্য। নবরূপে উজ্জীবিত এবং ঈমানি শক্তি সঞ্চার করে। নামাজ থেকে এক নতুন সঞ্জিবনী শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। তার ভেতরে এক নতুন ভাবান্দোলন তৈরি হয়। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেন—'যদি আপনি আল্লাহর কাছে নিজের মূল্যায়নের পরিমাণ জানতে চান, তাহলে নিজের মাঝে নামাজের মূল্যায়নের পরিমাণ কত দূর—তা পর্যালোচনা করুন।'

নামাজের কথা স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এই কর্তব্য অলঙ্ঘনীয়। নামাজ ব্যতীত ইসলাম কল্পনা করা যায় না। নামাজ ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং মূল ভিত্তি; বরং নামাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই নামাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে এসেছে ভয়াবহ হুমকি। এত অধিক হুমকি অন্য কোনো কিছুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না, একমাত্র তাওহিদ ছাড়া। এমনকী নবিজি ﷺ বলেছেন—

> ‘মানুষ এবং শিরক ও কুফুরির মাঝে ব্যবধান হলো নামাজ ত্যাগ করা।’ সহিহ মুসলিম : ৮২

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘আমার এবং তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি হলো নামাজ। যে নামাজ ত্যাগ করেছে, সে কুফুরি করেছে।’ তিরমিজি : ২৬২১

মুসলিম মানস গঠনে নামাজ

একটা ব্যাপার ভেবে আমি অবাক হই, আমার চৈতন্য বিস্ময় ও ঘোরের মাঝে আঁকা পড়ে, তা হলো—নামাজের প্রতি ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ, খোদায়ি নির্দেশ এবং নববি শিক্ষা। তাই মুসলিম জীবনে এবং ইসলামি সমাজের নামাজের প্রভাব দেখা যায়। মুসলমানদের মন ও মানসজুড়ে নামাজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যেকোনো মুসলিম দেশেই নামাজের চিত্র দেখা যায়, মিম্বরে মিম্বরে নামাজের ঘোষণা হয়। দলে দলে মানুষ মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়। ইসলামের এই মহান বিধান পালনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদের কাতারে এসে সমবেত হয়। মানুষের হাতে গড়ে উঠা সভ্যতায় নামাজের ভূমিকা ও কার্যকর ভূমিকা রাখে। এমন কোনো মুসলিম পাওয়া যাবে না—যার সাথে নামাজ ও মসজিদের সম্পর্ক নেই। মুসলিম মাত্রই নামাজের সাথে সম্পর্ক রাখে; হতে পারে সে আসক্ত, বেকার। কিন্তু যতদিন তার হৃদয় গহিনে ঈমানের দীপ জ্বলবে, ততদিন তার সাথে এই দ্বীনের সম্পর্ক থাকবেই। তার কাজে ও প্রাত্যহিক আচারে দ্বীনের ছাপ দেখা যাবে। মুসলমানের দৈনিক রুটিনের অনেক বড়ো জায়গা জুড়ে নামাজের অবস্থান। নামাজই এই দ্বীনকে উন্নত, স্থায়ী ও চিরন্তন করেছে। নামাজই সব ধরনের ধ্বংস, বিনাশ ও অবক্ষয় থেকে সমাজকে দূরে রাখে। নামাজ মুসলিম মানসকে করে স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ।

কর্মের প্রান্তরে

ইসরা ও হিজরতের মধ্যবর্তী সময়

রাসূল ﷺ-এর কাছে আল্লাহর নির্দেশ এলো। বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে, 'ইসরায়'। মহান ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام বিশেষ বাহন বোরাক নিয়ে এসেছেন। 'বোরাক' অনেকটা খচ্চরের মতো একটা প্রাণী। এটাও গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের জানার পরিধির বাইরে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এবং এতটুকুতেই মেনে নিয়েছি—যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে, সেটার পেছনে পড়ে থাকার কোনো কারণ নেই। মানুষের বরং বুদ্ধির অনুকূলে থাকা ব্যাপারগুলো বোঝা ও আয়ত্ত করার প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

হিজরতের সময়ও যথারীতি আল্লাহর নির্দেশ আসে, কিন্তু বোরাকের মতো কোনো বাহন আসেনি। জিবরাইল عليه السلام-এর আগমন ঘটেনি; বরং আল্লাহর নির্দেশনা ছিল প্রস্তুতি গ্রহণের, সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করার। নবিজি গোপনে গোপনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আবু বকর رضي الله عنه-কে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে চুপিসারে বেরিয়ে পড়লেন। বাহন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। দুজন দেরি না করেই বাহনে চড়ে বসলেন। বেশ দূরের ও দুর্গম পথ ধরে এগোতে লাগলেন, যেন কেউ সন্ধান না পায়, নাগাল না পায়। পথের মাঝখানে নির্জন পথের গুহায় আত্মগোপনে গেলেন। এরই মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করার তোড়জোড় যেন কমে যায়। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হলে বুঝে-শুনে মদিনার পথে রওয়ানা হলেন। পথে পথে একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হলেন।

সুরাকা পর্ব

তাঁর নাম ছিল সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম আলমুদলিজি। সে একশো উট পাওয়ার মোহে নবিজির ﷺ পিছু নেয়। কিন্তু খোদায়ি সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জালে সে আটকা পড়ে। তাঁর ঘোড়ার পা ধসে যায়। সে মূলত মোহাবিষ্ট হয়ে পাগল হয়েছিল। মক্কা থেকে ঘোষণা এসেছে—যে নবিজি ﷺ-কে জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই পুরস্কারের নেশায় সে নবিজির পিছু নেয়, কিন্তু তাকে ব্যর্থ হতে হয়। খোদায়ি কুদরতের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। সে নবিজির কাছে মিনতি জানায়। নবিজি তখনও আত্মমগ্ন, নির্ভার ও চিন্তামুক্ত। সুরাকা বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নিরাপত্তা দিন।' নবিজি ﷺ তাঁকে শুধু নিরাপত্তা নয়; বরং প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন—'হে সুরাকা! সেদিন তোমার কেমন লাগবে, যে দিন গায়ে পারস্য সম্রাটের বালা পরবে?' জবাবে সে বলল—'হে রাসূল! কিসরা ইবনে হুরমুজের বালা?' নবিজি বললেন—'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের বালা।' এ কথা শুনে সুরাকার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। উমর ইবনে খাত্তাবের সময়ে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়।

সত্যবাদী বন্ধু

নবিজি আপন পথে এগিয়ে চলেছেন। এর আগে ভয়, উৎকণ্ঠার ভেতরে পার হয়েছে অনেক দিবস-রজনী। একসময় আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়—

> 'স্মরণ করুন! যখন তাঁরা দুজনই গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছেন—"চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"' সূরা তাওবা : ৪০

আবু বকর رضي الله عنه-এর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। একবার নবিজির ডানে হাঁটছেন তো একবার বামে। কিছুক্ষণ সামনে তো কিছুক্ষণ পেছনে। নবিজি ﷺ আবু বকরের অস্থিরতা দেখে প্রশ্ন করলেন—'এ কী আবু বকর! তোমার কী হলো? তোমাকে তো আগে কখনো এমন অস্থির হতে দেখিনি?' তিনি বললেন—'আমার কখনো মনে হচ্ছে কেউ ওত পেতে আছে, তাই সামনে গিয়ে দাঁড়াই। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, কেউ পেছন থেকে অনুসরণ করছে। তাই পেছনে, ডানে ও বামে ছোটাছুটি করছি; কিছুতেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না!'

মানবীয় কাজ এবং খোদায়ি কর্ম

ইসরা ও হিজরতের পার্থক্য ব্যাপক। হিজরতের ঘটনা প্রবল পরিশ্রম ও কষ্টের। পক্ষান্তরে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা গায়েবের নির্দেশে ও ইঙ্গিতে হয়েছে। হিজরতের ঘটনায় উপায়-উপকরণের বন্দোবস্তের নির্দেশ ছিল। নবি ﷺ অশ্রুসিক্ত নয়নে মক্কা থেকে বের হন। 'হাজওয়ারা' নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন (বর্তমানে এই জায়গার নাম 'সুকুল লাইল' বা রাতের বাজার)। তারপর মক্কা নগরী ও পবিত্র কাবা ঘরের দিকে তাকান। তখন তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। এই মক্কায় কেটেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবন। এই পাহাড়ের কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন তিনি। আবেগঝরা কণ্ঠে মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বললেন—

> 'খোদার কসম! নিশ্চয় তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ভূমি, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তারা যদি আমাকে বের করে না দিত, আমি কিছুতেই বেরিয়ে যেতাম না।'
> ইবনে মাজাহ : ৩১০৮

তারপর মদিনার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর মহান প্রভু সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

> ‘নিশ্চয় যে মহান সত্তা আপনার ওপর কুরআন নাজিল করেছেন, তিনি আপনাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে দেবেন।’ সূরা ক্বাসাস : ৮৫

অর্থাৎ আপনি অচিরেই মক্কায় ফিরে আসবেন, যেমনটা বের হচ্ছেন। অষ্টম হিজরিতে মহান প্রভুর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়। মক্কা বিজয় হয়। উপরিউক্ত দুই ঘটনার মাঝে রয়েছে বিশাল পার্থক্য। এটা আমাদের বেশ গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। ইসরার ঘটনায় নবিজির কোনো চেষ্টা-তদবির ছাড়ায় সফরের বাহন বোরাক চলে আসে। মুহূর্তেই নবিজি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে যান এবং ঊর্ধ্বাকাশে পাড়ি জমান। পক্ষান্তরে হিজরতের ঘটনা ছিল একটা দায়িত্ব ও পরীক্ষা। তাই নবিজি পরিকল্পনা হাতে নেন এবং সেই অনুযায়ী এগিয়ে যান। গোপনে গোপনে প্রস্তুতি নেন। সম্ভাব্য মানসিক, বস্তুগত ও মানবীয় সাধ্যের ভেতরের সব ধরনের প্রস্তুতি নেন। তার ফল দেখা যায় হিজরতের সফরে। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা পার হয়ে যান।

এই ঘটনা আমাদের চিন্তার জগৎকে উসকে দেয়, সিরাতে নববিকে নিয়ে ভাবতে শেখায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও আলোচনা সভায় সিরাতের কিছু ঘটনা শুনেই দায়িত্ব শেষ হয় না। সিরাতে রাসূল ﷺ বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশাসনের প্রতিফলনের এক আদর্শ নমুনা। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনের ওপর নিরন্তর গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

কাজে বস্তু ও উপকরণের ভূমিকা

যেকোনো কাজ (দ্বীনি হোক বা পার্থিব) ও পরিস্থিতিতে উপায়-উপকরণের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জান্নাতিদের আল্লাহ তায়ালা বলবেন—

> ‘তোমরা যে কাজ করতে, তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।’ সূরা নাহল : ৩২

বাস্তবে তাঁরা নিজেদের আমলের বদৌলতে জান্নাত লাভ করেনি; বরং আল্লাহর দয়া ও রহমতের কারণে পেয়েছে। কিন্তু আমলগুলো তাঁদের আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নিকটে থাকে।’ সূরা আরাফ : ৫৬

তাই একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার, মানুষ জান্নাতে তার আমলগুণে প্রবেশ করবে। তেমনিভাবে জাহান্নামেও নিজের কর্মগুণে প্রবেশ করবে। মানুষ নিজের আনুগত্যের কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। আবার অবাধ্যতা ও পাপের কারণেই আল্লাহ ক্ষোভ ও ক্রোধের শিকার হয়।

পার্থিব বিষয়ের উপায়-উপকরণের ওপর ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> '(জান্নাতে যাওয়ার জন্য) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ যথেষ্ট এবং না কিতাবিদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হবে না। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে—সে পুরুষ হোক বা নারী; যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' সূরা নিসা : **১২৩-১২৪**

এরাই আল্লাহর কাছে নানা স্বপ্ন দেখে, ইরশাদ হয়েছে—

> 'যারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী (ঘুসরূপে) গ্রহণ করত এবং বলত, আমাদের ক্ষমা করা হবে।' সূরা আরাফ : **১৬৯**

কিন্তু এসব দাবি তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

কোনো ভূখণ্ড কিংবা বংশ-পরিচয় কাউকে মুক্তি দিতে পারে না; বরং আপন আপন কর্মই মুক্তি দিতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হবে না। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে—সে পুরুষ হোক বা নারী; যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' সূরা নিসা : **১২৩-১২৪**

সিজদাবনত অবস্থায় মৃত্যু

স্বপ্ন মানুষকে বড়ো করে। কিন্তু তার সাথে প্রয়োজন স্বপ্ন বাস্তবায়নের দীর্ঘ পরিশ্রম আর সীমাহীন ব্যাকুলতা। শুধুই স্বপ্ন কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দিতে পারে না; তার পেছনে শ্রম ও নিষ্ঠা থাকতে হয়। পার্থিব কোনো কিছুই পরিশ্রমবিহীন সফলতার মুখ দেখে না। বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুসলিমরা অনেক কথা বলে, হাজার স্বপ্ন বুনে এবং লাগামহীনভাবে নিন্দা করে। অথচ তারা যদি নিজেদের নিয়ে একটু ভাবত, তাহলে নিজেদেরই তিরস্কার করত। একটু যদি সুবিবেচক হতো, তাহলে নিজেদেরই নিন্দা ও ভর্ৎসনার অধিক উপযুক্ত মনে করত। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'তোমরা নিজেদের তিরস্কার করো; আমাকে নয়।' সূরা ইবরাহিম : **২২**

শয়তান কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের এমন কথা-ই বলবে।

বর্তমানে মুসলমানরা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। ইসলামের মূল বার্তা বুঝতে অক্ষম। ইসলাম কখনোই একজন মুসলমানের ব্যবসায়ী হওয়ার পথে কিংবা পার্থিব ব্যাপারে বিজ্ঞ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। আল্লাহ তায়ালা যেমন নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি পার্থিব ব্যাপারগুলোও সুন্দর সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো—মুসলমানরা মনে করছে, একমাত্র প্রচলিত ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব, আপন রবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

একটা ব্যাপারে মুসলমানদের বেশ প্রশংসা করতে দেখা যায়, অমুকে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। এটা আসলেই অনেক বড়ো ব্যাপার। সিজদারত অবস্থাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> 'আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় অবস্থা হলো সিজদারত অবস্থা।' মুসলিম : ৪৮২

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'সিজদা করুন এবং নৈকট্য অর্জন করুন।' সূরা আলাক : ১৯

অথচ অনেক মুসলমান আছে—যারা নিজেদের কাজকে ভালোবাসে। সারাদিন গবেষণাগারে, ল্যাবে, আপন কাজে ডুবে থাকতে পছন্দ করে। তাদের যদি এই অবস্থায় মৃত্যু হয়, কেউ তাদের প্রশংসা করে না। অথচ দায়িত্ব পালন করা, আপন কাজে মগ্ন থাকাও ইবাদত। কারণ, তাতে মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থ থাকে। মহান আল্লাহ তো সবকিছুতেই উত্তম প্রতিদান লিখে রেখেছেন। এমনকী সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য নিয়তে কাজ করলেও আপন কাজের প্রতিদান পাবে। এখানেই লুকিয়ে আছে দ্বীনের মূল সারবত্তা।

যে মহান রাসূল আমাদের রুকু ও সিজদা করা শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই বাবা-মায়ের শপথ করে বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, আল্লাহ চান সে তা নিপুণভাবেই করুক। কারণ, নিপুণ কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন।' বায়হাকি : ৫৩১২

এখানে একটা ব্যাপার বেশ লক্ষণীয়, কোন ধরনের কাজ তা রাসূল ﷺ নির্দিষ্ট করে বলেননি; বরং শরিয়াহ সমর্থিত সব ধরনের ছোটো-বড়ো কাজকেই বুঝিয়েছেন; তা দ্বীনি কাজও হতে পারে আবার পার্থিব হতে পারে। বান্দাকে নামাজের মাঝে মনঃসংযোগ করতে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তার কাজ, পড়াশোনা ও গবেষণা ইত্যাদিও নিপুণভাবে সম্পাদনের প্রতিও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বৈধ কাজ যত্ন ও নিপুণতার সাথে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ কাজ করে সফল হতে, অগ্রগতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে। কিন্তু কাজের মাঝে একটা প্রণোদনা কাজ করে, যা মানুষকে নিবেদিতপ্রাণ করে তোলে। আর তা হলো—আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

এই দ্বীন অনেক মহিমান্বিত ও তাৎপর্যময়। কিন্তু এই দ্বীনের বড়ো সমস্যা ও সংকট হলো—এর অনুসারীরা এই দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার নির্দেশনা ভুলে গেছে। এক সর্বগ্রাসী উদাসীনতা, স্থবিরতা তাদের ঘায়েল করেছে। তাই মুসলিম উম্মাহ আজ এক মহান সংস্কারকের দিকে তাকিয়ে আছে—যার পরশ পেয়ে তাদের মাঝে প্রাণ ফিরে আসবে, নতুন করে জেগে উঠবে এবং আপন রবের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হবে। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হবে তাদের জীবন; উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য আসবে।

এই দ্বীন কোনো জন-বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ নয়; বরং জীবনমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ এক মহা জীবনাদর্শ। এই দ্বীন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী এবং সকল মানুষের সাথে সদাচরণ করতে শেখায়, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি অনুপ্রেরণা জোগায় এবং আপন কাজে দায়িত্বশীল ও অগ্রগামী হতে প্রণোদনা দেয়। সর্বোপরি মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করতে এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। এগুলোই জান্নাতের কাঁটাময় পথকে মসৃণ করে। শুধুই প্রচলিত ইবাদত জান্নাতের খোরাক জোগায় না; বরং উপরিউক্ত মানবীয় গুণই মানুষকে প্রকৃত ঈমানদার করে গড়ে তোলে।

খ্রিষ্টানরা সপ্তাহে একদিন প্রভুর ইবাদত করে। বাকি দিনগুলো ব্যাংকের পূজা করে। কিন্তু মুসলমানের জীবন পুরোটাই ইবাদত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘বলুন! নিশ্চয় আমার নামাজ, হজ, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য; যাঁর কোনো শরিক নেই, আর এই নির্দেশই আমাকে দেওয়া হয়েছে।’ সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

তাই মুসলমানদের উচিত, ইবাদতের এই ব্যাপক অর্থ ও বোধ বোঝার চেষ্টা করা। নামাজ, রুকু, সিজদা, হজ ও জাকাত যেমন ইবাদত, তেমনি মানুষের অধিকার রক্ষা ও আদায় করা, শিশুকে কোলে তুলে নেওয়া, আপন কাজ নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে সম্পাদন করাও ইবাদত।

বদরের যুদ্ধবন্দি

শূরার বৈঠকে

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> ‘বদরের প্রান্তরে যখন বন্দিদের আনা হলো, তখন রাসূল ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন, “বন্দিদের নিয়ে তোমাদের কী মত?”’

এই ছিলেন প্রিয় রাসূল। যেকোনো ব্যাপারেই সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করতেন না। নিজের মতের প্রভাব বিস্তার করতেন না। অথচ তাঁর কাছে সকাল-সন্ধ্যা ওহি আসে। তারপরও তিনি তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বন্দিদের ব্যাপারে সবার আগে কথা বলেন আবু বকর رضي الله عنه।

তিনি বলেন—‘হে আল্লার নবি! তারা আমাদের আত্মীয়স্বজন ও ভাই-বেরাদার। তাই তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো হবে। এই মুক্তিপণ আমাদের কাজে আসবে; কাফিরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যাবে। আবু বকর رضي الله عنه-এর এমন অবস্থানের কারণ ছিল। তাঁর প্রত্যাশা ছিল—তাদের হিদায়াতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। অথচ এরাই খোলা তলোয়ার ও ধারাল বর্শা নিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে! তারা অনেক সাহাবাকে হত্যা করেছে! এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা বন্দি হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্যই যুদ্ধের ময়দানে এসেছিল! নবিজিকে আপন জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মদিনায় এসে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এতসব কিছু পরও আবু বকর رضي الله عنه আত্মীয়তার দিকটা বড়ো করে দেখলেন।

তিনি বললেন—‘তারা আমাদের ভাই-বেরাদার ও আত্মীয়স্বজন।’ তাই ব্যাপারটা মুক্তিপণ নিয়েই মিটমাট করে দেওয়া যায়—এই ছিল আবু বকর رضي الله عنه-এর মতামত।

এরপর রাসূল ﷺ উমর ﵁-এর কাছে পরামর্শ চান। উমর ﵁-কে দেখে শয়তানও দূরে পালাত! উমর ﵁ এক পথ দিয়ে গেলে শয়তান ওই পথ ছেড়ে অন্য পথ দিয়ে যেত! তিনি বললেন—'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমার মত আবু বকরের মতের সম্পূর্ণ উলটো; বরং আমি মনে করি, আমরা সুযোগ পেলে তাদের হত্যা করতাম। আলি সুযোগ পেয়ে আকিলকে হত্যা করেছে। আমি অমুককে হত্যা করার সুযোগ লুফে নিয়েছি। মুসলমান কিছুতেই কাফিরের সাথে সখ্যতা পোষণ করতে পারে না; যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে।'

রাসূল ﷺ উমর ﵁-এর মতকে এড়িয়ে আবু বকর ﵁-এর মতকে প্রাধান্য দিলেন। নবিজি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা অসহায় ও দুর্বল! তাই তাদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে দিলেই কল্যাণকর হবে।' সবাই মুক্তিপণের পক্ষে মত দিলো। নবিজি তাদের প্রতি সদয় হন এবং তাদের মুক্ত করে দেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'কোনো নবির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে কয়েদি থাকবে।' সূরা আনফাল : ৬৭

এই ঘটনার কিছু দিক

প্রথম : বন্দিদের নিয়ে আবু বকর ও উমর ﵄-এর মাঝে মতের বৈপরিত্য

মত-ভিন্নতা ভালোবাসা ও প্রীতি নষ্ট করে না। আবু বকরের দৃষ্টি ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, ক্ষমা ও মুক্তি প্রদানে। তাই তিনি মুক্তিপণের কথা বলেছেন। কিন্তু উমর ﵁-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী; আবু বকর ﵁-এর মূলনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে। আবু বকর দৃষ্টি ছিল আত্মীয়তার দিকে—তাদের কঠোর পরিস্থিতি ও হত্যা থেকে রক্ষা। রাসূল ﷺ আবু বকর ﵁-এর মত গ্রহণ করলেন, উমর ﵁-এর মত এড়িয়ে গেলেন। এতেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। কোনো উচ্চবাচ্য নেই, নেই কোনো তর্কাতর্কি।

সাহাবারা কেউ উমর ﵁-এর মতকে প্রাধাণ্য দিলো, আবার কেউ-বা আবু বকর ﵁-এর মত। কেউ কেউ তৃতীয় মত দিলো, আবার কেউ উভয়ের মাঝে একটা মত দিলো, কেউ একেবারে চুপ থাকল—এমন কিছুই হয়নি। অন্তত আমি জানি না। আমরা জেনেছি ব্যাপারটা এতেই শেষ হয়ে গেছে।

এটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার, পরবর্তী সময়ে মানুষ এই ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়াবে। তারপর কোনো এক ইমামের মত গ্রহণ করে ব্যাপারটার সুরাহা হবে। রাসূল ﷺ এখানেই ব্যাপারটার

ইতি টানলেন। ফলে মুসলিম সমাজ তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও অন্তঃকলহ এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে রক্ষা পেয়েছে, প্রান্তিক মত থেকে বেঁচে গেছে। এ নিয়ে আবু বকর ও উমর ﵄-এর মধ্যে কোনোদিন কোনো তর্ক হয়নি। আবু বকর ﵁ কোনোদিন উমর ﵁-কে ডেকে বলেননি—'আমি যেখানে মত দিয়েছি, তুমি ওখানে কথা বলতে গেলে কেন?' আবার উমর আবু বকরকে কখনো এ কথা বলেননি, 'আপনার মতটা ঠিক ছিল না।'

প্রত্যেকেরই সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ নিয়্যাত ছিল, দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু আবু বকর ﵁ হিদায়াতের দিকটা প্রাধান্য দিয়েছেন। নবিজি নিজেও এই দিকটা বিবেচনায় নিতেন। তাই তিনি আবু বকর ﵁-এর মত গ্রহণ করেন। কিন্তু উমর ﵁ প্রতিশোধ ও শাস্তি দেওয়ার বিষয়টাকে প্রাধান্য দেন। তিনি দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মুসলমানদের হৃদয়ে কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা ছিল না।

এই মূলনীতি যুদ্ধের ময়দানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ।

দ্বিতীয় : নিষ্কণ্টক যাত্রা

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত অধ্যায়, মোড় পরিবর্তনের ক্ষণ। খোদ আল্লাহ তায়ালাই এ কথা বলেছেন। এই দিনই ইসলামের প্রথম বিজয় সূচিত হয়। সমস্ত ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারদের মতে, বদরের যুদ্ধ ছিল এক চূড়ান্ত যুদ্ধ। মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধ একটা সীমা টেনে দেয়।

বদরের যুদ্ধের বিজয় ছিল প্রচ্ছন্ন এক হুংকার। সমগ্র আরব উপদ্বীপসহ পুরো দুনিয়া মুসলমানদের করতলে আসার পূর্বঘোষণা। অথচ এতসব কিছুর পরও সাহাবারা প্রথমদিকে এই যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'স্মরণ করো! যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন, দুই দলের এক দলকে তোমাদের আয়ত্তের ভেতরে আনবেন। তোমরা আশা করো, নিরস্ত্র দলটাই তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে।' সূরা আনফাল : ৭

সাহাবারা চেয়েছিল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়ী কাফেলার নিয়ন্ত্রণ নিতে। সাহাবারা এই ব্যবসায়ী কাফেলার সম্পদ ফিরিয়ে নিতে বেরিয়েছিল—যা তারা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছিল। এখানে কোনো যুদ্ধ বা মোকাবিলা হবে না। এই ঘটনা আবু বকর ও উমর ﵄-এর বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। তাঁরা বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'হে মানুষ! তোমরা শত্রুর মোকাবিলার আশা করো না, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। যদি তাদের সাথে তোমাদের ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়েও যায়, তখন সংযত থাকবে। মনে রাখবে, জান্নাত তরবারির ছায়ার তলে।' সহিহ বুখারি : ২৮১৯

ইসলাম রক্তপিপাসু ও যুদ্ধপিয়াসি কোনো মতাদর্শ নয়; বরং তা সৎপথের সন্ধান দেওয়ার উপায়। সর্বজনীন এক মানবতাবান্ধব মতাদর্শ। কিন্তু যদি আপন দাওয়াত ও বার্তার প্রসারে বাধার মুখোমুখি হয়, কোনো অপশক্তি যদি শত্রুতার জের ধরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ইসলাম আত্মরক্ষায় এগিয়ে আসে, তুমুল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। গোলার বর্ষণ, বোমার আঘাত ও তরবারির জবাব উপযুক্ত তরবারি দিয়েই দেয়; ফুল দিয়ে নয়। নবি ﷺ রহমতের নবি, ভালোবাসার বার্তাবাহী। কিন্তু প্রয়োজনে আত্মরক্ষার উপায় ও আক্রমণের কৌশলও জানেন। তিনি যেমন ভালোবাসতে জানেন, তেমনি আক্রমণও করতে জানেন। তাই নবিজি ﷺ ও সাহাবারা বদরের যুদ্ধে আশা করেছিল—কোনো প্রকার সংঘাতে না জড়াতে, যুদ্ধে অংশ না নিতে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি মুসলমানদের জন্য যুদ্ধই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। দুই দল মুখোমুখি হয়—

> 'সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে কোনো একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। আর তোমাদের কামনা ছিল, নিষ্কণ্টক দলটি তোমাদের সম্মুখীন হোক।' সূরা আনফাল : ৭

আল্লাহ মুসলমানদের জন্য বিজয় নির্ধারণ করেছিলেন। শত্রুরা পরাজিত হয়। মক্কা ও মদিনার দীর্ঘ কঠিন সময়ের নিষ্ঠুরতার পর্ব তখনও চুকায়নি। মুসলমানরা দুর্বিষহ নির্যাতন সহ্য করেছে। তাদের মন-মগজ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। তবুও অনেকটা অনিচ্ছা ও অনাগ্রহ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে; বরং বলা চলে—আল্লাহর ইচ্ছাই তাঁদের যুদ্ধের ময়দানে টেনে নিয়ে গেছে।

যুদ্ধের অবসান হয়েছে। মুসলমানরা মদিনায় ফিরে এসেছে; সাথে কুরাইশের বাঘা বাঘা নেতারা মুসলমানদের হাতে বন্দি। এখন প্রশ্ন আসে—মুসলমানদের মধ্যে কি প্রতিশোধপ্রবণতা কাজ করেছিল, নাকি ঈমানি তেজ, সৎপথের দীক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল? শেষ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে কেমন আচরণ তারা করেছিল? রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের আলাপচারিতা থেকে এমনটাই প্রকাশ পায়। রাসূল ﷺ আবু বকর رضي الله عنه-এর মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এটা রাসূল ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه-এর ব্যক্তিগত মত। মূলত আবু বকরেরই মত ছিল। নবিজি তা গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্দি কাফিরদের বিচার করেছিলেন।

তৃতীয় : নবিকে আল্লাহর সতর্ক

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে, কেন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করতে গেলেন—

> 'কোনো নবির পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে কয়েদি থাকবে। ' সূরা আনফাল : ৬৭

এই আয়াতের মর্ম কি এটাই যে, আবু বকর ﷺ ও রাসূল ﷺ-এর মতামতের চেয়ে উমর ﷺ-এর মতামত অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য? না, প্রকৃত অর্থে ব্যাপারটা তেমন নয়; বরং কুরআনের আয়াত এ কথাই বলে, নবিজির সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। আল্লাহ কখনোই এই ব্যাপারে তাঁদের তিরস্কার করেননি; বরং অন্য ব্যাপার নিয়ে তাঁদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের বলেন—

> 'কোনো নবির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে কয়েদি থাকবে।' সূরা আনফাল : ৬৭

এই আয়াতে বন্দি করার সিদ্ধান্তকে নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের বলছেন—

> 'তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়েছ। তারা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে তোমাদের হত্যা করতে এসেছে, তাহলে তোমরা কেন তাদের বন্দি করতে গেলে? কেন তাদের মতোই হত্যা করলে না?'

আর এটা তো বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার, কেউ আপনাকে হত্যা করতে এলে আপনিও তাকে হত্যা করতে চাইবেন, তাই নয় কি? কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও, তখন তাদের গর্দান কাটবে।' সূরা মুহাম্মাদ : ৪

অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হলে এটা করতে হবে; রাস্তার মোড়ে, বাজারের গলিতে কিংবা ঘরে সাক্ষাৎ হলে নয়। যুদ্ধের ময়দানে তারা প্রস্তুতি নিয়ে তোমাদের হত্যা করতে এসেছে। পৃথিবীতে কি এমন কোনো সনদ, আইন, মূলনীতি কিংবা সংবিধান রয়েছে, যে বলবে—'তারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে আসেনি?' তারা যুদ্ধ করতে এসেছে এবং তোমাদের হত্যা করার সার্বিক প্রস্তুত নিয়ে এসেছে। সুতরাং তাদের সাথে একই রীতিতে মোকাবিলা করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যদি তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হও, তখন তাদের গর্দান কাঁটবে।'

যুদ্ধের বদলা যুদ্ধ, মারের বদলে মার এবং তরবারির জবাব তরবারি দিয়েই দিতে হবে, তবেই উপযুক্ত জবাব হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করা পর্যন্ত।'

অর্থাৎ তাদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে হবে। এরপর বলা হয়েছে—

> ‘তারপর তাদের বন্দি করবে।’

অর্থাৎ বন্দি করার ব্যাপার শুরুতে আসবে না। কিছুতেই গনিমত কিংবা মুক্তিপণের প্রতি অনুরাগ দেখানো যাবে না; বরং তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার পরেই বন্দি করার ব্যাপারটা আসবে। ঠিক এই ব্যাপারটাই বদরের ময়দানে ঘটেনি।

আল্লাহ তায়ালা তাদের সতর্ক করে বলেছেন, কাফিরদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার পূর্বে কিছুতেই বন্দি করা ঠিক হয়নি। তারা যখন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবে, ঠিক তখনই তাদের বন্দি করবে। প্রথমেই বন্দি করলে তারা যোদ্ধা থেকে যুদ্ধবন্দি হয়ে পড়বে। তাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘কোনো নবির পক্ষে পরাভূত করার আগে বন্দি করা সংগত নয়।’

অর্থাৎ তারা পরাভূত হলে এমনিতেই বন্দি হবে। তখন তাদের সঙ্গে বন্দির মতোই আচরণ করা হবে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘যদি তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও, তবে তাদের পরাভূত করা পর্যন্ত হত্যা করো।’

কারণ, যদি তাদের হত্যার মাধ্যমে ঘায়েল করা যায়, তবেই অন্য উপায় অবলম্বন করা হবে তা হলো—বন্দি করা। আর বন্দি করার পর তারা প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে যুদ্ধবন্দি বলে পরিগণিত হবে। তাদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘হয় তাদের প্রতি দয়া করা হবে, নয় মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।’ সূরা মুহাম্মাদ : ৪

আল্লাহ তায়ালা এখানে হত্যার কথা বলেননি; বরং অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ আদায়ের কথা বলেছেন। আর এই কাজটাই রাসূল ﷺ করেছেন। তিনি অন্য অনেকের মতো বদরের যুদ্ধবন্দিদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে সুমামা ইবনে উসালের ঘটনা অনুগ্রহের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো কোনো ইমামগণ মনে করেন, নির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণে যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা যাবে। যেমন : আবু উজ্জা আল জুমাহির ঘটনা। সে মুসলমানদের বারবার হুমকি দিয়েছে। নবিজি তাকে বললেন—‘খোদার কসম! তুমি দ্বিতীয়বার এ কথা বলতে পারবে না—আমি মুহাম্মাদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি।’

চতুর্থ : ইসলাম দয়ার ধর্ম, আক্রমণের ধর্ম

নিঃসন্দেহে ইসলাম প্রেম ও ভালোবাসার ধর্ম। ন্যায়পরায়ণতা ও সততার ধর্ম। একইসঙ্গে আঘাত ও আক্রমণের ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যুদ্ধের কিছু নীতিমালা আছে। যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তিরও কিছু রীতি ও পদ্ধতি আছে।

অনেক মুসলিম পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বাস করে। অমুসলিমদের সঙ্গেও মেলামেশা করে। তাদের কাছে অনেক ব্যাপার অস্পষ্ট ও অবোধগম্য। তারা মানুষ ও দেশের মাঝে ভেদাভেদ করে না। তাই প্রবাসী মুসলমিদের অথবা ইউরোপ, আমেরিকায় বসবাসরত সেই দেশের মুসলমানদের উচিত, অন্যের ধর্মের মানুষের সাথে মেলামেশা করা, দাওয়ার দেওয়ার রীতি ও কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা—যা তাদের কাছে টানবে। তাদের মন-মগজে ইসলামের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা। মুসলমানদের প্রথম পরিচয় দায়ি, সত্য ও কল্যাণের আহ্বায়ক; প্রয়োজনে যোদ্ধা ও লড়াকু। যুদ্ধ হলো অনেক রোগের জন্য পথ্যস্বরূপ। মুসলমানরা কোনো যুগেই সীমালঙ্ঘনকারী নিপীড়ক ছিল না। প্রবৃত্তির পূজারি ছিল না। সম্পদের মোহে পড়েনি; বরং আল্লাহর পথের দায়ি ছিল।

একটা ব্যাপার বেশ বিস্ময়কর, নবিজির যুগে যুদ্ধগুলোতে নিহতের সংখ্যা কয়েক শতের চেয়ে বেশি নয়। তেইশ বছরে মাত্র কয়েক শত নিহত! অথচ আজ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ইসলামের ওপর যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাতে নিমিষেই হাজারো নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে। একটা যুদ্ধেই নিহতের সংখ্যা লাখের ঘর ছাড়িয়ে যায়। সেই যুদ্ধে নির্বিচারে আবাল বৃদ্ধা-বনিতা নিহত হয়। তাই এই দ্বীন হলো দয়া ও ভালোবাসার ধর্ম। সেই ভালোবাসার কান্ডারির নাম মুহাম্মাদ ﷺ!

মক্কায় খুবাইব

একবার রাসূল ﷺ কয়েকজন সাহাবার একটা ছোট্ট দল এক জায়গায় পাঠালেন। তাঁদের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় আসেম ইবনে সাবেত رضي الله عنه-এর ওপর। কিন্তু পথিমধ্যে মুশরিকরা তাঁদের বন্দি করে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনজন জীবিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের হত্যা না করার শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের একজন খুবাইব رضي الله عنه। মুশরিকরা তাঁকে ধরে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। মক্কার কিছু মুশরিক বদর যুদ্ধে পিতা হত্যার বদলা নিতে তাঁকে কিনে নেয়। খুবাইব رضي الله عنه বন্দি হন। মৃত্যুর প্রহর গুনতে শুরু করেন। তাঁর ছোট্ট বন্দিজীবনে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

প্রতারণার মুখেও বিশ্বস্ততা

বুখারি শরিফের বর্ণনায় এসেছে, খুবাইব رضي الله عنه বন্দিশালায় মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি ঘরের মালিকানের কাছে একটা খুর চান। উদ্দেশ্য ক্ষৌরকর্ম সারা। দাড়ি-মোচ কাটবেন। এরই ফাঁকে এক বাচ্চা তাঁর কাছে চলে আসে। মালিকানের ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা।

ঘরের মালিকান বলল, ‘হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম বাচ্চা নেই! সাথে সাথেই আমার মধ্যে একটা ভয়মিশ্রিত শিহরন খেলে গেল। আমার বাচ্চা কই গেল? চারপাশে খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ করেই খুবাইবের ওপর চোখ পড়ল। দেখলাম, তাঁর রানের ওপর আমার বাচ্চা বসে আছে। এই দৃশ্য দেখে আমি মরমে মরে গেলাম। দেখলাম, তাঁর হাতে একটা ধারাল ছুরি এবং বাচ্চাটি তাঁর কোলে।

সে একজন বন্দি, যে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। হতে পারে সে তাঁর প্রতিশোধ নেবে, বাচ্চাটাকে হত্যা করবে।’

খুবাইব رضي الله عنه মহিলার বিপর্যস্ত দশা দেখে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, ‘আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? ভাবছেন, আমি তাকে হত্যা করব? খোদার কসম! আমি তা করব না।’

দ্বন্দ্বের মর্যাদা

এই দ্বীনের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতিফলন ফাঁকা বুলি আওড়ানোতে নয়; নয় বড়ো বড়ো অসার দাবি। এই দ্বীনের শিক্ষা হলো মানুষের আচারণে, মন ও মগজে। মানুষের ছোটো-বড়ো সব ধরনের বাস্তবিক কাজে। এই মহান সাহাবি রিপুর তাড়নার বশবর্তী হয়ে যেকোনো কাজ করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। অথচ মানুষের স্বাভাবিক মেজাজ ও প্রকৃতি তেমনই বলে। কিন্তু এই মহান দ্বীন তাঁর মেজাজ ও প্রকৃতিকে পরিশীলিত ও মার্জিত করেছে। সর্বোপরি তাঁকে করেছে সভ্য ও উন্নত চরিত্রের বাহক। তিনি কিছুতেই বাচ্চাটাকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে পারেননি। কারণ, সে নিরপরাধ!

এই মহান বোধ ও শিক্ষা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত। নতুন করে ইসলামের উন্নত শিষ্টাচার শেখা উচিত। সমগ্র দুনিয়ার বোঝা উচিত, এই মহৎ শিক্ষা ও উন্নত মূল্যোবোধ একমাত্র ইসলামের। ইসলামের নবির শিক্ষা হলো—কখনো কোনো ছোটো বাচ্চা, বৃদ্ধ, কোনো নিরপরাধ নারী বা আশ্রমবাসীদের হত্যা না করা। এমনকী যুদ্ধের ময়দানে হলেও! এগুলোই নবিজির শিক্ষা। আবু বকর ও উমর ﵄-এর শিক্ষা।

সীমালঙ্ঘন করো না

আজকাল একটা ব্যাপার বেশ চলছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে অভিযান। এই সংগ্রাম অভিযানের মূল লক্ষ্য—মানবাধিকারের সুরক্ষা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, এগুলো আরও বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। বিশেষ করে যখন কোনো সৈন্যদল ভিনদেশে অভিযান চালায়, তখন কোনো ধরনের জবাবদিহিতার তোয়াক্কা থাকে না। নির্বিচারে অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়। মানবতার বারোটা বাজানো হয়। একের পর এক হামলা চালানো হয় তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য এবং মানবাধিকারের সুরক্ষার খাতিরে। নির্বিচারে মানুষ মারা হয়। তাদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আটঘাট বেঁধে নামা হয়। বড়ো বড়ো বুলি আওড়ানো হয়। কিন্তু ইসলাম আপন পদ্ধতি ও উপায়ে অধিকারের কথা বলে। এই ঘটনা মানবাধিকার রক্ষার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন। মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছেই এই কাহিনি একটা বার্তা দিয়ে যায়।

শত্রুপক্ষের এক বাচ্চা বসে আছে এক মৃত্যু পথযাত্রী বন্দির কোলে। সেই লোকটা নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা শিকার। তাঁকে বন্দি করা হয়েছে প্রতারণা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ছলে এবং ধোঁকায় ফেলে। এতসব কিছুর পরও বাচ্চার মাকে তিনি বলছেন—‘আপনি বাচ্চার ব্যাপারে ভয় পাবেন না, আমি তাকে হত্যা করব না।’

এই হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘আমানতকারীর কাছে তার আমানত যথাযথরূপে ফিরিয়ে দাও। যে তোমার সাথে প্রতারণা করেছে, তার সাথে কিছুতেই প্রতারণা করতে যাবে না।’ আবু দাউদ : ৩৫৩৪

আজ এই শিক্ষা থেকে মুসলিম যুবকরা কত দূরে! তারা খেল-তামাশায় মজে আছে। তাদের প্রতি কুরআনের নির্দেশ—

> ‘তুমি কিছুতেই কোনো শিশু, নারী বৃদ্ধ বা কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারো না।’

এই হলো যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদলের সাধারণ মানুষের সাথে আচরণের নির্দেশনা। তাহলে ভেবে দেখুন, অন্য ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে সংশয়ের অবকাশ থাকে, কেমন আচরণ করা চাই? শত্রুতার জের ধরে কি কোনো অমুসলিমকে হত্যা করা যাবে? কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিছুতেই সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।’ সূরা বাকারা : ১৯০

অন্য জায়গায় আরও বলা হয়েছে—

> ‘কোনো জাতি বা দলের প্রতি শত্রুতা যেন কিছুতেই তোমাদের অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে; বরং তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।’ সূরা মায়েদা : ৮

আর এক আয়াতে বলা হয়েছে—

> ‘তোমাদের মসজিদে হারামে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে কোনো দল বা জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে।’ সূরা মায়েদা : ২

যদি কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আপনার উচিত, তার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। কেউ আপনার সাথে প্রতারণা করলে আপনি তার সাথে প্রতারণার ফাঁদ পাতবেন না। কেউ আপনার প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন চালালে তার ওপর নির্যাতন চালাবেন না। কেউ আপনার সাথে বেইমানি করলে আপনি তার সাথে বেইমানি করবেন না। কেউ আপনার সম্মানহানি করলে আপনি তার সম্মানহানি করবেন না। এই হলো ইসলামের শিক্ষা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ। এমনকী ইসলাম যুদ্ধের ময়দানেও এই মূল্যোবোধ আঁকড়ে ধরে পথ চলতে বলেছে। মুসলমানরা কিছুতেই যেন এই মহান শিক্ষা বিস্মৃত না হয়।

জীবনের চেয়েও প্রিয়

খুবাইব ﵁-কে মক্কা থেকে বের করা হচ্ছে। মক্কার উপকণ্ঠে জনসমুদ্রের সামনে তাঁকে হত্যা করা হবে। তাঁকে বলা হলো—'আচ্ছা তুমি কি চাও তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ ﷺ-কে আনা হোক; আমরা তাঁকে হত্যা করব, তাঁর পরিবর্তে তুমি পরিবার-পরিজনের সাথে নিরাপদে থাকো?' তিনি বললেন, 'খোদার কসম! আমি ঘরে নিরাপদে বসে থাকি আর তার বিনিময়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর গায়ে একটা কাঁটাও বিদ্ধ হোক, তা-ও আমি চাই না।' অর্থাৎ 'নবিজির পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে আমার কাছে মৃত্যু অধিক প্রিয়।' এই হলো আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং নবিজির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন—যখন তাদের মাঝ থেকে একজন রাসূল তাদের কাছে পাঠিয়েছেন; যে তাদের মাঝে আয়াতের তিলাওয়াত করে, তাদের অন্তর বিশুদ্ধ করে এবং সর্বোপরি তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। পূর্বে তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মাঝে নিমজ্জিত ছিল।' সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

খুবাইব ﵁ নিজের জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবকিছুই আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। এমনকী এই কঠিন পরিস্থিতিতেও; যেখানে কাফির পর্যন্ত মুমিন হয়ে যায়, কবি চৈতন্য ফিরে পায় এবং মিথ্যুকরা সত্য কথা বলে। খুবাইব ﵁-এর এই বক্তব্য ছিল প্রত্যেক 'আশেকে রাসূল' নবিপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ের কথা। তাদের জীবনে রাসূলের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাব বা নববি শিক্ষার মূল কারণ হলো—এই উম্মাহর জন্য রাসূলের শিক্ষা। তিনি আমাদের নবি। আমরা তাঁর উম্মত। তাই তাঁর ভালোবাসা আমাদের হৃদয় গহিনে প্রোথিত আছে। যারা রাসূলপ্রেমের স্বাদ পায়নি, তারা ঈমানের স্বাদও পাবে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> 'তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।' সহিহ বুখারি : ১৪

শূলির কাষ্ঠে খুবাইব

খুবাইব ﵁-কে হত্যা করার জন্য খোলা প্রান্তরে আনা হলো। তখন তাঁর মধ্যে একটা ব্যাপার দেখা যায়।

খুবাইব তাদের কাছে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের অনুমতি চান। তারা অনুমতি দেয়; তিনি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন।

হৃদয়ের অটুট মনোবল ও সাহসিকতা একমাত্র তাদের মাঝেই পাওয়া যায়, যাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সুদৃঢ়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

'সুদিনে আল্লাহকে স্মরণ করো, দুর্দিনে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবে।' বায়হাকি : ১০৭৪

তিনি দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অবাক করার ব্যাপার, তিনি নামাজ দীর্ঘ করেননি; স্বল্প সময়ের ভেতরেই শেষ করেন। তারপর মুশরিকদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঈমানের মর্যাদা ও শক্তির সবক শেখালেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'যদি তোমরা এমন মনে না করতে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি, তবে আমি আরও সময় নিয়ে নামাজ আদায় করতাম।'

এই মহান শিক্ষা ও উন্নত মূল্যোবোধই মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন। প্রথম যুগের মর্দে মুমিনরা যে অতুলনীয় গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, তারই চর্চা হওয়া উচিত। তখনই মুসলিমরা আপন ধর্মের তাৎপর্য ও রহস্য জানতে পারবে। অমুসলমিদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা যাবে। অনেকে মনে করে—ইসলাম নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার ধর্ম, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ধর্ম। সর্বোপরি ইসলাম উগ্রতা শেখায়। তাদের কাছে যদি ইসলামের এই মানবিক শিক্ষা এবং সিরাতে নববির উজ্জ্বল দিক তুলে ধরা যায়, তাহলে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হবে। প্রথম যুগের মুসলমানদের মতো জীবনের পথচলায়, নানা কর্মকাণ্ডে এবং সর্বোপরি প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের বাস্তব রূপায়ন ঘটানো যায়, তবে বিশ্ব আবার অবাক তাকিয়ে রইবে; ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় খুঁজে পাবে।

ক্ষমা ও সদাচরণ দিবস

বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি মক্কা বিজয়ের পর কাবায় প্রবেশ করলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, তাতে ৩৬০টি প্রতিমা! নবিজি হাতের লাঠি দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে লাগলেন। একটার পর এক মূর্তিগুলো মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'সত্যের আগমন ঘটেছে, আর মিথ্যা বিলীন হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলীয়মান। সত্যের আগমন ঘটেছে, মিথ্যা কখনোই প্রকাশ পাবে না, কখনো ফিরেও আসবে না।'

হিজরি অষ্টম বর্ষে মক্কা বিজয়ের পর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে শুধু মসজিদে হারামই মুসলমানদের কর্তৃত্বে আসেনি; বরং সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের কর্তৃত্বে আসে। সেদিন থেকে ইসলাম ভিন্ন এক উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তখন থেকে ইসলাম বিজয় ও সংস্কারের এক প্রতীকী নামে রূপান্তরিত হয়।

মক্কা ইসলাম ও রাসূল ﷺ-এর জন্য খুবই বৈরী ছিল। এই শহরের আবহাওয়া ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের অনুকূলে ছিল না। রাসূল ﷺ এক বুক কষ্ট নিয়ে মক্কা ছেড়েছিলেন। তখন মাতৃভূমি ত্যাগের কষ্ট তাঁকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছিল। তিনি বারবার মক্কাপানে দৃষ্টি রেখে বলছিলেন—

> 'খোদার কসম! নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান। যদি আমাকে বের করে দেওয়া না হতো, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'

কুরআন রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—

> 'নিশ্চয় যে মহান সত্তা আপনার ওপর কুরআন অর্পণ করেছে, তিনি নিশ্চয় আপনাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে নেবেন।' সূরা কাসাস : ৮৫

এই তো নবিজি ﷺ ফিরে এসেছেন। এই তো মুসলিম সৈন্যরা বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করছে। মক্কা বিজয় ছিল একটা মাইলফলক। রক্তপাতহীন বিজয়। এমনকী কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, অনায়াসেই মক্কা বিজয় হয়েছে; কোনো প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই।

আবার অন্যরা বলেছেন; বরং শক্তি প্রয়োগ এবং যুদ্ধে জড়িয়েই মক্কা বিজয় হয়েছে। শেষের বক্তব্য ধরে নিলেও সত্যের খাতিরে বলতে হয়, মক্কা বিজয়ে নিহতের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। এতে অনেক বড়ো একটা ইঙ্গিত রয়েছে। ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য কিছুতেই মানুষ হত্যা করা নয়; বরং মানুষকে সঠিক ও সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান এবং তাদের রবের দিকে পথপ্রদর্শন করা।

জিহাদ প্রতিপত্তি ও সম্প্রসারণের হাতিয়ার নয়

ইসলামে জিহাদের নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। জিহাদ সর্বদা আপন লক্ষ্যেই স্থির থাকে। মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত কিংবা মানুষকে দাস বানানো জিহাদের লক্ষ্য নয়; বরং জিহাদ মানুষকে খোদার পথের সন্ধান দেয়, শোষণ ও নৈরাজ্য দূর করে। প্রাচীনকালে পারস্য ও বাইজান্টাইন শাসকরা মানুষের ওপর উৎপীড়ন চালাত। মানুষ তাদের গোলামে পরিণত হয়। ঠিক এমন সময় নবিজির আবির্ভাব ঘটে। দুনিয়ায় বিদ্যমান রীতির পরিবর্তন ঘটায়। মানুষের অধিকার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে অন্যের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বের করে আনে, স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখায়। আল্লাহর পথের সন্ধান দেয়।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় এবং দুর্বলদের রক্ষায় জিহাদ করছ না?’ সূরা নিসা : ৭৫

রাসূল ﷺ মক্কা বিজয় করলেন। বাইতুল্লায় প্রবেশ করে একের পর এক প্রতিমা ভাঙতে শুরু করেন। পৌত্তলিকতা মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। রাসূল ﷺ-এর ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে—‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই!’

ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে শুভ্র, স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষতার ইতিহাস; কোথাও কোনো কালিমা নেই। হ্যাঁ, পরবর্তী যুগগুলোতে পার্থিব লোভ ও দম্ভ দেখা যায়। তবে তা অনেক কম। ইতিহাস তো বিবেচনায় আনা হয় না; বরং জীবনাচারে, প্রাত্যহিক লেনাদেনায় দ্বীনের মূল রূপ ফুটে ওঠে। বাস্তব জীবনে ইসলামের চর্চাই মূল ব্যাপার। তারপরও ইতিহাসকে এড়ানো যায় না। ইসলামের বিজয়গাঁথার সোনালি অধ্যায়কে ভুলে থাকা যায় না। ইসলামের শত্রুরাই এ কথা স্বীকার করেছে। পাশ্চাত্যের লেখক এই মহাসত্যকে এড়াতে পারেনি; স্বীকার করে নিয়েছে।

এক ব্রিটিশ লেখক আরনল্ড তুইনবি বলছেন—

> ‘ইতিহাসের পাতায় আরবদের চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু কোনো বিজেতার দেখা মেলে না।’

মক্কা বিজয় ছিল ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে হয়েছিল এই বিজয়। তিনি মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেন, তাদের কাছে মূল ব্যাপার তুলে ধরেন। এই মহান বিজয় মানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, স্বচ্ছ ও শুভ্র অধ্যায়। মানুষের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য মাইলফলক; ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও সমান অধিকারের এক সমুজ্জ্বল পর্ব।

দুনিয়ার সনদগুলো অন্যায় ও অবিচারের সনদ

অনেকেই ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন। ইসলামের বিজয়গাঁথা ও সোনালি অধ্যায়গুলোর কথা বলেছেন। সবাই এই দ্বীনের বড়োত্বের কথা স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের অনুপম চরিত্র ও উন্নত মূল্যবোধের কথা—যা দিয়ে একের পর এক বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা তুলে ধরেছেন। মুসলমানরা দেশ জয়ের আগে মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। ইসলামের প্রথমদিকে যে জাতিগুলো বিজিত হয়েছে, ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ঈমান কবুল করেছে, তারাই আজ ইসলামের সেবক ও রক্ষক। ইসলামের তরেই তারা জীবন বাজি রাখে। তারা ইসলামের বর্তমান হালচাল নিয়ে ভাবে। মুসলমানদের দুর্দশা তাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা অতীতে যেমন ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস রচনায় জান বাজি রেখেছে, তেমনি বর্তমান বিনির্মাণেও তৎপরতা দেখিয়েছে। কারণ, ইসলাম তাদের সাথে বেইমানি করেনি, অন্যায়-অবিচার চালায়নি। অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তাদের দেশ কেড়ে নেয়নি; বরং ইসলামের সৌন্দর্যে তারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ইসলাম তাদের রক্ষকে পরিণত হয়।

বিজিত জাতিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের কাছে যে নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা ও অধিকার পেয়েছে, তা তাদের স্বজাতির শাসকের কাছে পায়নি। তাই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ভালোবেসে ফেলে। তাদের প্রভাব মেনে নেয়, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং বিজয়ী দ্বীনকে গ্রহণ করে। এই মহান আসমানি ধর্ম সত্য, সুবিচার, অনুপম চরিত্র এবং উন্নত মূল্যোবোধের মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। পরে দেশ জয় করেছে। আজ মুসলমানরা তাদের মূল সম্পদ চরিত্র, সততা ও নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের কথায় ও কাজে কুরআনের ছাপ দেখা যায় না। সত্য ও ইনসাফের মূল ভাষ্য হারিয়ে ফেলেছে।

নিষ্ঠা ও সদাচারণের দিন

জাহেলি যুগে কাবা ঘরের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল শাইবা বংশের ওপর। মক্কা বিজয় হলে আলি ইবনে আবি তালিব রাসূলের কাছে এলেন, তাঁর হাতে বাইতুল্লাহ চাবি। তিনি বললেন–‘হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আমাদের হাতে জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি কাবা ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও অর্পণ করুন।’ তখন রাসূল ﷺ বলেন, ‘উসমান ইবন তালহা কোথায়?’ তাঁকে ডাকা হলো। নবিজি তাঁকে বললেন–‘এই নাও তোমার চাবি। আজ সদাচরণ ও বিশ্বস্ততার দিন।’

নবিজির এই শিক্ষা ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে আছে। মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা, সদাচারণ, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ওপর জোর দেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি এই বার্তা দেন, এই ধর্ম মানবিকতা ও সদাচারণের ধর্ম। এই ধর্ম জীবনে আনন্দ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে, মানুষের হৃদয়কে তৃপ্তি ও খুশিতে ভরে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো তার দিকে ঝুঁকে পড়া।

তারা যেন আনন্দিত হয়

মক্কা বিজয়ে মুসলমানরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এমন আনন্দ তাদের জীবনে আর কখনোই আসেনি। ইতঃপূর্বে রাসূল ﷺ মুসলমানদের শিখিয়েছেন, খুশি ও আনন্দ জীবনেরই অংশ। একজন দাসেরও আনন্দিত হওয়ার অধিকার আছে; অন্তত দ্বীনি কাজের মাধ্যমে হলেও। যেমন : ইলম, আমল, বন্দেগি, রোজা, নামাজ, কুরআনের শিক্ষা ও দাওয়াত, কোনো কাজে সফলতা ইত্যাদি। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা বলুন। এতেই যেন তারা আনন্দিত হয়। তা-ই তাদের জন্য তাদের জমানো সম্পদের চেয়ে উত্তম।’

অথবা পার্থিব ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া। কুরআনে তার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, ‘তারা যা জমায়’ যদিও-বা প্রথমটা। অর্থাৎ দ্বীনি ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া উত্তম, কিন্তু পরেরটাও তথা পার্থিব ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হওয়াও নিষিদ্ধ নয়। দ্বীনের সীমা ও পরিধির ভেতরে থেকে পার্থিব বিষয়ে আনন্দিত হওয়া যাবে। মানুষ তার সফলতা, অগ্রগতি ও পারঙ্গমতা, উন্নত জীবন, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে আনন্দিত হতে পারে। এই আনন্দ কিছুতেই নিন্দনীয় নয়; বরং তা প্রশংসনীয়, মানুষের মন-মেজাজের সাথে মেলে যায়।

জীবন মানে সদা-সর্বদা কঠোর নির্দেশনা পালন নয়; বরং মানব জীবনে বিশ্রাম ও অবকাশের প্রয়োজন আছে। বিনোদন ও আনন্দ উদ্‌যাপনের সুযোগ আছে। মনে প্রশান্তি আনে এমন বৈধ কাজ করার অনুমতি আছে। দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্র আছে। জীবন মানেই হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। জীবনে আনন্দ যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি দুঃখও চিরদিন থাকে না। জীবনে প্রতিকূলতা আসবে, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা থাকবে—এটাই দুনিয়ার রীতি। কিন্তু তাই বলে ভেঙে পড়া যাবে না। জীবনমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আনন্দ ও খুশিতে থাকতে হবে। খোদার বিধান মেনে আনন্দ করতে কোনো সমস্যা নেই। আনন্দ-উচ্ছ্বাস মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। জীবনের সম্ভাবনা ও পারঙ্গমতা বৃদ্ধি করে। সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

তাই জীবনে বিনোদনের বিকল্প নেই। চিত্তবিনোদন প্রাণে সঞ্জীবনী আনে। এমনকী অতি ব্যস্ত ও দৃঢ়চেতা মানুষের মনেও প্রশান্তি আনে। উমর رضي الله عنه নিজের মনকে শান্ত করতে কবিতা আবৃত্তি করতেন।

কৌতুক ও রসিকতা করতেন। খোদ রাসূল ﷺ এই শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ উমর ﵁-এর কথা এলেই মনে পড়ে দৃঢ়চেতা কঠিন ব্যক্তিত্বের এক মানুষের ছবি; যে হাসে না, আনন্দ উদ্‌যাপন করে না। অথচ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

উমর ﵁ ইহরাম বেঁধে হজের সফরে চলছেন। উটের ওপর বসে আছেন। কখনো দ্রুত আবার কখনো ধীর লয়ে এগিয়ে চলেছেন। চারপাশের সবাই উচ্চৈঃস্বরে বলছে–'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।'

একদিনের ঘটনা। উমর ﵁ ইবনে আব্বাসের সাথে বাজি ধরলেন—কে পানির ভেতর দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারে! ইবনে আব্বাস তখন বাচ্চা ছেলে মাত্র। বড়োজোর তেরো-চোদ্দো বছর বয়স। বয়ঃসন্ধিকালীন সময়। দুজনেই মাঝে বয়সের আকাশ-পাতাল তফাত। তাঁর সাথে উমর ﵁ পানিতে ডুব দিয়েছে কে দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারে—পরখ করে দেখার জন্য!

উসমান ﵁-কে প্রশ্ন করা হলো—'আচ্ছা, হজের সময় মাহরাম কি "বুসতান"-এ তথা পার্কে প্রবেশ করতে পারবে? তখন তিনি জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, সাথে "রাইহান"-এর ঘ্রাণও নিতে পারবে।'

বিনোদন মনের অধিকার

এই ছিল সাহাবা তথা ইসলামের বড়ো বড়ো ইমাম ও আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি—মনকে মনের অধিকার দেওয়া, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। এমনকী ইমাম শাফেয়ি বলতেন—

> 'বাগানে (পার্কে) গুরুগম্ভীর হয়ে থাকা কিছুতেই গাম্ভীর্যের পরিচয় নয়।'

তিনি কখনো কখনো বাগানে (পার্কে) গেলে পাগড়ি খুলে বসতেন। আশপাশের সবার সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন, মজা করতেন এবং মৃদু আলাপ করতেন। ছোটো-বড়ো, শিশু-কিশোর, যুবক—সবার সাথেই কথা বলতেন। জীবনের চাপ কমাতেন, আনন্দ করতেন।

এক ঈদের দিনে রাসূল ﷺ আয়িশা ﵂-এর কক্ষে শুয়েছিলেন। তাঁর মাথার কাছে দুইজন বালিকা তবলা বাজিয়ে জাহিলি যুগের আরবদের গান করছিল। এমন সময় সেখানে আবু বকর ﵁ আগমন করেন। তিনি তাদের দেখে ধমক দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের বাঁশি বাজানো হচ্ছে?' তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন–'আবু বকর! গাইতে দাও। তাদের ঈদের দিন বলে কথা।'

কিছু নিগ্রো একদিন মসজিদে বর্শা নিয়ে খেলছিল। তা দেখে রাসূল ﷺ তাদের বললেন, 'খেলো।' অন্য রেওয়াতে আছে—

> 'বনি আরফিদা! তোমরা তা গ্রহণ করো। ইহুদি, খ্রিষ্টানরা জানুক—আমাদের ধর্মেও বিনোদন আছে।' সহিহ বুখারি : ৯৫০

হ্যাঁ, আমাদের ধর্মে অবকাশ যাপনের সুযোগ আছে। আমাদের উচিত, উত্তমরূপে অবকাশ যাপন করা। কারণ, একনাগাড়ে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে গেলে কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তা ছাড়া মানুষ লাগাতার কাজ করে যেতে পারে না। অবকাশ যাপনের এই সুযোগকে সঠিক কাজে বিনিয়োগ করা উচিত। ধর্মীয় বিধানের আলোকে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার, যেন কিছুতেই আনন্দ ভ্রমণ বা শিক্ষা সফরের নামে শরিয়াহ পরিপন্থি কাজ না হয়।

বিনোদনে হালাল-হারাম

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষ অনায়াসেই হালাল-হারামের মাঝে তফাত করতে পারে। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘হালাল ও হারাম উভয়টাই স্পষ্ট। উভয়ের মাঝে কিছু অস্পষ্ট ব্যাপার আছে—অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।’ সহিহ বুখারি : ৫২

অর্থাৎ অনেক হালাল স্পষ্ট আবার অনেক হারাম কাজও স্পষ্ট। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রাসূল ﷺ-কে পাপ ও ভালো কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—

> ‘ভালো কাজ যা হৃদয়কে প্রশান্ত করে, আত্মাকে শান্ত করে। পাপ হলো—যা অন্তরে কালো দাগ ফেলে দেয়, হৃদয়ে দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করে।’ তাবরানি : ২২

অধিকাংশ সময় মানুষ মনের ঝোঁক ও প্রবণতা এবং অন্তরের কথা শুনেই বুঝতে পারে, সে খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রতারণা, মোহ ও প্রবৃত্তির নেশায় সাড়া দিচ্ছে। শয়তানের ফাঁদে পা দিচ্ছে। আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। এর অর্থ হলো, সে দিকে যাওয়া বিপজ্জনক। তাই এই ধরনের অবকাশ যাপন কিংবা বিনোদন শরিয়াহ সমর্থিত নয়। এসব গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকাই হলো সত্যিকার মুসলিমের কাজ।

শুধু হালাল ও বৈধ কাজগুলো জানাটাই যথেষ্ট। হালাল কাজের মাঝে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মন্ত্র আছে। মানুষ যদি হালাল পথেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে নানা পথে তার কল্যাণ আসবে—

প্রথমত : স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নিরাপদ জীবন। অন্তরের স্বচ্ছতা ও পরিশুদ্ধি। মনোবলের দৃঢ়তা ও অবিচলতা।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার সুযোগ। উন্নত মূল্যবোধ বাস্তবায়নের সুযোগ।

কিছু মানুষ আছে যারা রসিকতা ও গাম্ভীর্যের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। কিছু মানুষকে বিয়ের অনুষ্ঠানেও বিমর্ষ দেখা যায়, ঈদের দিনেও বিষণ্ন মনে হয়। নির্দোষ হাসির কথাতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে। অনেক মানুষ আছে যারা নির্ঝঞ্ঝা আয়োজন—অনুষ্ঠান, বিভিন্ন খুশির উপলক্ষ্যকে নানা সংশয়পূর্ণ উক্তি ও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। অহেতুক তর্ক ও অর্থহীন আলাপে জড়িয়ে পড়ে।

অথচ অবকাশ যাপন বা বিনোদন এটা থেকে যোজন যোজন দূরে। আবার কিছু মানুষ মনে করে, বিনোদনের ক্ষেত্রে শরিয়াহতে কিছু শিথিলতা আছে। তারা হারাম বস্তুকেও হালালের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিনোদনের নামে অবৈধ ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়। অথচ তা আল্লাহ পছন্দ করে না। মুহাম্মাদ ﷺ তাদের এই অবস্থায় দেখলে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতেন। কেনই-বা লজ্জিত হবেন না? খোদ আল্লাহ তা দেখছেন! আমাদের ধর্মে বিনোদনের সুযোগ আছে। অধিকাংশ মানুষই তার সঠিক মর্ম বোঝে না; উলটো ভুল অর্থ গ্রহণ করে থাকে। রাসূল ﷺ হলেন আমাদের নেতা ও আদর্শ। তিনি নিজে আনন্দ করেছেন এবং করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহাবাদের আনন্দ করতে শিখিয়েছেন। আয়িশা ؓ-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আয়িশা ؓ একবার রাসূল ﷺ-কে পরাজিত করেছেন, অন্যবার রাসূল ﷺ আয়িশা ؓ-কে পরাজিত করেছেন এবং বলেছেন, 'এটা আগেরটার বদলা!'

রাসূল ﷺ -এর এক বেদুইন বন্ধু ছিল, জাহির আল আসলামি। একদিন রাসূল ﷺ তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। সবাইকে লক্ষ করে বলেন—'এই গোলামটা কে কিনবে? এই গোলামটা কে কিনবে?' তিনি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, রাসূল ﷺ। তারপর আস্তে আস্তে নিজের পিঠ রাসূল ﷺ পেটের সাথে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার ভালো মূল্য পাবেন না।' রাসূল বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমার মূল্য আছে।'

একদিন রাসূল ﷺ-এর কাছে এক মহিলা এসে তার স্বামীর খোঁজ করে। রাসূল ﷺ তাকে বললেন—'ও! ওই ব্যক্তি যার চোখে শুভ্রতা আছে?' এ কথা শুনে মহিলা ভয় পেয়ে গেল। তার অসহায়তা দেখে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'প্রত্যেক মানুষের চোখেই শুভ্রতা আছে।'

আরেক দিনের কথা। সেদিনও রাসূল ﷺ-এর কাছে এক মহিলা এলো। মহিলাটি আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দুআ করুন।' রাসূল ﷺ মজা করে বললেন—'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' মহিলা কান্না করতে করতে ফিরে যেতে লাগল। তখন রাসূল ﷺ হেসে বললেন—'তাকে বলো, বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> "তাদের আমি উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছি, কুমারী করেছি, সোহাগি ও সমবয়সি করেছি ডানপন্থি লোকদের জন্য।"' সূরা ওয়াকিয়া : ৩৫-৩৭

অতিরিক্ত ভেক ধরা যেমন গাম্ভীর্যের পরিচয় বহন করে না, তেমনি সর্বদা কঠোর কঠিন ব্যক্তিত্ব ধরে রাখাও গাম্ভীর্য নয়। মুচকি হাসা, উত্তম কথা বলা সাদাকাহ। অধীনস্থ মানুষের সাথে যেমন : স্ত্রী, সন্তান, শিক্ষার্থী প্রমুখ উত্তম আচরণ ও কোমল কথা বলা সাদাকাহ। ইসলামের এই শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। তার চর্চা ও বিকাশে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

খাদিজা رضي الله عنها-এর গৃহে

পবিত্র প্রেম

খাদিজা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-এর সাথে মক্কায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। রাসূল ﷺ তখন উঠতি তরুণ, টগবগে যুবক। অথচ তখন খাদিজা رضي الله عنها-এর বয়স ছিল চল্লিশের কোঠায়। খাদিজা رضي الله عنها বেঁচে থাকতে তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সাথে সংসার করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সকল সন্তানের মা। শুধু মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে ইবরাহিমের জন্ম হয়।

রাসূল ﷺ খাদিজা رضي الله عنها-কে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। ব্যাবসার সূত্রে তাঁর সাথে পরিচয়। খাদিজার কিছু সম্পদ নিয়ে শাম দেশের বাজারে যান তাঁরই এক গোলামকে সঙ্গে নিয়ে। কল্পনাতীত লাভ নিয়ে ফিরে আসেন। খাদিজা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-এর মধ্যে সততা, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা দেখতে পান। রাসূল ﷺ-এর যথেষ্ট কদর করেন। তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং বিয়ে হয়।

সোনালি স্মৃতি

খাদিজা رضي الله عنها ইন্তেকালের পর নবিজি প্রায়শই তাঁর কথা বলতেন, প্রশংসা করতেন। এতে আয়িশা رضي الله عنها চটে যেতেন, অথচ তিনি তাঁকে দেখেননি। আয়িশা رضي الله عنها-এর বিয়ে হয় বেশ ছোটো বয়সেই। রাসূল ﷺ তাঁকে সাত বছর বয়সে বিয়ে করেন। নয় বছর বয়সে তাঁর সাথে সংসার শুরু করেন। নবিজির ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। এরপরও আয়িশা رضي الله عنها নবিজিকে খাদিজার স্মৃতিচারণ করতে দেখলে কাতর হতেন।

অনন্য বিশ্বস্ততা

একদিন এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। ওই মহিলার গলার স্বর অনেকটা খাদিজা رضي الله عنها-এর গলার স্বরের সাথে মিলে যায়। রাসূল ﷺ প্রশ্ন করলেন—'কে এই ভদ্রমহিলা?'

দেখলেন ওই মহিলা খাদিজা ﵂-এর বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂। নবিজি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—'আল্লাহুম্মা ইয়া হালা!'

রাসূল ﷺ কখনো ছাগী জবেহ করলে তা খাদিজা ﵂-এর বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। নবিজি প্রায়শই তাঁর কথা বলতেন। এমনকী একদিন আয়িশা ﵂ তাঁকে বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন কুরাইশের লাল গালবিশিষ্ট এক বৃদ্ধার কথা বারবার স্মরণ করেন? যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর চেয়ে উত্তম বিকল্প আপনাকে দিয়েছেন।' তিনি এ কথা বলে মূলত নিজেকে বোঝাতেন। কিন্তু নবিজি এতে দমে যেতেন না; বরং আরও বেশি করে চালিয়ে যেতেন। আর আয়িশাকে লক্ষ্য করে বলতেন, 'আল্লাহ আমাকে তাঁর বিকল্প দেননি।' অন্য বর্ণনায় এসেছে—'তিনি এমন এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তান হয়েছে।' নবিজি সরল বিশ্বাসের সাথেই বলতেন, 'আমি তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি।'

রাসূল ﷺ স্ত্রীর প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এ থেকে কিছু ব্যাপার স্পষ্ট হয়—

প্রথমত : বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রাখার এক বিরল দৃষ্টান্ত। এমনকী এক পর্যায়ে নবি ﷺ বলেন—

> 'উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাটা ঈমানের অঙ্গ।' বায়হাকি : **৯১২২**

খাদিজা ﵂-এর জীবনের অবসান ঘটে, কিন্তু রাসূলের হৃদয় থেকে তাঁর ভালোবাসার অবসান ঘটেনি; বরং নবিজি প্রকাশ্যে গর্ব করে বলতেন, 'আমি তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি।' নবিজি খাদিজা ﵂-এর ভালোবাসাকে 'রিজক' ভাবতেন। তিনি এ কথা সাহাবাদের উপস্থিতিতে বলতেও লজ্জাবোধ করতেন না। বিয়ে ভাঙনের সময়ে মানুষ নবিজির অনুপম ভালোবাসা আর বিরল বিশ্বস্ততা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মানবতার মহান শিক্ষকের কাছে প্রীতি ও ভালোবাসার সবক নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত : মানুষের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে রাসূলের জীবনের এই অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিনির্মাণে; হয়তো বিয়ের প্রথম দিকে স্বামী-স্ত্রী দুজনই পরম সুখে দিন পার করে। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন থাকবে? সারা জীবন কি এই উষ্ণ সম্পর্ক ঠিকে থাকবে? নাকি কিছুদিন পরেই নানা ঝড়-ঝাপটা আসবে; জীবনের রং বদলাবে, নানা বিপদ-আপদ দেখা দেবে, চিৎকার-চেঁচামেচি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব সর্বোপরি নানা প্রতিকূলতা আসবে?

দাম্পত্য জীবনের কিছু দায়িত্ব আছে। ইসলামি পরিবারগুলো যে টিকে থাকে, তার কারণ হলো—ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা। প্রতিটা মুসলমানের উচিত, বিশেষ করে 'আকাশ সংস্কৃতি'-এর এই যুগে, যেখানে নারী-পুরুষ সবারই একই দশা,

সারাক্ষণ টিভিতে, বিভিন্ন মাধ্যমে নানা ফিল্ম, সিরিয়াল, ভিডিও গান—এমন আরও অনেক কিছু দেখছে—যা তাদের রিপুর তাড়নার প্রতি এবং প্রবৃত্তির নেশার দিকে ঠেলে দেয়। এই ফিল্ম আর সিরিয়ালগুলোই নানা বিপত্তি বাধায়। কারণ, নারী কিংবা পুরুষ তার স্বামী কিংবা স্ত্রীর মধ্যে টিভির পর্দায় দেখা নায়ক-নায়িকার গুণাবলি চায়। কিন্তু বাস্তবে তা মেলে না; না শারীরিক অবকাঠামোয়, না চেহারাগত সৌন্দর্যে। এক্ষেত্রেই বিশ্বস্ততা ও খাদহীন ভালোবাসার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজের মধ্যে হওয়া চুক্তিকে অটুট রাখার প্রয়োজন হয়। এই বন্ধনকে কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘দৃঢ় অটুট চুক্তি।’ সূরা নিসা : ২১

যেন তা শুধু একটা সামান্য কাগজ কিংবা আকৃতিতে পরিণত না হয়; বৈবাহিক জীবন যেন ভেঙে না পড়ে, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে না যায়।

আজ মানবসমাজ এমন জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। বিয়ের আগে যেমন এই শিক্ষা দরকার, তেমনি বিয়ের পরও দরকার। দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখতে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করতে হবে। ত্যাগ ও ধৈর্যের মাধ্যমেই সমস্ত প্রতিকূলতা পার করতে হবে।

তৃতীয় : বন্ধুদের সাথে বিশ্বস্ত থাকা। যেমন : সহকর্মী, ক্লাসমেট প্রমুখ। আমরা সবাই জীবন চলার পথে নানা স্তর অতিক্রম করি; প্রাইমারি, হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিটি স্তরেই নতুন নতুন মুখের সাথে পরিচয় ঘটে, বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকা হয় না। সবাই জীবনের প্রয়োজনে আলাদা হয়ে যায়। আপন কাজের সূত্রে হারিয়ে যায়। নানা জায়গায়, নানা দেশে পাড়ি জমায়। সাথে সাথে সবার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। কিন্তু এত সবকিছুর পরেও বন্ধুত্ব টিকে থাকে, সম্পর্ক অটুট রয়ে যায়।

ঠিক তেমনিভাবে তাদের কাছেও বিশ্বস্ত থাকা—যাদের সাথে পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করেছেন, কর্মক্ষেত্রে কাজ করেছেন; দাওয়াতের পথে হেঁটেছেন কিংবা পার্থিব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকী আপনার প্রতিবেশী—যাদের সাথে দীর্ঘ সময় একই পাড়ায় বসবাস করেছেন, শৈশব-কৈশোরে দুরন্তপনায় মুখর দিনগুলো কাটিয়েছেন, কিন্তু আজ জীবনের প্রয়োজনে, সময়ের তাগিদে তারা অন্য এলাকায় চলে গেছে। তবে সবাই আপন স্মৃতিতে গেঁথে আছে। হয়তো তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়ে উঠে না, কিন্তু ফোনে, মেসেজে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ হয়। রমজানের আগমনে, ঈদে কিংবা বিশেষ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

আচ্ছা, পুরোনো বন্ধুদের সাথে মাসে কিংবা ছয় মাসে বা বছরের মাথায় অন্তত একবার হলেও কি একটা পুনর্মিলনীতে অংশ নেওয়া যায় না? সবাই একসঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায় না? পুরোনো দিনের স্মৃতির রোমন্থন করা যায় না?

তা-ও সম্ভব না হলে অন্তত হৃদয়ে তার জন্য ভালোবাসা পুষে রাখা। পথ চলতে কিংবা কোনো উপলক্ষ্যে বা হঠাৎ করেই যদি তার সাথে দেখা হয়ে যায়, তখন উষ্ণতার সঙ্গে তাকে অভিভাবদন জানানো, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা, মিষ্টি ভাষায় কথা বলা। কিছুতেই বিমর্ষ মন নিয়ে, শুকনো হাসি দিয়ে তার সাথে আলাপ না করা; বরং প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা মন নিয়ে দিল খুলে তার সাথে কথা বলা। এতদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও দূরে থাকার জন্য পরিতাপ করা। বিচ্ছিন্নতার জন্য জীবন-জীবিকার চাপ, কাজের ব্যস্ততা এবং চারপাশের ঝামেলাসহ এমন আরও অনেক কারণ থাকতে পারে।

আমাদের শৈশবের বন্ধু, যৌবনের ইয়ার-দোস্ত, ক্লাসমেট, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং পথচলার সঙ্গী সবার সাথেই উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। জীবনে চলার পথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হওয়া মানুষের সাথে সর্বদাই ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত।

চতুর্থ : বিশ্বস্ততার সবচেয়ে উত্তম রূপ হলো—যারা আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা। কারণ, যে হৃদয় মানুষের উপকার ও কল্যাণ স্বীকার করে—তা উন্নত হৃদয়। ইসলাম সর্বদা অন্যের প্রতি সদাচারণ ও অনুগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। তার বিনিময়ে অকৃতজ্ঞ না হতে, অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। কারণ, অকৃতজ্ঞতা মানুষের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব, অন্যজনকে ওই কাজ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষ যখন বুঝবে আজ ভালো কাজ করলে কাল অকৃতজ্ঞ আচরণ পেতে হবে, তখন সে অন্যের প্রতি ভালো আচরণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

আপনি কোনো মানুষের উপকার করেছেন। বিনিময়ে সে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তখন আপনার মন বিষিয়ে উঠবে, অন্যের উপকার করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। আপনি প্রায়শই মানুষকে এমন অভিযোগ করতে শুনবেন—মানুষ অকৃতজ্ঞ, দুরাচারী, উপকারের কথা মনে রাখে না। তাই মানুষের উপকার করতে যাওয়া বোকামি। আসলে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না; বরং উপকার করে যান, অন্যের কথাগুলো ছুড়ে ফেলুন। উপকার করে তা ভুলে যান, চোখের তারায় রাখবেন না। হ্যাঁ, কখনো সুযোগ হলে উপযুক্ত উপলক্ষ্য পেলে বলবেন, তবে কিছুতেই ঠোঁটের ডগায় রাখবেন না।

আপনাকে যারা জীবনে চলার পথে সুপরামর্শ দিয়েছে, শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়েছে, হতে পারে আপনার খুব ছোটোবেলার কোনো শিক্ষক কিংবা কোনো বয়োবৃদ্ধ মুরব্বি—সবার প্রতিই ভালো আচরণ করবেন। তাদের উপকারের কথা স্মরণ রাখবেন। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন—

> 'সেই ব্যক্তি স্বাধীন, যে মুহূর্তের ভালোবাসাকেও স্বরণ রাখে অথবা উপকার করা একটা শব্দের কথাও মনে রাখে।'

স্বাধীন শব্দটা এসেছে স্বাধীনতা থেকে। অর্থ হলো—পৌরুষ, উদারতা এবং উন্নত অনুপম চরিত্র। ইমাম শাফেয়ি 'স্বাধীন' শব্দটার ব্যাখ্যা করেছেন—'নিশ্চয় স্বাধীন ও মুক্তমনের মানুষ মুহূর্তের উপকারও স্মরণ রাখবে। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও সে উপকারের কথা ভোলে না। ক্ষণিকের উপকারের কথা মনে রাখে।'

ঠিক তেমনি কোনো ব্যক্তি যদি তাকে একটা বর্ণও শিক্ষা দেয়, সে তার উপকারের কথা স্মরণ রাখে, তা স্বীকার করে, তার জন্য দুআ করে।

পঞ্চম : মানুষের প্রতি উত্তম ও সদাচারণের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো—পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ। মানুষ বাল্যবেলায় মা-বাবাকে নিয়ে ভাবে, তাদের কষ্ট ও ত্যাগের কথা চিন্তা করে বটে, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে না। নিজেরা যখন মা-বাবা হয়, কেবল তখনই তাদের প্রতি পিতা-মাতার প্রেম ও ভালোবাসা, মায়া ও মমতা বুঝতে পারে। পিতার ত্যাগের কথা জানতে পারে। উপলব্ধি হয়—একমাত্র পিতাই নিজের ওপর সন্তানকে প্রাধান্য দিতে পারে, নিজের ভাগ ছেড়ে দিতে পারে।

নুহ عليه السلام-এর সম্প্রদায়ের ওপর যখন প্রলয়ংকরী তুফান শুরু হয়, তখন এক মহিলা নিজের সন্তানকে বুকে আগলে বেরিয়ে পড়ে। তুফান যতই বাড়তে থাকে, মহিলা নিজের সন্তানকে নিয়ে ততই ওপরের দিকে উঠতে থাকে। পানি বাড়ার সাথে সাথে মহিলা ওপরের দিকে উঠে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পানি মহিলার গলা পর্যন্ত উঠে গেল, তারপর মাথা পর্যন্ত, মহিলা তখনও নিজের সন্তানকে ওপরের দিকে তুলে রাখে এই আশায়, যদি তার সন্তানকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে! তাই একটা প্রবাদ আছে—'কওমে নুহের কেউ যদি কারও প্রতি দয়া করে থাকে, তবে সেই মা তার বাচ্চার প্রতি দয়া করেছে।'

তীব্র উপচে পড়া ভালোবাসায় পূর্ণ পিতৃ ও মাতৃ-মমতাকে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত; তাদের জন্য দুআ এবং তাদের সাথে সদয়পূর্ণ আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'তাঁদের "উফ" শব্দটিও বলবে না এবং ধমক দেবে না। তাঁদের সাথে উত্তম কথা বলো এবং তাঁদের প্রতি নম্র ও নত হয়ে থাকো।'

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি কোমল, নরম ও নত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'তাঁদের প্রতি কোমল ও সদয় হও এবং বলো—"প্রভু! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা ছোটোবেলায় আমার সাথে করেছে।"' সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

যুবকদের একটা অভিযোগ প্রায়শ শোনা যায়—‘আমার বাবা-মা আমার পরিস্থিতি বুঝছে না বা বুঝতে চেষ্টা করছে না।’ কিছু মেয়েদের বলতে শোনা যায়—‘আমার মা’টা কিছুতেই বুঝতে চায় না।’ হতে পারে তিনি সত্যিই বুঝতে পারেন না। কারণ, আপনার মা আপনার প্রজন্মের নয়। তাঁর এবং আপনার মাঝে সাংস্কৃতিক ও পড়াশোনাগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আপনার তো তাঁকে বোঝা উচিত। তাঁর মন-মানস ও স্বভাব-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা উচিত। হয়তো তিনি আপনাকে বুঝতে পারেন, কিন্তু সবকিছুতেই আপনার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তিনি হয়তো ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করছেন, অন্য জায়গায় আপনার স্বার্থ ও কল্যাণ দেখছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সর্বোপরি বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সাথে উঠাবসা তাঁকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে উৎসাহ দিয়েছে। আপনি কখনোই পিতা-মাতার চেয়ে অধিক মমতাময়ী, সদয় ও দয়ালু কাউকে পাবেন না। তাঁরাই আপনার কল্যাণ ও অগ্রগতি চায়। তার অর্থ এই নয়, পিতা-মাতা সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁদের চিন্তা ও মতামতই চূড়ান্ত ও যথার্থ। কিন্তু নিশ্চিতরূপেই পিতা-মাতা আপনার কল্যাণকামী। রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনী আর অনুপম চরিত্র আমাদের মা-বাবার প্রতি বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান ও কৃতজ্ঞ হতে শেখায়।

দাম্পত্য জীবনের একঝলক

চিন্তিত হবেন না

নবুয়তের দশম বর্ষ। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার বছর। নবিজি ﷺ তখনও মদিনায় হিজরত করেননি। মক্কার পরিস্থিতি তাঁর জীবন বিষিয়ে তুলেছে। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা মানব-স্বভাবের এক অনিবার্য অবস্থা। মানুষের হৃদয় ব্যথিত হয়, কষ্ট পায়। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। সংকট দ্রুতই নিরসন হবে।

জীবন সুন্দর ও মধুর। এমনকী দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা যদি ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়, জীবন খুশি ও আনন্দে ভরে যায়। রুগ্ন হৃদয় সন্তুষ্টি ও প্রসন্নচিত্তের তৃপ্তিতে নিরাময় লাভ করে, তাকদিরের ছায়ায় প্রশান্তি পায়। তখন জীবনের সব কষ্ট ও জ্বরা দূর হয়ে যায়। আনন্দে ভরে উঠে জীবনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

নবিজি ﷺ ভীষণ চিন্তিত। তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এই বছরে বড়ো বড়ো দুইটা বিপদ তাঁর জীবন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।

এক. তাঁর স্ত্রী খাদিজা رضي الله عنها-এর মৃত্যু। এই মহীয়সী নারী কেবল রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন না; বরং নবিজির জীবনের বিশাল এক ছায়া ছিলেন। নবুয়তের পূর্বেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় ব্যাবসাসূত্রে। খাদিজা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-এর অনুপম বিরল চরিত্রে মুগ্ধ হন। তাঁর আচরণ ও ব্যবহারে অভিভূত হন। নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তেমনটাই ঘটেছে। একসময় সেই ধনাঢ্য ব্যবসায়ী অভিজাত মহিলা হয়ে যান রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে কাছের মানুষ, আত্মার আত্মীয়, প্রাণের দোসর। একপর্যায়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহি আসে। খাদিজা رضي الله عنها-ই সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন খাদিজাকে একটা বাঁশের ঘরের সুসংবাদ দিই—যেখানে কোনো শোরগোল নেই, নেই কোনো ক্লান্তি।' সহিহ বুখারি : ১৭৯২

কতই মহান এই সুসংবাদ! কতই অর্থবহ ও তাৎপর্যময়!

দুই. চাচা আবু তালেবের মৃত্যু। চাচার মৃত্যুর পর নবিজি তার শেষ আশ্রয়স্থানটিও হারিয়ে ফেলেন। চাচা আবু তালিব ছিল কুরাইশদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর জন্য ঢালস্বরূপ। যদিও তিনি ঈমান আনেনি, তথাপি রাসূল ﷺ-কে সুরক্ষা দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন অনেকটা ছাতার মতো। কুরাইশরা যখন আবু তালিবের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে তখন তিনি নবিজিকে বলেন, 'ভাতিজা! তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও।' সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে নবিজি ভিষণ চিন্তিত হন।

সমস্যার উজানে বিয়ের তরি

বিয়ের শুরুতে জীবনে খুশির আমেজ থাকে। একপ্রকার নেশা ও ঘোর কাজ করে। ধীরে ধীরে সময় বয়ে চলে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে খুশির আমেজও কমতে শুরু করে। নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়। ধীরে ধীরে বিয়ের প্রথম দিনগুলোর ঘোর কাটতে শুরু করে। অন্তঃসারশূন্য সময়ের মায়া কেটে যায়। স্বামী-স্ত্রী বিপরীতমুখী পথের পথিক হয়ে যায়। কেউ কারও সাক্ষাৎ পায় না। মাঝে মাঝে নানা বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য, মতভেদ দেখা দেয়। পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। তাই খাদিজা رضي الله عنها-কে এমন ঘরের সুসংবাদ দেওয়া হয়—যেখানে শোরগোল ও কোলাহল নেই, নেই কোনো ক্লান্তি ও অবসাদ।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উত্তম সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো অবিচল ধৈর্য, পরিতৃপ্ত দৃষ্টি ও সহাস্য আলাপচারিতা। সংসারে নানা দায়িত্ব থাকে। বাচ্চাদের দেখভাল করা থেকে শুরু করে গৃহস্থালি কাজ, নানা সমস্যা ও মতভিন্নতা মিটমাট করা, গৃহ ও চাকরির বদল, ঘরে ও বাইরের নানা ব্যাপার সামলানো, বিভিন্ন আয়োজন-অনুষ্ঠান আঞ্জাম দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজই ধৈর্য ও অবিচলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও আত্মতুষ্টির দাবি রাখে। অন্যথায় পরিবার টেকসই হয় না, ভেঙে যায়।

অনেককেই বলতে শোনা যায়, ভাই-বোনের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যায়। বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। কারণ, প্রত্যেকেই অন্যের কাছে আশা করে থাকে, নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন হয়!

আমার দীর্ঘ জানাশোনা আর পর্যবেক্ষণ থেকে সংসারের নানা সমস্যার কারণ খুঁজেছি। সংসার হলো একটা চলমান তরির মতোই; সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হয়, চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। যে মুহূর্তে মাঝি খেয়ালি ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, ঠিক তখনই তরি হেলে পড়ে, বাতাসের ঝাপটায় একবার ডান দিকে তো আরেকবার বাম দিকে ঝুঁকে যায়; বরং যাত্রীসহ ডুবে যায়। তাই দুই দিকের ভারসাম্য ঠিক রাখা দরকার, তবেই ঘরে কোনো প্রকার শোরগোল ও কোলাহল থাকবে না। খাদিজা رضي الله عنها-এর ঘরের মতো কোনো ক্লান্তি ও অবসাদ থাকবে না।

পরিপূরক সম্পর্ক

বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুই দৈহিক নয়; মনেরও। দেহের ওম ও উষ্ণতা সময়ের সাথে সাথে ফিকে হয়ে আসে। মনের ঘোর কেটে যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভাবের আদান-প্রদান, অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব-অনুভূতি, প্রেম ও ভালোবাসার বিনিময়, সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান ইত্যাদির অপূর্ব মিশেলেই বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ণতা পায়। সম্পর্ক কোনো রশি নয় যে, প্রত্যেকেই নিজের দিকে টেনে নেবে। একদিকে স্ত্রী ভালোবাসা দাবি করবে আর কিছু হলেই তিরস্কার করে যাবে। অন্যদিকে পুরুষ নিন্দা ও সমালোচনাই করবে। এমনটি হলে পারস্পরিক বোঝাপড়া দুর্বল হয়ে পড়বে, কখনো কখনো সম্পর্ক ভেঙে যাবে। বিয়ে ভাঙনের বলি হতে হয় অবুঝ নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে।

দাম্পত্য সম্পর্ক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন পেতে মানবতার প্রথম শিক্ষকের কাছে ধরনা দিতে হবে। তাঁর সর্বজনীন বিদ্যালয়ের ছায়ায় ভিড় জমাতে হবে। রাসূল ﷺ-এর বৈবাহিক জীবনের সোনালি অধ্যায়ে ঢু মারলে দেখা যাবে, স্ত্রীদের সাথে তাঁর অনুপম আচরণের বর্ণিল অধ্যায়। রাসূল ﷺ আমাদের সবকিছুই শিখিয়েছেন; এমনকী স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশার রীতি ও প্রকৃতিও শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের জীবনের প্রাত্যহিক আচরণ ও দৈনন্দিন কার্যসূত্রে আমাদের শিখিয়েছেন, নম্রতা ও কোমলতা দিয়েই জীবন সুন্দর ও কোমল হয়, নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত হয়। অহংকার ও দম্ভমুক্ত আচরণ, রাগ ও ক্রোধের সংবরণ, সরল দৃষ্টিভঙ্গি দাম্পত্য জীবনে সুখের বাতাবরণ বইয়ে দেয়।

প্রত্যেকের উচিত নেতিবাচক ও খারাপ বিষয়গুলোকে জীবনে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলতে না দেওয়া। কেউ-ই; নারী হোক বা পুরুষ—গালি ও নিন্দা শুনতে চায় না। যদি কোনো সময় মানব-স্বভাবের কারণে অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি হয়েই যায়, তাহলে তো লজ্জিত হতে বাধা নেই। স্বীয় কাজ ও কর্মের কারণে দুঃখ প্রকাশ করা, নিজের ভুল শুধরে নেওয়া এবং অকপটে তা স্বীকার করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব হলো, পরস্পর পরস্পরের সাথে উত্তমরূপে আচরণ, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা।

দাবি ও পীড়াপীড়ি

হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে খাদিজা ؓ-কে জান্নাতে একটা বাঁশের ঘরের সুসংবাদ দিতে, যেখানে কোনো কোলাহল ও শোরগোল নেই।’ সহিহ বুখারি : ১৭৯২

এমন ঘর যেখানে কোনো সমস্যা নেই, নেই কোনো অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা। নানা দাবি ও পীড়াপীড়ি বৈবাহিক জীবনের মূল সমস্যাগুলোর একটা। স্বামী—স্ত্রী দুজনই একে অন্যের অবস্থান ও পরিস্থিতি জানে। স্ত্রী-স্বামীর আর্থিক সংগতি ও সামর্থ্যের কথা, তার কাজ, প্রতিশ্রুতি ও সম্পর্কের কথা জানে। তাই স্ত্রী স্বামীর কাজ ও দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকে, তাকে অতিরিক্ত কাজ করতে দেয় না।

আবার অন্যদিকে স্বামীও স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব, গর্ভকালীন সময় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা রাখে। এই সব পরিস্থিতিতে নারীদের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। তার মধ্যে একধরনের কুণ্ঠাবোধ, মানসিক চাপ এবং নানা সমস্যা দেখা দেয়, তখন তার যত্ন ও সেবা দরকার। এসব ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনিন খাদিজা ﵂ সমস্ত ঈমানদার সৎ নারীদের জন্য মডেল। আর পুরুষদের মডেল হলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল ﷺ।

আয়িশা ﷺ-এর গৃহে

পুরুষের শিক্ষিকা

সাহাবারা তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান জানতেন। তিনি রাসূলের স্ত্রী এবং সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

আয়িশা ﵂ ছিলেন রাসূল ﷺ-এর হাদিসের হাফেজা এবং এই বিষয়ের মহান শিক্ষিকা; এমনকী মহান সাহাবি আবু মুসা আশআরি ﵁ বলেন—

> 'আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার জটিল মনে হলে সাথে সাথেই আমরা আয়িশা ﵂-এর কাছে গিয়েছি এবং তাঁর কাছে উপযুক্ত সমাধান পেয়েছি।' তিরমিজি : ৩৮৮৩

রাসূলের ঘরের ঘরনি হওয়ার জন্যই আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেন। তিনি জ্ঞান অর্জন এবং আত্মস্থ করেন। এমনকী তিনি সর্বাধিক হাদিস মুখস্থকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বড়ো বড়ো সাহাবিদের ভুল শুধরে দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা এবং উমর ﵃সহ অনেকের ভুল শুদ্ধ করে দিয়েছেন; বরং অনেক বড়ো বড়ো আলিমরা, যেমন : 'জারকাশি'– আয়িশা ﵂-এর শুধরে দেওয়া উত্তরের ওপর স্বতন্ত্র বই লিখেছেন। যেমন : *আল ইজাবাতু মা ইসতাদরাকাতহু আয়িশাতু আলাস সাহাবা* (সাহাবাদের ভুল শুধরে আয়িশা ﵂-এর জবাব)। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। রাসূল ﷺ-এর সংসারের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা ছিল। এসবের পেছনে খোদায়ি এক অসীম প্রজ্ঞা রয়েছে।

রাসূল ﷺ কেন আয়িশা ﵂-কে বিয়ে করলেন

রাসূল ﷺ কখনোই সুন্দরী তরুণীদের সন্ধান করেননি; যদিও আয়িশা ﵂ অতীব সুন্দরী ছিলেন। তিনি কখনোই ছোটো বয়সের কুমারীর সন্ধানও করেননি। তিনি যদি চাইতেন, তবে কুরাইশের নেতারা তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর ও লাবণ্যময়ী নারী উপহার দিত। তিনি বেছে নেন খাদিজা ﵂-কে। তাঁর মৃত্যুর পর বিয়ে করেন আয়িশা ﵂-কে। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়িশা ﵂ একমাত্র কুমারী নারী। রাসূল ﷺ-এর সাথে আয়িশা ﵂-এর বিয়ে হয় অনেকটা রাসূল ﷺ ও আবু বকর ﵁-এর

গভীর সম্পর্ক এবং খোদায়ি প্রজ্ঞা ও হিকমাহর কারণে। পরবর্তী সময়ে আয়িশা ﵂ হন নববি পাঠশালা; মুসলমানদের জন্য রাসূলের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে রক্ষা করেন, বিশেষত অভ্যন্তরীণ ও পারিবারিক ব্যাপার যেমন : বিছানায় স্ত্রীর সাথে রাসূলের আচরণ কেমন ছিল?

হ্যাঁ, এগুলো একান্তই ব্যক্তিগত ও গোপন বিষয়। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর কাছে এটা একটা প্রয়োজন ছিল মাত্র। উম্মাহকে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, হালাল-হারাম শিক্ষা দেওয়া, শরিয়াহ সমর্থিত ও শরিয়াহ পরিপন্থি পথের নির্দেশ দেওয়া। আয়িশা ﵂ আমাদের কাছে জীবনের সেই একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপন ব্যাপারগুলো নিপুণভাবে পৌঁছে দেন। আয়িশা ﵂ এমন কথা বর্ণনা করেছেন, তাঁর মাসিক চলত, রাসূল ﷺ তাঁকে অন্তর্বাস পরতে নির্দেশ দিতেন। তারপর রাসূল ﷺ তাঁর সাথে ঘুমাতেন, রসিকতা করতেন, কিন্তু কিছুতেই শরিয়াহ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হতেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'মাসিক চলাকালীন সময়ে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো।' সূরা বাকারা : ২২২

আচ্ছা, আমাদের কে শিখিয়েছে নবিজি আপন গৃহে কীভাবে গোসল করতেন? আয়িশা ﵂। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাঁর সাথে গোসলের স্থানে যেতেন, আর নিজের গায়ে পানি ঢালতেন এবং রাসূল ﷺ নিজে পানি নিয়ে নিজের গায়ে ঢালতেন। আয়িশা ﷺ বলতেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঢালতে দিন।' আর রাসূল ﷺ বলতেন, 'আমাকে ঢালতে দাও হে আয়িশা।' এই ছিল স্ত্রী-পরিজনের সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ। একেবারে সরল, অকৃত্রিম ও সাদামাটা জীবন। এখনকার পরিবারগুলোতে এমন সরলতাপূর্ণ আচরণ আর অকৃত্রিম মনোভাব দেখা যায় না। রাসূল ﷺ এমনই কৃত্রিমতা বিবর্জিত সহজাত ও মৌলিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কোনো প্রকার ভাঁড়ামো, ন্যাকামো, অতিরঞ্জন তাঁর মধ্যে ছিল না। সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস নষ্ট করে—এমন কোনো আচরণ তাঁর মধ্যে ছিল না।

রাসূলের সংসার

একরাতে রাসূল ﷺ আয়িশা ﵂-এর গৃহে এলেন। আয়িশা ﵂-এর ঘর কোনো বিলাসবহুল প্রাসাদ কিংবা দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ দালান ছিল না। কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের বাস ছিল। কক্ষগুলো এতটাই ছোটো ছিল যে, দাঁড়ালে ছাদের সাথে মাথা লাগত! ঘুমালে পা দেয়ালের প্রান্তে পৌঁছে যেত। রাসূল ﷺ রাতে নামাজ পড়তেন। আয়িশা ﵂ তাঁর সামনে ঘুমিয়ে আছে। ঠিকভাবে সিজদায় যেতে পারেন না। জায়গার সংকট। আয়িশা ﵂-এর পা একপাশে সরিয়ে তারপর সিজদায় যেতেন। সিজদা থেকে উঠার সময় আবার তাঁর পা লম্বা করে দিতেন, যেন তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুমাতে পারেন!

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের গৃহ ছিল সাদামাঠা আকৃতির এবং সাধারণ আসবাবপত্রের। কিন্তু জ্ঞানে, রুচিতে আভিজাত্যে ছিল খুবই উঁচু মানের। তাতে সুখ ও ভালোবাসা ছিল। মানুষ কখন বুঝতে পারবে যে শুধু হিরা ও জহরতে, পোশাক ও পরিচ্ছদে ভালোবাসা নেই। দামি গাড়ি, দৃষ্টিনন্দন বাড়ি, বিশাল বিত্ত ও বৈভব এবং ব্যাংক-ব্যালেন্সে সুখ ও মনের আনন্দ লুকিয়ে নেই। এই ব্যাপারগুলো যদি হালাল পথে হয়, তবে সমস্যা নেই, তা ভোগ করা যাবে। তবে একটা কথা খুব ভালোভাবে মাথায় রাখা উচিত—সুখ হৃদয়ের গহিন থেকে উৎসারিত হয়। আর আল্লাহর আনুগত্য ও জিকিরে সিক্ত অন্তরই সুখের সন্ধান পায়।

একরাতে রাসূল ﷺ আয়িশা رضي الله عنها-এর গৃহে আগমন করেন। আয়িশা رضي الله عنها ঘুমিয়ে পড়লে রাসূল ﷺ চুপিসারে উঠে দাঁড়ান। তারপর কাপড় ও জুতা পরিধান করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন। বাহির থেকে নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে দেন, যেন আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘুম না ভাঙে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘুম ভেঙে যায়। কারণ, তখনও তাঁর ঘুম গভীর হয়নি। ঘুম থেকেই উঠে নবিজিকে না দেখে তাঁর মেজাজ কিছুটা চড়ে গেল। ভাবলেন, রাসূল ﷺ বোধ হয় অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন। অথচ এই রাত ছিল তাঁর ভাগের। তিনিও ত্বরিত গতিতে কাপড় পরে ঘন অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। চুপি চুপি রাসূল ﷺ-এর পিছু নিলেন।

রাসূল ﷺ এগিয়ে চলেছেন। আয়িশা رضي الله عنها দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করছেন, পিছু পিছু হাঁটছেন। রাসূল ﷺ জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে থামলেন। সমস্ত সাহাবাদের সালাম করলেন; যারা আখিরাতের পথে চলে গেছেন, তাঁদের জন্য দুআ ও ইসতিগফার পাঠ করলেন।

তারপর নবিজি ফিরে এলেন। কাপড় ও জুতা খুলে বিছানায় গিয়ে বসলেন। দেখলেন, আয়িশা رضي الله عنها এখনও ঘুমিয়ে। তাঁর চোখ বন্ধ, যেন সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর বুকের হৃৎস্পন্দন এবং ঘন ঘন শ্বাস বলে দিচ্ছে, তিনি ঘুমাননি। তাঁর দিকে তাকিয়ে রাসূল ﷺ বললেন—'আয়িশা! কী খবর?' তিনি চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বললেন, 'কিছু না।' তখন রাসূল ﷺ বললেন—'তুমি বললে বলো, নইলে বিজ্ঞ জ্ঞানী আমাকে জানাবেন।' তখন আয়িশা رضي الله عنها বললেন—'খোদার কসম! আমি যখন আপনাকে বেরোতে দেখলাম, আপনার পেছন পেছন আমিও বেরোলাম। আমার ভয় হলো—পাছে আপনি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে যান।' তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন—'আচ্ছা, তুমি কি ভেবেছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অবিচার করবে? তুমি কি সেই ছায়ামূর্তি—যাকে আমি সামনে থেকে দেখেছি?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' এবার নবিজি তাঁর বুকে হালকা আঘাত করলেন। রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার নয়; বরং আদর ও ভালোবাসার আঘাত। তাঁকে জানিয়ে দিলেন, 'নিশ্চয় তুমি যা করেছ, তা ভুল ছিল। এমন ধারণা করা তোমার উচিত হয়নি। এমন কাজ করাও উচিত হয়নি।'

তখন তাঁর কাছে গোটা ব্যাপার খোলাসা করে রাসূল ﷺ বলেন—'জিবরাইল আমার কাছে এসে বলেছে—'আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে তাঁদের জন্য ইসতিগফার ও দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে তাঁদের জন্য ইসতেগফার করেছি।'

কিছু সংশোধনীয় শিক্ষা

উপরিউক্ত ঘটনায় নবিগৃহের এক আশ্চর্য চিত্র ফুটে ওঠে।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বেশ মেধাবী, চৌকস ও সত্যবাদী মহিলা। রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে সেই তিনিই এমন সংশয় করেছেন, তা তিনি স্বীকারও করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং পিছু নিয়েছেন। রাসূল ﷺ হালকা একটা খোঁচা দিয়ে ব্যাপারটার ইতি টানেন। তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অবহিত করেছেন, তাঁর কাছে জিবরাইল এসেছিল এবং আল্লাহ জান্নাতুল বাকির সাহাবাদের জন্য ইসতিগফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

একটু ভেবে দেখুন, এমন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে কেমন আচরণ করেছেন। তিনি ছিলেন মহান নবি। সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। সেই তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মতো একজন কিশোরীর সাথে কেমন আচরণ করলেন? শুধু তাই নয়; বরং গোটা ব্যাপারটাই খোলাসা করলেন, যেন কোনো প্রকার সংশয় না থাকে!

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতভেদ দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়; বরং অধিকাংশ বিবাহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ, স্বামী-স্ত্রীর মতভিন্নতা। কোনো সময় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, আবার কোনো সময় দূরত্ব তৈরি হয়। মনের মিল থাকে না। ঈমান, তাকওয়া ও শরিয়াহর পবিত্র মূলনীতির ওপর গড়ে উঠা সুন্দর সংসার ধ্বংস হয়। অথচ শুরুতে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মতভিন্নতা শুরু হয়। ছোটো ছোটো সমস্যা ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে, নিস্পত্তি করা হয় না। তাই আমাদের অন্যদের সাথে কীভাবে সংযমী ও সুবিচারক হতে হবে—তা জানা উচিত।

সংসারে যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন স্বামীর উচিত নিজেকে স্ত্রীর স্থানে কল্পনা করা। মেয়েরা সারাদিন চার দেয়ালের মাঝখানে বন্দি থাকে। সারাদিন তাকে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়; ছেলে-সন্তানের দেখভাল, রান্নাবান্না, গৃহস্থালি কাজকর্ম করা, স্বামীর অনুপস্থিতিকে মেনে নেওয়া ইত্যাদি। এসবের মাঝে আপনিও যদি দেরি করে বাসায় ফেরেন, তার তো খারাপ লাগবেই; একটু হয়তো চড়া গলায় কথা বলবে, তিরস্কার করবে। এতে আপনি মন খারাপ করতে পারেন না। আপনি হয়তো কোনো বন্ধুকে সঙ্গ দিতে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলেন। আর এদিকে আপনার স্ত্রী সারা রাত আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলে-সন্তানের ঝামেলা পোহাচ্ছে। এতে যদি তার রাগ হয়, তবে তা কি অযৌক্তিক?

আচ্ছা, কোনোদিন যদি আপনাকে রান্নাবান্নার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা কি সামাল দিতে পারবেন? সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবেন? কখনোই না। সন্তানদের দেখভাল করা, তাদের খাওয়ানো, গোসল করানো, কাপড় পরানো ইত্যাদি কাজ করতে পারবেন? তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি, ঝাগড়া-বিবাদ সহ্য করতে পারবেন? অথচ মেয়েরা প্রতিদিনই অবলীলায় তা সহ্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা মেয়েদের সহ্য করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মেয়েরা সন্তান ধারণের এবং জন্মদানের মতো কষ্টের কাজ সহ্য করে—যা কিছুতেই পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়; এমনকী যুদ্ধজয়ী বীরপুরুষও তা পারবে না। এ ছাড়াও স্বামীর আরেকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, স্ত্রী একটা ছোট্ট সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তাকে উপযুক্ত সম্মান করা উচিত। তার সামনে সবকিছুই স্বচ্ছতার সাথে স্পষ্ট ও খোলাসা করা জরুরি। ধৈর্য সহকারে তাকে মেনে নেওয়া উচিত।

পক্ষান্তরে স্ত্রীরও স্বামীর অধিকার এবং অবস্থান সম্পর্কেও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত, দিনশেষে তিনিই অধিপতি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তাঁরা দুজনই দরজার কাছে অধিপতিকে পেল।’ সূরা ইউসুফ : ২৫

এখানে অধিপতি অর্থ হলো স্বামী। দিনশেষে তিনিই সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী-স্ত্রী যদি দুজনই একে অন্যের মর্যাদা যথাযথরূপে বোঝে, তবে একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সুখের সংসার গড়ে তোলা সম্ভব। তখনই সংসারে শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল বাতাস বইবে।

এই নিরাপদ ঘরগুলোই মুসলিম সমাজের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখে। সমাজ বিধ্বংসী সমস্ত অপকৌশল রোধ করে।

মানুষকে সর্বদাই আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত, কবর জিয়ারত ইত্যাদি কাজ করতে হবে—যা মানুষের ঈমান ও বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখবে।

কুরআনের অনুরূপ চরিত্র

রাসূল ﷺ উন্নত চরিত্র-মাধুরী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বলেন—

> ‘আমি আবির্ভূত হয়েছি উন্নত চরিত্রসুষমাকে পূর্ণতা দিতে।’ হাকেম : ৬৭০

চরিত্র মূলত দুই প্রকার

প্রথম : স্বভাবজাত চরিত্র। এটি হলো মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত চরিত্র। প্রতিটি মানুষই যেমন সত্যকে ভালোবাসে এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করে; বিশ্বস্ততা, বদান্যতা এবং সুউচ্চ মূল্যোবোধকে পছন্দ করে, তেমনি প্রতারণা, কার্পণ্য ও বদ অভ্যাস ঘৃণা করে।

দ্বিতীয় : এটি স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত চরিত্রকে সুন্দর ও নিষ্কলুষ, সঠিক ও পরিশুদ্ধ করে। এগুলো অর্জন করতে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আর এর পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব। তাই তাঁর আনীত ধর্ম উন্নত চরিত্রের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। তিনি ছিলেন একজন বাস্তবিক নমুনা, অনুপম চরিত্রের জ্বলন্ত উদাহরণ।

কাজের মানদণ্ড

মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই নানা মতাদর্শ মূল্যবোধ ও অধিকারের কথা বলেছে, কিন্তু বাস্তবেই তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। সমাজতন্ত্র সাম্য, ন্যায়
এবং শ্রমিকের অধিকারের কথা বলেছে। মিশনারিরা তাদের নিয়মে ও আইনে ন্যায় ও সাম্যের কথা বলেছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের সমস্ত মতাদর্শ ও আন্দোলন যেমন : গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, উদারনীতি ইত্যাদি নতুন-পুরাতন সমস্ত মন্ত্রই বেশ চটকদার বুলি ও মনোহর বক্তব্য পেশ করেছে। উঁচু মূল্যবোধ এবং উন্নত মানসিকতার কথা বলেছে। কিন্তু তাদের কর্মপন্থা ও বাস্তব রূপ সে কথা বলে না। মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। কত দলই আবির্ভূত হয়েছে! সবাই জনগণের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, অন্যায়-অবিচার চালিয়েছে। স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতার নামে কত প্রকার জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে! কিন্তু রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রাসূল ﷺ সামান্য সেবক, গোলাম—সবার সাথেই কোমল আচরণ করেছেন। তাদের অভিযোগ-অনুযোগ শুনেছেন; এমনকী অবলা নারীও তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছে আর তিনি তাকে বলছেন—'আপনি একটু ছুরির ফলার দিকে দেখুন, ততক্ষণে আমি আপনার প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছি।'

রাসূল ﷺ একাধারে ছিলেন সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার, জাতির নেতা, ধর্মের প্রবর্তক। সকাল-সন্ধ্যা জিবরাইল ﷷ তাঁর কাছে ওহি নিয়ে আসে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি একজন মহিলার কাছে যান। মহিলাটির হয়তো আপন সর্দার, মনিব, সন্তান-সন্ততি কিংবা কাজের কষ্ট নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকতে পারে! তা হতে পারে আমাদের কাছে খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য কাজ। কিন্তু রাসূল ﷺ নিজের অতি ব্যস্ত সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে মহিলাটির কাছে যেতেন এবং সমস্যার প্রতি সমবেদনা জানাতেন!

দুর্বল ও ছোটোদের নিয়ে উৎকণ্ঠা

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় গোটা দুনিয়া নির্যাতনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত ছিল।

অথচ একদিন নবিজি ﷺ তাঁর সেবককে বলেন—'তোমার কি কোনো কাজ আছে? কোনো প্রয়োজন আছে?' একজন সেবকের কাছে জানতে চাইছেন, 'তোমার কি কিছু বলার আছে? তুমি কি কিছু গোপন করছ? বলতে সংকোচ করছ?' এমন নম্রতা ও কোমলতাপূর্ণ আচরণ কি মানুষ আর কোথাও দেখেছে? দুর্বল, সেবক, চাকর-বাকরদের সাথে এমন সদয় আচরণ করতে কেউ দেখেছে?

এ ছাড়াও রাসূল ﷺ-এর শিক্ষায় আমরা শিশু ও বাচ্চাদের উত্তম আচরণের পাঠ পাই। উত্তম আচরণ ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকের শিশু আগামী দিনের কান্ডারি। তখন আনাস ؓ-এর ভাই উমাইর ছিল ছোট্ট একটা শিশু। তাঁর একটা চড়ুই পাখি ছিল। সারাদিন সে পাখিটার সাথে খেলা করত। পাখির প্রতি তাঁর এই অসীম আগ্রহ রাসূল ﷺ লক্ষ করলেন। বাচ্চারা এমনই হয়। আজকালকার বাচ্চাদের মধ্যেও পাখির প্রতি এমন একটা ব্যাকুলতা দেখা যায়। একদিন রাসূল ﷺ তাঁর কাছে গেলেন। সে মনমরা হয়ে বসে আছে। কারণ, তাঁর পাখিটা মারা গেছে। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন–'উমাইর! তোমার 'নুগাইর (চড়ুই পাখি) কোথায়?'

সুবহানাল্লাহ! রাসূল ﷺ-এর হৃদয় কত বড়ো! শত শত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিড়েও একটা শিশুর প্রিয় পাখির খবর রাখেন! পাখিটির মৃত্যুতে শিশুটি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লে রাসূল ﷺ তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

নারীর উৎকণ্ঠা

রাসূল ﷺ-এর শিক্ষায় নারীর সাথে আচরণের পথ ও পদ্ধতি, রীতি ও কৌশলও বাদ পড়েনি। রাসূল ﷺ-এর সংসারে নারী তো ছিলই; এ ছাড়াও তাঁর চারপাশে সমাজে অনেক নারী ছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে নানা প্রশ্ন নিয়ে আসত। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলত। নবিজি ছিলেন তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই তিনি তাদের মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝতেন। তিনি নারীদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তৎকালীণ আরবদের স্ত্রীদের ওপর হাত তোলার বদ-অভ্যাস ছিল। নবিজি সাহাবাদের নারীদের সম্মান করতে নির্দেশ এবং তাদের সাথে বাড়াবাড়িমূলক আচরণ করতে নিষেধ করেছেন।

একদিন কিছু সাহাবা রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন—'নারীরা তাদের স্বামীর অবাধ্য হয়ে পড়ছে।' তারপর রাসূল ﷺ তাদের প্রহারের নির্দেশে একটা শিথিলতা আনলেন। পরদিন নারীরা রাসূলের ঘরে চলে এলো। তারা সবাই স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূল ﷺ সবার সামনে বক্তব্য রাখলেন, 'মুহাম্মাদের ঘরে অনেক নারী এসেছিল। তারা নিজেদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। অভিযুক্ত লোকগুলো তোমাদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি নয়। হ্যাঁ, যারা স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, তারা কিছুতেই ভালো নয়; বরং সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আমি আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'

মানুষের উৎকণ্ঠা

রাসূল ﷺ সারা জীবনই মানুষের সাথে পার করেছেন। অবশ্য কিছু মানুষ থেকে দূরে ছিলেন। মসজিদ, ঘর, সফর ইত্যাদিতে কত মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতেন! সিরাত পাঠকরা রাসূল ﷺ-এর সময়ের বরকত দেখে অবাক হয়। রাসূল ﷺ-এর কত সফর! কখনো কখনো মসজিদের বৈঠকে কয়েক দিন কেটে যেত। রমজান মাসে ইতেকাফ করতেন। প্রথম দশ দিনে ইতেকাফ করতেন, তারপর মাঝের দশ দিন, আবার শেষ দশ দিনও ইতেকাফ করতেন।

এভাবেই নবিজির জীবনে প্রতিটি পরতে পরতে মানুষ জড়িয়ে আছে। তাঁর যাওয়া-আসা, ঘরে অবস্থান কিংবা সফরের যাত্রা—সবকিছুই মানুষের সাথেই ছিল। যখন-তখন যে কেউ অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করত। এতসব কিছুর পরও নবিজি তাঁর দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধরে রাখতেন। চোখ বুজে সবকিছু সহ্য করে যেতেন, ধৈর্য ধরতেন। তিনি কখনোই কারও ওপর রাগ করেননি, বাজে প্রতিক্রিয়া দেখাননি। অথচ প্রতিদিন শত শত মানুষের সাথে তাঁর লেনদেন হতো।

উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার এক বেদুইন নবিজির কাছে এলো। তাঁর চাদর মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং কাঁধ লাল হয়ে আছে। সে বেদুইনসুলভ রূঢ়তা ও কর্কশ ভাষায় বলল—'আচ্ছা, এই দুইটা একটু আমার উটে তুলে দাও। তুমি তো আর নিজের সম্পদ

বা তোমার বাপের সম্পদ তুলে দিচ্ছ না।' নবিজি তার কথা হজম করলেন। কোনো প্রতিবাদ করলেন না; বরং চুপ থেকে তাকে কিছু উপহার দিতে নির্দেশ দিলেন।

অন্য এক বেদুইন রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু ঋণ পেত। সে এসে বলল—'হে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলেরা! তোমরা হলে দীর্ঘসূত্রির জাত!' অর্থাৎ 'তোমরা ঋণ আদায়ে বিলম্ব করো।' নবিজি এতে স্মিত হেসে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দেন।

আরেকবার এক বেদুইন এলো। নবিজি তখন সাহাবাদের সাথে বসে আছেন। সে সরাসরি বলল—'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?'

সাহাবারা রাসূল ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। তারপর সে বলল—'হে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে!'

নবিজি তাকে বললেন—'আমি তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।'

তখন লোকটা বলল—'আমি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমার মাঝে তোমার ব্যাপারে খারাপ কিছুই পাবে না।'

রাসূল বললেন—'আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে প্রশ্ন করো।'

সে বলল—'আমি খোদার দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করছি, আল্লাহ কি তোমাকে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন?'

রাসূল বললেন—'হ্যাঁ, সবার কাছেই পাঠিয়েছেন।'

সে বলল—'আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করছি।' তিনি কি তোমাকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন?'

রাসূল বললেন—'হ্যাঁ।'

'আল্লাহ কি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে, এই মাস পুরো রোজা রাখতে?'

রাসূল বললেন—'হ্যাঁ।'

সে আবার প্রশ্ন করল—'আল্লাহ কি তোমাকে আমাদের মধ্যে ধনীদের থেকে জাকাত তুলে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করতে নির্দেশ দিয়েছেন?'

রাসূল বললেন—'হ্যাঁ।'

লোকটা বলল—'তুমি যা নিয়ে এসেছ, আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর আমি আমার গোত্রের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেবো।'

মানুষ রাসূল ﷺ-এর সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। শালীনতা বিবর্জিত আচরণ করতেন। অশোভন রীতিতে সম্বোধন করতেন; এমনকী এসব নিয়ে কুরআনে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে—

> ‘নিশ্চয় যারা রুমের আড়াল থেকে তোমাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বোঝে না।’ সূরা হুজুরাত : ৪

তারা ছিল বেদুইন। রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি করত। জোর গলায় ডাক দিত—‘হে মুহাম্মাদ! আমাদের সাক্ষাতে বের হও।’ এমন সম্বোধন একাকী বসে থাকা ব্যক্তির কাছেও অদ্ভুত ও বিদঘুটে মনে হবে। অথচ রাসূল ﷺ সাহাবাদের সাথে বসে আছেন। তাঁদের অনুমতি চাওয়া ও সম্বোধন করার ভদ্রতা শেখাচ্ছেন। এমন একটা ভরা মজলিসে কেউ যদি এভাবে অশালীন রীতিতে কাউকে সম্বোধন করে, তবে তার কেমন লাগবে? অথচ কুরআনে রাসূল ﷺ-কে ডাকার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তোমরা কিছুতেই তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে ডাকার মতো করে রাসূলকে ডাকতে যাবে না।’ সূরা নুর : ৬৩

সুতরাং যে রাসূল ﷺ-কে ডাকে, সে যেন কিছুতেই শুধু নাম উল্লেখ করে ‘হে মুহাম্মাদ’ না ডাকে; বরং সে যেন বলে—‘হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর নবি! কিংবা এমন কোনো সম্বোধন—যেখানে নবিজির প্রতি যথেষ্ট শালীনতা প্রকাশ পায়।’

শত্রুদের সাথে নবিজির আচরণ

রাসূল ﷺ আপন শত্রুদের সাথেও উত্তম আচরণ করেছেন। অনুপম চরিত্র-মাধুরী দেখিয়েছেন। এক লোক খোলা তরবারি হাতে রাসূল ﷺ-কে বললেন—‘বলো, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?’ তিনি বললেন—‘আল্লাহ!’ সাথে সাথে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। নবিজি তা তুলে নিলেন, তারপর বললেন—‘এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?’ সে বলল—‘আপনি উত্তম মানুষের মতো আচরণ করুন।’ নবিজি তাকে বললেন—‘তুমি কি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলল—‘না, কিন্তু আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াব না। আর যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে যোগদানও করব না।’ রাসূল ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। তার পিছু নিলেন না।

এই ছিল শত্রুদের সাথে রাসূল ﷺ-এর ব্যবহার। অথচ সে নবিজিকে হত্যা করতে এসেছে। বিরোধী শিবিরের লোক! সে যদি সুযোগ পেত, তাহলে আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করত!

নবিজির এমন উন্নত চরিত্রই তাঁর এমন কথাকে সত্যায়িত করে—‘আমি উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা দিতে আবির্ভূত হয়েছি।’ তিনি কোনো অসার ফাঁপা স্লোগান দেননি; বরং ছিলেন একজন বাস্তব মডেল। তাঁর জীবন, জীবনাচার ও শিক্ষা সবকিছুই তাঁর কথার সাথে মিলে যায়। সেই অপূর্ব চরিত্র সুষমার ওপর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদের গড়ে তুলেছেন। তাঁরা পরবর্তীদের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন। তাই ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি আন্দোলন ও বিপ্লব মানবতার জন্য রহমত নিয়ে এসেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সব নীতিবান লেখকরা এই কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছে।

মানুষ হিসেবে আল্লাহর রাসূল

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল

রাসূল ﷺ-এর ওপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁকে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। মানুষ দলে দলে তাঁর আনীত ধর্মের প্রতি নত হয়েছে। তাঁর শরিয়াহ ও জীবনব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে; এমনকী অনেক শত্রুরাও এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে অনুগত মুমিন হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর কোমল আচরণ ও সহনশীল মনোভাব সবাইকে আকর্ষণ করেছে।

রাসূল ﷺ বলেন—'তুমি কি আমাকে সব দিক থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিলে?'

ধীরে ধীরে মধ্য দুপুরের সূর্যের মতো রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের নিদর্শন ফুটে ওঠে। কোথাও মলিন মেঘের ধূসরতা নেই। রাসূল ﷺ-এর মধ্যে কোনো প্রকার কুটিলতা ছিল না। তিনি সবকিছুতেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। আল্লাহর বন্দেগি করে গেছেন। মানুষের দাবি করা সব রকমের অহংকার ও বড়োত্ব থেকে ছিলেন যোজন যোজন দূরে। ইতিহাসের অনেক নেতা, বিজেতা, একনায়ক, বাদশা ও পরাশক্তির দেখা মেলে। আজও দুনিয়ার বুকে বড়ো বড়ো পরাশক্তি আছে। তারা সমগ্র পৃথিবীর সামনে সুন্দর সুন্দর বুলি আওড়ায়, চটকদার স্লোগান দেয়। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না; বরং তাদের ঘৃণ্য ও জঘন্য কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে নোংরা করে।

সূর্যগ্রহণের আয়াত

আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন সহজ ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তার প্রমাণ মেলে সূর্যগ্রহণের সময়। রাসূল ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে এই ঘটনার বিবরণ এসেছে। যখন সূর্যগ্রহণ হলো, রাসূল ﷺ নিজের গায়ের চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর চোখে-মুখে ভয়, না জানি কিয়ামত হয়ে যায়! সবাইকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। প্রতি রাকাতে দুই রুকু। সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করলেন। ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে অনেকে বসে পড়লেন। তারপর নবিজি সালাম ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের বললেন—

> ‘চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই দুটি ডুবে যায় না। যদি সূর্য বা চন্দ্রকে ডুবে যেতে দেখ, আল্লাহর কাছে দুআ করবে এবং উদয় হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করবে।’ তারপর তিনি আরও বললেন—‘হে মুহাম্মাদের জাতি! খোদার কসম! আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাশীল আর কেউ নেই। তাই কিছুতেই তিনি কোনো বান্দা বা উম্মাহর “যিনা” বা ব্যভিচার করাকে সহ্য করেন না।’ সহিহ মুসলিম : ৯০১

তখন মুমিনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। সূর্যের ডুবে যাওয়ায় তাঁদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নবিজি সাহাবাদের ভয়কে পুঁজি করে তাঁদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেন, তা হলো—ইজ্জত আব্রুর সংরক্ষণ, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা; বিশেষত ব্যভিচার থেকে। কারণ, তা ভয়াবহ পাপ এবং বড়ো অপরাধ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হবে না; তা অশ্লীল কাজ।’ সূরা বনি ইসরাইল : ৩২

ব্যভিচার হলো খুবই জঘন্য ও নোংরা কাজ। এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই খারাপ প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো ব্যভিচার। এর ফলে এইডসের মতোন ভয়াবহ জীবন-বিধ্বংসী ভাইরাস ছড়ায়—যা যেকোনো মুহূর্তে জীবন নাশ করতে পারে। সমস্ত ডাক্তাররাই এই সতর্কবার্তা প্রচার করছে। সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নানা ক্যাম্পেইন-কর্মসূচি পালন করছে। এই ভাইরাস সংক্রমক। স্ত্রী থেকে নিষ্পাপ ও কোমলমতি শিশুদের মাঝেও ছড়াতে পারে। এ ছাড়াও যেকোনো সময় যে কারও মধ্যে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এর একমাত্র কারণ, অবৈধভাবে যৌন সঙ্গম করা কিংবা বিষাক্ত রক্তের স্থানান্তর। রাসূল ﷺ এই পাপাচার এবং এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তারপর রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে তা ডুবে যায় না।’

প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

কিছু মানুষ বলাবলি করতে শুরু করেছিল, সূর্যগ্রহণের মূল কারণ হলো, রাসূল ﷺ-এর ছেলে ইবরাহিমের মৃত্যু। মুকাওকিস রাসূল ﷺ-কে একজন দাসী উপহার দিয়েছিল। তাঁর নাম মারিয়া কিবতিয়া। তাঁর গর্ভে রাসূল ﷺ-এর এক সন্তান জন্ম নিয়েছিল। তাঁর নাম ছিল ইবরাহিম। নবিজি ইবরাহিমকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে দেখতে তাঁর দুধমাতার ঘরে যান। গিয়ে দেখেন ধোঁয়া উঠছে। নবিজি বসে তাঁকে কোলে নেন। বুকের জড়িয়ে আদর করেন। তাঁর মুখে চুমো খান। এমন সময় তাঁর কাছে একটা সংবাদ আসে—ইবরাহিম দুধের শিশু থাকা অবস্থায় মারা যাবে। এই সংবাদ শুনে নবিজি খুবই ভেঙে পড়েন। তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা যায়।

চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সাহবারা তা দেখে অপলক নয়নে চেয়ে থাকেন! এমনকী কেউ কেউ বলেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি বলেন—'নিশ্চয় চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় চিন্তিত হয়। তারপরও আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হন এমন কথাই আমরা বলব—হে ইবরাহিম! তোমার বিয়োগে আমরা চিন্তিত!'

রাসূল ﷺ-এর স্বভাবে আশ্চর্য এক সমন্বয় ছিল। তিনি মানবসুলভ দুশ্চিন্তায় কাতর এবং ভারাক্রান্ত হন, বিয়োগ-বেদনায় কষ্ট পান। আবার এই কষ্ট ও যাতনা কিছুতেই সীমা ও গণ্ডি অতিক্রম করে না। কিছুতেই অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়েন না। তাঁর কথা ও কাজে কোনো প্রকার রাগ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। আল্লাহ বিরাগভাজন হন এমন কোনো কিছুতেই তিনি জড়ান না।

অধিকাংশ মানুষই ভারসাম্য রাখতে পারে না; বরং লাগামহীন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ অতিরিক্ত পর্যায়ে ঈমান ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসী হয়, তাদের মাঝে দুশ্চিন্তা ও কষ্টের ছাপ দেখা যায় না। আবার কেউ কেউ মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও কষ্টে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে। এমনকী কোনো কোনো মহিলার সন্তান মারা গেলে লাগাতার কাঁদতে থাকে, চোখের পানি বন্ধ হয় না। সে সন্তানের প্রতিটি স্মৃতি মনে করে করে বারবার কান্না জুড়ে দেয়। ছেলের খেলাধুলা, হাসি-কান্না, ঘুমানো, এমনকী ঘরে প্রবেশ করা এবং ঘর থেকে বের হওয়া—সবকিছুর স্মৃতিচারণ করতে থাকে। যখনই কিছু দেখে, তা স্মরণ করে আবারও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

রাসূল ﷺ তাঁর বক্তব্যের মাঝে বিশেষভাবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট করেন, তা হলো—কোনো মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর সাথে সূর্য বা চন্দ্র ডুবে যাওয়ার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং ইবরাহিমের মৃত্যুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ পৃথিবীতে অনেকেই নিজেদের শক্তিমত্তা, মর্যাদা ও বুজরুকি দেখানোর জন্য এমন নানা অলীক ব্যাপার বেশ গর্বভরেই প্রচার করে। যেমন : তার আগমনের কারণেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তার সন্তানের মৃত্যুর কারণেই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হচ্ছে কিংবা কোনো দুনিয়াবি বা খোদায়ি বিষয় নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিজেকে উঁচু দরের বুজুর্গ ব্যক্তি বলে দাবি করে। নিজেকে সব সময় সাধারণ মানুষের গণ্ডির বাইরের কেউ বলে প্রচার করতে চায়।

অনেক বড়ো বড়ো মানুষও এসব অবান্তর বিষয় নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আনন্দিত হয়।

এমন অতিরঞ্জনমূলক বক্তব্য ও বাড়াবাড়ি মানুষকে খোদার পর্যায়ে নিয়ে যায়। মানুষের সাথে যায় না—এমন বক্তব্য সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু মানুষ হয়তো এতে প্রসন্ন বোধ করে। বিত্তশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী, বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসব কথায় মজে যায়। বেশ তৃপ্তি পায়। কেউ কেউ হয়তো লোক দেখানো বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হয়।

কিন্তু এই মহান নবি তাঁর স্বভাবজাত বিনয় ও স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে সাহাবাদের এমন কথা সহ্য করতে পারেননি। সাহাবাদের কেউ কেউ বলেছিলেন, ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে!

নবিজি দৃঢ়তার সঙ্গে এই অবান্তর, ভিত্তিহীন বক্তব্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। সাথে সাথে তিনি ব্যাপারটা খোলাসা করেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন—'নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তা ডুবে যায় না।' কারণ, সূর্য কারও মৃত্যুতে বিষণ্ন হয় না, ঠিক তেমনি কারও জন্মেও আনন্দিত হয় না। তাই কেউ অপয়া, হতভাগা কিংবা কুলক্ষণে নয়; বরং তা আল্লাহর দুটি নিদর্শন। তার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে ভীত ও সতর্ক করেন।

বিনয়ের পাঠশালা

একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে এক লোক এলো। লোকটা কথা বলতে গিয়ে কাঁপছে। তার ঘাড়ের রগও কাঁপছে। রাসূল ﷺ তার এই দুরবস্থা দেখে বললেন—'তুমি সহজ হও! আমি কোনো প্রতাপশালী বাদশা নই। আমি এমন এক মহিলার সন্তান, যে শুকনো গোশত খেত।'

রাসূল ﷺ ছাড়া এমন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে আর কে শেখাতে পারবে? এমন নির্দেশনা ও নিয়ম মেনে কে চলতে পারবে? অথচ কিছু লোক যারা হয়তো কোনো কোম্পানির মালিক, স্কুলের পরিচালক বা দায়িত্বশীল কিংবা আলিম, তারা নিজেদের জন্য ঝাঁকজমকপূর্ণ উপাধি ধারণ করে। তার সাথে যোগাযোগ, তাকে সম্বোধন এবং সম্পর্ক বজায় রাখা, এমনকী তার কাছে প্রবেশের সময়ও তাকে নানা অভিধায় ভূষণ করতে হয়। এই সমস্ত লোকজন সাধারণ মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। নিজেদের এমন এক স্তরের মনে করে—যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তারা উঁচু স্তরের লোক। আল্লাহর রাসূল ﷺ তেমন ছিলেন না। কারণ, তিনি ছিলেন নবি। তিনি আল্লাহর বান্দা হয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি রাসূল ও বাদশা হতে চাননি। সাধারণ মানুষের সাথেই হাঁটাচলা করতেন। জুতা সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। বাজারে যেতেন। নিজের কাঁধেই বোঝা বহন করতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেন—'তিনি নিজের পরিবারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। নামাজের সময় হলে বেরিয়ে যেতেন।'

এমনই ছিলেন রাসূল ﷺ। সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, কোমল ও নম্র, জনমানুষের কাছের ও পাশের। মানুষ এসে সাহাবাদের মধ্যে রাসূল ﷺ-কে খুঁজত! তিনি এতটাই সাধারণ ছিলেন যে, দশজনের মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ত না। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় সাথে আবু বকর رضي الله عنه সঙ্গে ছিলেন। রাসূল ﷺ-কে অভিনন্দন জানাতে আসা আনসারি সাহাবারা নবিজিকে আগে কখনো দেখেনি। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কোনজন আল্লাহর রাসূল! এই দ্বিধাগ্রস্তের ভেতর কিছুক্ষণ কেটে যায়। সূর্যের তেজ এসে রাসূল ﷺ-এর গায়ে লাগে। তখন আবু বকর দাঁড়িয়ে তাঁকে ছায়া দেন। তখন তাঁরা বুঝতে পারে, বসে থাকা ব্যক্তিই আল্লাহর রাসূল ﷺ।

এই ঘটনা হজের প্রান্তরেও ঘটেছে। মানুষের ভিড়ের মাঝে, তাওয়াফ করার সময়, পাথর ছুড়ে মারার সময়, সায়ি করার সময়, আরাফার ময়দানে—সব জায়গায় মানুষের ভিড় ছিল। প্রায় এক লাখ চোদ্দো হাজার হাজি। সবাই রাসূল ﷺ-এর সাথে, সামনে-পেছনে চলছে। কখনো তাঁর পেছনে উসামা ইবনে জায়েদ رضي الله عنه আবার কখনো ফজল ইবনে আব্বাস رضي الله عنه। রাসূল ﷺ-এর উটের চারপাশে মানুষের ভিড়।

কেউ হজের বিধিবিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করছে। এখানেও নবিজি বিশেষ কেউ হতে চাননি। তাঁকে আলাদা করে চেনা যায় এমন কিছু পরিধানও করেননি। নিজের তাঁবুতেও সাদামাটাভাবে থাকতেন। আকার-আকৃতিতে, পোশাক-পরিচ্ছদ— সবকিছুতেই অতি সাধারণ ছিলেন। আমাদের সমাজে আলিম, মুফতিগণ যদি এমন সাদামাটা, স্বতঃস্ফূর্ত, মানুষের এতটা কাছের হতো, তাহলে মানুষের হৃদয়ে তাদের অনেক বেশি প্রভাব থাকত। মানুষ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করত। আর এমনটি করা রাসূল ﷺ-এর অধিক অনুসরণ হতো।

সৌন্দর্যের প্রেমিক

গর্ব আল্লাহকে শোভা পায়

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'রাসূল ﷺ এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করেন। লোকটা লুঙ্গি ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে হেলেদুলে হাঁটত। সে নিজেকে নিয়ে বেশ মুগ্ধ ছিল। আল্লাহ তাকে মাটির সাথে ধসিয়ে দেন। সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাঠির নিচে ধসে যেতে থাকবে।'

এই হাদিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদিস নম্রতা ও শালীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, মানুষকে নিজের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করে এবং নিজের অবস্থান ও পরিস্থিতির ব্যাপারে জ্ঞাত করে। বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়—অহংকারের সব রূপ ও ধরন নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। মুহাম্মাদ ﷺ রাসূল ও বান্দা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন সব ধরনের মিথ্যা ও ভাঁড়ামোপূর্ণ কাজ ও আচরণকে রহিত করতে। খ্যাতি, পদ, প্রভাব, সম্মান ও সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ নিজেকে যে মেকি উপাধিতে ভূষিত করে, তার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই নবিজির আবির্ভাব। অর্থাৎ সকল প্রকারের মেকি বিশেষণ—যা মানুষকে জটিল ও কুটিল বানায়, মানবীয় প্রকৃতি থেকে বের করে দেয়, এমন আচরণ দূর করতেই তিনি এসেছেন। মানুষের এত কীসের অহংকার, যার সূচনা হয়েছিল দুর্বল এক মাংসপিণ্ড থেকে? কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'মানুষ যেন সে দিকে তাকায়, যা থেকে তাঁর সৃষ্টি।'

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্ছলিত পানি থেকে, এই সূচনা মানুষকে কিছুতেই গর্ব ও অহংকার করতে প্রণোদনা দেয় না। কারণ, গর্ব ও বড়োত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক মহান নিয়ামত। তেমনিভাবে মানুষের সমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও মানুষকে গর্ব ও অহংকার করতে শেখায় না। কারণ, মৃত্যু মানে তো ধ্বংস, ক্ষয় ও বিলুপ্তি। তাই দুনিয়ার বড়ো বড়ো রাজা-বাদশা, সম্রাট ও নৃপতি, একনায়ক—সবাই মৃত্যুর মুহূর্তে এসে খুবই অসহায় ও কাতর হয়ে যায়। তারা তখন নিজেদের অবস্থান আশা করে না।

এই হলো বরেণ্যদের শেষ সমাপ্তি! তাই মানুষ যতই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করুক, যতই প্রাচুর্য ও নিয়ামতের মাঝে ডুবে থাকুক, কিছুতেই যেন নিজের শুরু ও সমাপ্তি ভুলে না যায়। কিছুতেই যেন অন্যমনস্ক ও বেখেয়াল হয়ে না পড়ে।

অহংকারের ঠিকানা জাহান্নাম

এই কথাটি অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে। অহংকার ও বড়াই করা অনেক বড়ো পাপ। যে ব্যক্তি বড়াই করে তার শাস্তি আখিরাতের আগে দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যায়। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন—'যার হৃদয়ে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এক লোক বলল, 'মানুষ তো স্বাভাবিকভাবে নিজের কাপড় ও জুতো সুন্দর হোক—এমন কামনা করে। এটিও কি অহংকার হবে?' রাসূল ﷺ বললেন—'নিশ্চয় আল্লাহর সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার, সত্যকে দমিত এবং মানুষকে অন্ধ করে।'

সত্যকে দমন করে—কথাটির অর্থ, সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা। কারণ, অহংকার অন্যের অবস্থান মেনে নিতে পারে না। অন্যজন সত্য কথা বললেও তা মেনে নিতে দেয় না। অথচ সেই ব্যাপারটা যদি নিজের দ্বারা হতো, তবে অনায়াসেই তা গ্রহণ করত। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে ছাড়া কিছুতেই অন্যকে মেনে নিতে পারে না। রাসূল ﷺ এভাবেই বড়াইয়ের পরিচয় দিয়েছেন—সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা এবং যে সত্যের পথে চলছে, তাকে ঘৃণা ও তুচ্ছ মনে করা।

মানুষকে অবজ্ঞা করা—এর অর্থ, তাদের অধিকার খর্ব করা। এমন বহু মানুষ আছে যারা অন্যের দোষ ও পদস্খলন খুঁজে বেড়ায়। ভরা মজলিসে পরচর্চা করতে বেশ মজা পায়। মানুষের ব্যক্তিত্ব, আকার-আকৃতি, চারিত্রিক ও অবয়বগত নানা গুণাগুণ, বিভিন্ন অবস্থা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তোলে। মূলকথা, আমরা মানুষের দোষের পেছনে পড়ব না। এই লোক কৃপণ, ওই লোক লম্বা, বেঁটে, মোটা, কালো ইত্যাদি বলা ঠিক নয়।

ঠিক তেমনি চারিত্রিক নানা দিক নিয়ে কথা বলা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। যেমন : অনেকে বলে, সে আলিম নয়। আবার আলিম হলে বলে, 'সে নিষ্ঠাবান আলিম নয়।' সে কী করে জানে, ওই ব্যক্তির ইখলাস ও নিষ্ঠা আছে কি নেই?

কোনো ব্যক্তি যদি খুব ইবাদতকারী হয় তখন বলে, অতিরিক্ত ইবাদতের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং মূল কাজ হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং নিষ্ঠাপূর্ণ আমল। আচ্ছা বলুন তো, সে কীভাবে জানল তার নিয়্যাত বিশুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ?

আমরা কেন যে মানুষের ইতিবাচক দিকগুলো দেখতে অভ্যস্ত নই! কারও ইতিবাচক দিক কম থাকতে পারে। অন্তত তার ইতিবাচক গুণগুলোর প্রশংসা তো করতে পারি। রাসূল ﷺ-এর শিক্ষায় আমরা এই দিকটি পাই। এই শিক্ষাটা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন না ঘটালে আমরা অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে যাব। সকল প্রকার কল্যাণ ও ইতিবাচকতাকে নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলব। তখন অন্যদের ব্যাপারে কিছুতেই ভালো কিছু কল্পনা করতে পারব না। আমরা যদি কাউকে দ্বীন কিংবা দুনিয়াবি কোনো ক্ষেত্রে ভালো কিছু করতে দেখি, তবে তা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। জেনে কিংবা না জেনে সেটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

সৌন্দর্য ও শরিয়াহ

হাদিসের অন্য দিক : রাসূল ﷺ বলেন—'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।'

এই হাদিসের মর্ম মানুষকে তার দেহগত সৌন্দর্য দিয়ে বিচার করার কথা বলে না; বরং উলটোটা—তথা মনের সৌন্দর্যকে বিবেচনায় রাখার কথা বলে। এজন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। কারণ, ইসলামে সৌন্দর্যের একটা বিশাল গুরুত্ব আছে। ইসলাম তার অনুসারীদের কথায় এবং কাজে—সকল ক্ষেত্রেই বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এমন প্রচুর প্রমাণ, শরয়ি শিক্ষা এবং নির্দেশনা পাওয়া যায়। মানুষের বাহ্যিক দিক, পোশাক, চুল, অবয়ব সর্বোপরি কথায় ও কাজ সবকিছুতেই সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য মানে শুধুই দৃশ্যত রূপ নয়। তারপরও ইসলাম দৃশ্যত রূপের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকী রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে ভালোবাসেন।' তিরমিজি : **২৮১৯**

আল্লাহ যদি আপনাকে সংগতি ও সামর্থ্য দেন, তাহলে অবশ্যই সুন্দর ও আরামদায়ক কাপড় পরিধান করবেন। এমনটি কিছুতেই কাউকে ঘৃণা বা ছোটো চোখে দেখা নয়। ইসলাম কিছুতেই সৌন্দর্যচর্চার বিরোধী নয়; বরং মানুষকে সুন্দর, পরিপাটি ও বিন্যস্ত হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের বিভিন্ন আয়োজন, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গোসল করতে, সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন কাপড় পরতে নির্দেশ দিয়েছে। জুমার দিন গোসল করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন—'স্বপ্নদোষ হওয়া ব্যক্তির উচিত জুমার দিন অবশ্যই গোসল এবং মিসওয়াক করা, সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করা।' কারণ, অনেক মানুষ একত্রিত হবে। তাই নবিজি সবাইকে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তেমনি সুন্দর কাপড় পরার নির্দেশনাও এসেছে। রাসূল ﷺ জুমার দিনে কিংবা কোনো কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় বিশেষ কাপড় পরতেন। সেইসঙ্গে সাহাবাদেরও তেমন করতে নির্দেশ দিতেন।

অনেক মুসলমান সুন্দর ও পরিপাটি কাপড় পরিধানের ব্যাপারে বেশ উদাসীন। চুল আঁচড়ানো ও বিন্যস্ত করে না। অথচ রাসূল ﷺ চুল আঁচড়াতেন, তেল দিতেন। দাড়ি সুন্দর করে আঁচড়াতেন, যেন সুন্দর ও পরিপাটি দেখায়। আলিমগণ অতিরিক্ত দাড়ি নিপুণভাবে কেটে রাখার কথা বলেছেন, এতে দাড়ি সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন দেখায়। আবু হুরায়রা, ইবনে উমর رضي الله عنه সহ আরও অনেক সাহাবা

এমন করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন তাবেয়ি যেমন : সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিব, বিভিন্ন ইমাম যেমন : আহমদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ি, মালিক, আবু হানিফা (রহ.); এ ছাড়াও আরও অনেক ইমাম এমন আমল করেছেন।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

ইসলাম বরাবরই পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূল ﷺ মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস সম্পর্কে বলেন, 'স্বভাবজাত কর্ম পাঁচটি : খতনা করা, ক্ষৌরকর্ম করা, বগলের লোম তুলে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছাঁটা।' এই কাজগুলোর নিয়মিত করতে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে।

রাসূল ﷺ নারীদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। সাহাবাদের তাদের বারণ করতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে তাদের সুগন্ধি ব্যবহার না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, নামাজে যাওয়াটা প্রয়োজনের খাতিরে, কিছুতেই কাউকে প্রলুব্ধ, ফিতনা সৃষ্টি কিংবা কারও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়। সুগন্ধি ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ এই নয়, মেয়েরা দুর্গন্ধ নিয়ে ঘর থেকে বের হবে; বরং পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং পূর্ণ হিজাব পরবে। এই হলো ইসলামের নির্দেশনা; দৃশ্যত খারাপও যেন না দেখায়, আবার দুর্গন্ধও যেন না ছড়ায়।

হাদিসের মধ্যে প্রবৃত্তি কিংবা কাম জাগায় এমন পোশাক বর্জন করতে বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে দুনিয়ার খ্যাতি ও সম্মানের আশায় কাপড় পরে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার কাপড় পরাবেন। তারপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেবেন।' সুনানে নাসায়ি : ৯৫০৪

পোশাকের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা খুবই নিন্দনীয়। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অস্বাভাবিক কাপড় পরা, সবার মাঝে আলাদা করে চোখে পড়ার বিশেষ কায়দায়, প্রথা ও রীতিবিরোধী পন্থায় কাপড় পরিধান করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কখনো কখনো প্রচলিত ফ্যাশন ও চল-বিরোধী ধরনে কাপড় পরিধান করা অতি দৃষ্টিকটু লাগে, খুবই অদ্ভুত দেখায়। এসব দেখে মানুষ মুখ টিপে হাসে।

সাজসজ্জা ও নম্রতা

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'অনাড়ম্বর পোশাক পরিধান ঈমানের অংশ।' আবু দাউদ : ৪১৬১

অর্থাৎ পোশাকে সাদামাটা হওয়া ও বাহুল্যমুক্ত থাকা। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হতে হবে। কারণ, এই দ্বীন সবার কল্যাণের জন্যই।

কিছু মানুষ আছে সৌন্দর্য-পিয়াসি। তারা বেশভূষায়, চালচলনে একটু বেশি পরিপাটি ও বিন্যস্ত থাকতে চায়। তাতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল ﷺ বলেন—'আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।' আল্লাহ তায়ালা সাজসজ্জাকে হালাল করেছেন। পুরুষদের জন্য শুধু রেশমি কাপড় পরিধান, কাপড় ঝুলিয়ে চলা এবং অহংকারবশত পেছনে কাপড় রাখা ইত্যাদিকে হারাম করা হয়েছে। চুরি করা কিংবা অবৈধ কাপড় পরিধান হারাম; বাকি সবকিছুই বৈধ। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের জন্য কল্যাণের দরজা খোলা রেখেছেন। সুন্দর অথচ বৈধ রীতিতে পরা কাপড়ের জন্য হয়তো উত্তম প্রতিদানও মিলতে পারে!

পক্ষান্তরে কিছু মানুষ আছে যারা স্বভাবগতভাবেই পোশাক-পরিচ্ছদে, খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে অনাড়ম্বতা ও সাদামাটা ধরন পছন্দ করেন। তাদের জন্যও ইসলামের সুন্দর উৎসাহ বাণী আছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'পোশাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বরতা ঈমানের অঙ্গ।'

এই নম্রতা ঈমানের অংশ। তাঁরা আখিরাতের আড়ম্বরতাকেই বেছে নিয়েছে!

পোশাক নির্বাচনে মানুষের মতামত

যেকোনো মুসলমানের জীবনে পরিপাটি ও বিন্যস্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিম তার আপন সমাজের প্রচলিত পোশাকই পরিধান করবে—যদি তা শরিয়াহর দৃষ্টিতে অবৈধ না হয়। যদি সীমালঙ্ঘন করে, খোদায়ি নির্দেশের পরিপন্থি হয়, তবে কিছুতেই সেই পোশাক পরিধান করা যাবে না। সমাজের রীতি অনুযায়ী পোশাক পরলে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পলন করবে। তাদের মেলামেশা, কাছে যাওয়া এবং প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় তারা ভাববে এই মানুষটা ভিনগ্রহের কেউ। তাদের ও তার মাঝে বিশাল তফাত তৈরি হবে, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে। তাই তাদের আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং প্রভাব বিস্তারে তাদের প্রচলিত সংস্কৃতিকে ধারণ করতে হবে।

ইসলাম শরিয়াহ সমর্থিত সব ধরনের কাপড় পরতে অনুমতি দিয়েছে। তাই মুসলমানদের দেশভেদে বিভিন্ন ধরন ও আকৃতির কাপড় পরিধান করতে দেখা যায়। একজন মুমিনের তার আশপাশের পরিবেশের সাথে মানানসই কাপড় পরিধান করা উচিত। যাদের সাথে প্রতিদিন উঠাবসা হয়, তাদের সাথে সাদৃশ্য রেখে চলতে হবে। তবে হ্যাঁ, পোশাক অবশ্যই শরিয়াহ সমর্থিত হতে হবে। রাসূল ﷺ মক্কায় থাকাকালীন সেখানকার মানুষের সাথে মিল রেখে কাপড় পরতেন। আবার মদিনায় এসে মদিনাবাসীর ধরন অনুযায়ী কাপড় পরতেন, পাগড়ি পরতেন আবার পাগড়ি ছাড়াও হাঁটতেন।

একদিন আল্লাহর রাসূল সাহাবাদের সাথে পথে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। অর্থাৎ তাঁর মাথায় কিছুই ছিল না। রাসূল ﷺ কখনো টুপি বা মাথায় সহজেই বাঁধা যায় এমন কাপড় পরতেন। এমনকী শত্রুদের সাথে যুদ্ধে গনিমতস্বরূপ পাওয়া কাপড়ও পরতেন।

ইসলাম কোনো পোশাক নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং পোশাকের ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। মূলত মানুষ কী পরিধান করে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এমন পোশাকই পরিধান করে—যা বৈধ ও শরিয়াহ সমর্থিত। স্বাভাবিকভাবে শরিয়াহ মানুষের প্রাত্যহিত ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়কে বৈধ করেছে। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ মুসলমানদের বৈধতার পরিসরকে অনেক বড়ো করেছেন। নানা নিয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন বদল ও পরিবর্তন, কাছের পরিবেশ ও দূরের পরিবেশের সাথে তাল মেলানোর পরিসর রেখেছেন। আরব-অনারব সব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও ইসলাম রেখেছে।

স্বপ্ন

এই জাতি ঘোর অন্ধকার আর অজ্ঞতার মাঝে বুঁদ হয়ে ছিল। আল্লাহ তাদের কাছে নবি পাঠিয়েছেন; জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। এই দ্বীন ও কুরআনের মাধ্যমে তাদের আলোকিত করেছেন। ফলে একসময় তারা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। তাদের মানবতার কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা ছিল রাখাল। মরুভূমিতে মেষ চরানো ছিল তাদের পেশা, জীবিকা নির্বাহের উপায়। আল্লাহ তাদের বিশ্বনেতৃত্ব দান করেছেন, জগৎশ্রেষ্ঠ নৃপতিতে পরিণত করেছেন।

আবু বকর ﵁ ছিলেন রাসূল ﷺ-এর বন্ধু। তিনিই প্রথম নবিজির প্রতি ঈমান আনেন। কুরআনে তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে—

> 'দুজনের একজন যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিল।' সূরা তাওবা : ৪০

তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা। তাঁর অগণিত গুণাবলি রয়েছে, এখানে সেগুলোর বর্ণনা দেওয়ার সুযোগ নেই।

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন

একবার এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এলো। লোকটা বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাতে স্বপ্ন দেখেছি, একটা ছায়া থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে। মানুষ মুঠোয় মুঠোয় তা থেকে নিচ্ছে; কেউ কম, কেউ-বা বেশি। আকাশ ও জমিনের মাঝে একটা যোগসূত্র দেখা গেলেন। আপনাকে দেখলাম তা ধরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছেন। তারপর আপনার পরে এক লোক তা ধরল। তিনিও ওপরের দিকে উঠে গেলেন। তারপর অন্য একজন লোক ধরল। তিনিও উঠে গেলেন। তারপর অন্য একজন লোক ধরল। কিন্তু তিনি মাঝপথে ছিন্ন হয়ে গেল। পরে আবার যুক্ত হলেন এবং ওপরের দিকে উঠে গেলেন।' আবু বকর ﵁ বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে স্বপ্নটার ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, করো।' আবু বকর ﵁ বললেন—'ছায়াটা হলো ইসলামের ছায়া। যা মধু ও ঘি থেকে ঝরে পড়ছে, তা হলো কুরআন, তার মিষ্টতা ও কোমলতা।

মানুষ তা-ই মুঠোয় মুঠোয় নিচ্ছে। যে কম নিচ্ছে, তার কুরআনের জ্ঞান কম। আর যে বেশি নিচ্ছে, তার কুরআনের জ্ঞান বেশি। আকাশ ও জমিনের সম্পর্ক হলো, আপনি যে সত্যেকে ধরে আছেন তা। আল্লাহ আপনাকে তা নিয়েই ওপরে তুলে নিয়েছেন। আপনার পরে একজন ব্যক্তি আছে—তিনি তা নিয়ে ওপরে চলে যান। তারপর অন্য একজন আসেন, তিনিও তা নিয়ে ওপরে চলে যান। তারপর আরেকজন আসেন, কিন্তু সে মাঝখানে ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরোক্ষণে আবার যুক্ত হন, তারপর ওপরে দিকে চলে যান। এখন আপনি বলুন, আমার কথা কি ঠিক না ভুল?' রাসূল ﷺ বলেন—'তুমি কিছুটা ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল বলেছ।' আবু বকর رضي الله عنه বললেন—'খোদার কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভুলটা বলে দিন।' রাসূল বললেন—'তুমি কসম করো না।'

এই হাদিসে বেশ কিছু শিক্ষণীয় দিক আছে।

আবু বকর رضي الله عنه স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের সর্দার

প্রথম : আবু বকর رضي الله عنه এই স্বপ্নের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ, স্বপ্নটা অদৃশ্য জগৎ; আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। এটা এমন এক ব্যাপারের সাথে সম্পৃক্ত—যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। স্বপ্ন হলো একটা জানালা—যা দিয়ে মানুষ নিজের অজানার জগতের দিকে তাকাতে পারে। তাই হাদিসে এসেছে—

> 'সৎ মানুষের উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।' সহিহ বুখারি : ৬৯৮৩

তাই আসমা বিনতে আবি বকর رضي الله عنها তাঁর পিতার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখেছেন। মূলত এখান থেকেই ইবনে সিরিনের স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান আসে। কারণ, তিনি আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنها-এর গোলাম ছিলেন। ইবনে সিরিন ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী তাবেয়িদের সর্দার।

মূল ব্যাপার হলো, আবু বকর رضي الله عنه-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার ধরন। তিনি বলেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ভুল করেছি, না ঠিক করেছি?' নবিজি বললেন—'তুমি কিছুটা ঠিক বলেছ, আর কিছুটা ভুল বলেছ।' তখন আবু বকর رضي الله عنه আবার বললেন—'আমি কোনটা ভুল করেছি এবং কোনটা ঠিক করেছি?' সাথে তিনি কসমও করলেন। তখন নবিজি তাঁকে বললেন, 'কসম করো না।' অর্থাৎ আমি কখনোই তোমাকে বলব না; এমনকী তা সুসংবাদ হলেও। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নবুয়তের একটা অংশ। তাতে অনেক বড়ো প্রভাব রয়েছে। রাসূল ﷺ স্বপ্ন দেখতেন এবং তার ব্যাখ্যাও করতেন। কুরআনে ইউসুফ عليه السلام-এর কাহিনি বিবৃত হয়েছে। বাদশার স্বপ্ন এবং ইউসুফ عليه السلام কর্তৃক তার ব্যাখ্যাদানের কথাও এসেছে।

স্বপ্ন জট খোলে

দ্বিতীয় : স্বপ্ন কখনো কখনো স্বস্তি নিয়ে আসে। কারণ, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মাঝে বসবাস করা মানুষই বেশি স্বপ্ন দেখে। অনেকটা কয়েদি ব্যক্তির মতোই। কয়েদিরা একে অপরের সাথে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, 'গতরাতে কী স্বপ্ন দেখলে?'

এভাবে ইউসুফ ﷺ-এর কাহিনির মধ্যেও আমরা দুজন লোকের দেখা পাই, যারা তাঁর সাথে কারাগারে ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'তাদের একজন বলল—"আমি নিজেকে মদ গলাতে দেখছি।" অন্যজন বলল—"আমি নিজেকে মাথার ওপর করে রুটি বহন করতে দেখলাম, তার থেকে পাখিরা খাচ্ছে।"'
> সূরা ইউসুফ : ৩৬

ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন

কঠিন ও তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখে। ঘুমের আবেশের ভেতরে মানুষ নানা স্বপ্ন দেখে। তাই বর্তমানে মুসলিম সমাজ অনেকটা অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে স্বপ্নরোগ এবং সেটার ব্যাখ্যার ব্যাধি দেখা দিয়েছে। মানুষ সাধারণত যা দেখে—তা নিয়েই কথা বলে এবং জানতে চায়। আজকাল স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর অনেক বই পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে অনেক সাইট দেখা যায়। তার সবগুলোই যে খারাপ তা নয়; বরং কিছু ভালো সাইটও আছে।

কিন্তু এতেই শেষ নয়; বরং কিছু মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। অথচ এমনটা করা কিছুতেই উচিত নয়। কারণ, যখন পাঁচ/ছয় ঘণ্টা ঘুমায়, তখন স্বাভাবিকভাবে স্বপ্ন দেখে। কখনো কখনো বেশ বড়ো স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তার সময়কাল তত বেশি নয়; মাত্র কয়েক সেকেন্ড! মানুষ ছয় ঘণ্টা ব্যাপ্তি ঘুমে অনেক দীর্ঘ ঘটনা দেখতে পারে। এমনকী স্বপ্নে দেখা ঘটনার ব্যাপ্তি ঘুমের ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। মানুষ যদি সেই দীর্ঘ স্বপ্ন স্মরণ করতে যায় এবং তার প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা করে করে ব্যাখ্যা জানতে চায়, তাহলে তা বিশাল এক সমস্যায় পরিণত হবে। অথচ দ্বীন, কল্যাণ, ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নিজেদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় আমাদের নেই। এসব ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত। বাস্তব ও প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগ দিই না। তাই আমাদের নফস অর্থহীন কাজে ব্যস্ত থাকতে প্রণোদনা দেয়। মুসলিম বিশ্ব আজ ঘুমন্তপুরীতে পরিণত হয়েছে। তাই অর্থহীন স্বপ্নে মজে আছে। বাস্তবতার তিক্ততা ও পরিস্থিতির ভয়াবহতার মুখোমুখি হওয়ার মতো ক্ষমতা ও সক্ষমতা তাদের নেই। বড়ো বড়ো উন্নয়নমূলক, সংস্কারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে অক্ষম। তাই ঘুমে দেখা স্বপ্নই তাদের অযোগ্যতা ঢাকার মোক্ষম ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নের মাঝেই তারা ভুলে থাকতে চায়, সান্ত্বনা খুঁজে এবং আশা দেখে।

কারাগারের অন্ধকারে প্রকোষ্টে পড়ে থাকা কয়েদি সর্বদা বিষণ্ন ও বিমর্ষ থাকে। একপ্রকার উদ্বেগ ও কুণ্ঠাবোধ তাকে ঘিরে ধরে। তীব্র মানসিক চাপ তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই সে ঘুমে দেখা স্বপ্নকে বেশ গুরুত্ব দেয়। কারণ, তার কাছে অন্য কোনো খবর নেই। চারপাশের পরিস্থিতি জানার উপায় নেই। পরিবার-পরিজন, মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, সম্পদ, প্রতিবেশী ইত্যাদি সম্পর্কে জানার কোনো মাধ্যম নেই। কিন্তু তাদের চিন্তা তাকে কুরে কুরে খায়। তাই সে স্বপ্নে দেখে। সে স্বপ্নে কখনো বাস্তবতার মিল থাকে, আবার কখনো থাকে না। শুধু ধারণাপ্রসূত কিছু ব্যাপার ঘটে থাকে।

স্বপ্নের আসক্তি

তৃতীয় : রাতে দেখা স্বপ্ন এতটাও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয় যে, সেটার খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হবে। কোথায় ভুল কোথায় শুদ্ধ—সবকিছুই জানার কোনো অর্থবহতা নেই। মানুষ ঘুমেই অনেক কিছুই দেখে। সবকিছু জানতে ও বুঝতে পীড়াপীড়ি করা কিছুতেই সুবিবেচক মনের কাজ হতে পারে না। অনেকে এটাকে রীতিমতো আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈষয়িক আদান-প্রদান চলে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। অথচ মূল ব্যাপার এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পয়সার বিনিময়ে তা জানতে হবে। সাধারণত এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। তারা তাদের স্বভাবজাত আবেগতাড়িত মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতার কারণে এ দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। এই ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে এতটা মাতামাতি করা কিছুতেই ঠিক নয়; বরং আপন জায়গায় রাখা উচিত। স্বপ্ন সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। কোনো ইতিবাচক দিক ও আশা সৃষ্টি করতে পারে। অন্ততপক্ষে সুলক্ষণ বয়ে আনতে পারে। এটা খুবই ভালো দিক। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা মানুষকে সুসংবাদ শোনাতে পারে। মানুষের মনও আনন্দ-খুশিতে ভরে ওঠে।

রাসূল ﷺ-কে কখনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, ‘ভালো দেখেছ, আমাদের জন্য কল্যাণকর, আমাদের শত্রুদের জন্য দুঃসংবাদ।’ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং শুভ দিক মনে করা ভালো। কিন্তু এটাকে যেন কিছুতেই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে না নিই। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশ্ন, বাড়াবাড়ি বা পীড়াপীড়ি কোনোটাই করা উচিত নয়। মানুষ ঘুমে দেখা স্বপ্ন নিয়ে এতটাই ব্যাকুল, ইসলামের ব্যাপারেও ততটা ব্যাকুল ও কৌতূহলী নয়। এমনকী নিজেদের সমস্যা নিয়েও এতটা উদ্‌বিগ্ন ও কাতর নয়। কারণ, মানুষ সর্বদা ভালো ও ইতিবাচক কিছু শুনতে চায়। আশার আলো দেখতে চায়। কিছু মানুষ আছে যারা স্বপ্নকে কেন্দ্র করে নানা রকম সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো কোনো তরুণী বিয়ে করতে চায়। তাই সে স্বপ্নের আশায় ঘুমাতে যায়!

এই ব্যাপারগুলো মানুষের মন-মেজাজ ও প্রকৃতিকে বদলে দেয়, কলুষিত করে। স্বপ্ন কাউকে এগিয়ে নেয় না আবার পিছিয়েও দেয় না; বরং কোনো অর্থবহতা নেই। বড়োজোর মানুষ এতটুকু করতে পারে—দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহকে বলা, এই স্বপ্ন যদি ভালো ও কল্যাণকর হয়, তাহলে যেন তা-ই ঘটে। আর যদি খারাপ কিছু হয়, তাহলে তা যেন কখনো না ঘটে। এভাবে তার মানসিক চাপ যেন দূর হয়ে যায়। ব্যাপারটা এমন নয়, স্বপ্নে কেউ এসে তাকে বলবে—'তুমি এটা করো, এটা করো না।' কোম্পানি, পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্তও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে হয়। মাঝে মাঝে গোটা জাতির স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তও স্বপ্নের ওপর ভর করে হয়। সে সিদ্ধান্তের ওপর বড়ো বড়ো কাজও হয়। অথচ শরিয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে কোনো প্রকার গুরুত্ব নেই!

কিন্তু হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা, সঠিক-ভুল ইত্যাদি স্বপ্নের ওপর নির্ভর করে হয় না। আবার মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদিও স্বপ্নের ভিত্তিতে হয় না।

হৃদয়ের জল্পনা

অধিকাংশ সময় স্বপ্ন মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়। স্বপ্নে মানুষের মনের কথা ফুটে ওঠে। তাই রাসূল ﷺ বলেন—

> 'স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন হয়, তেমনি শয়তানের পক্ষ থেকেও। আবার কখনো শুধুই মনের কথা স্বপ্নে প্রতিবিম্বিত হয়ে দেখা দেয়।'

আমার দীর্ঘ জীবনের পঠন-পাঠন, জানাশোনা এবং মানুষের মনসতত্ত্ব দেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, সাধারণত মানুষ স্বপ্নে যা দেখে—তা অনেকটা মনের জল্পনা। স্বাভাবিকভাবে জাগরণের সময় যে মনোভাব, চিন্তা ও ব্যস্ততা মানুষকে ঘিরে ধরে, তা-ই স্বপ্নে আসে। সাধারণত মানুষ যখন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে, তা নিয়ে বেশি কথা বলে, আলোচনা করে, ঘুমেও মানুষ একই ব্যাপারগুলো আওড়ায়, স্বপ্নে দেখে। এই কথাগুলোর কোনো মূল্য নেই। এগুলো শুধুই মনের জল্পনা। এগুলোর তেমন কোনো অর্থ নেই, তাৎপর্য নেই। এগুলো করণীয় বা বর্জনীয় কোনো কিছুই নির্ধারণ করে না। স্বপ্ন সত্য-মিথ্যার নির্ণায়ক নয়; বরং তা শুধুই মনের কানের ফিসফিসানি, ঘুমের ঘোরে ঘটা কিছু জল্পনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই হয়।

মানুষ কখনো কখনো বিভিন্ন ব্যক্তি, সংকেত আরও নানা ব্যাপার নিয়ে স্বপ্ন দেখে। এসব ক্ষেত্রেও মানুষের সংযম থাকা চাই। কিছুতেই বাড়াবাড়ি না করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই। কারণ, এতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে; নিজের ও অন্যের, বিশেষ করে যার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়। কখনো কখনো বড়ো কোনো ফিল্ম, গল্প, পূর্ব ঘটনা ইত্যাদির ব্যাপারেও স্বপ্ন দেখা হয়। স্বপ্ন কখনো দশ মিনিট আবার কখনো পনেরো মিনিটের হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। শুধুই মনের কল্পনা-জল্পনা।

জাগরণ ঘুমের চেয়ে উত্তম

পঞ্চম : মানুষের কাছে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান আছে। মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও আস্থা আছে। জ্ঞান ও বিবেক আছে—যা দিয়ে সে চিন্তা করে, ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য করে। সেই অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সে কী করবে? তার চারপাশে মুমিন ভাইয়েরা আছে, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আছে। তাদের সাথে এমন পরিস্থিতিতে পরামর্শ করবে? স্বপ্ন যদি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই শুভ সংবাদ বয়ে আনবে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ রয়েছে।' সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪

কোনো কোনো মুফাসিসর বলেন—'সুসংবাদ হলো উত্তম স্বপ্ন। তা মানুষকে কল্যাণের সংবাদ দেয়। কখনো কখনো তা মানুষের জন্য সর্তকবার্তা বা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসে।'

নবুয়ত খেল-তামাশার বস্তু নয়

শেষ কথা : নবুয়ত নিয়ে কিছুতেই খেল-তামাশা করা যাবে না। স্বপ্নের ব্যাপারে কুরআনের প্রচ্ছন্ন আভাস হলো, তা একপ্রকার সমাধান। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'তোমরা দুজন যে ব্যাপারে জানতে চাইছ, তা ইতোমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।' সূরা ইউসূফ : ৪১

তাই মুমিনের সে ব্যাপারে ভালো কিছু প্রত্যশা করা উচিত। সবকিছুর ব্যাপারে খুঁটিনাটি জানতে না চাওয়াই ভালো। মূল বক্তব্য হলো—অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করা। মানুষের মাঝে ভীতির সৃষ্টি হয় এমন কিছু থেকে বিরত থাকা। মানুষ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দীর্ঘ জীবন পার করে দেয়। কারণ, সে একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছে। তার ভীতিকর ব্যাখ্যা শুনেছে। সেই ভীতিকর ব্যাখ্যার রেশ আর প্রভাব দীর্ঘ জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে সেই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খেয়েছে। মৃত্যুর পরে খোদার কাছে জানতে পেরেছে, তার স্বপ্ন ছিল ভুল। অনেকে স্বপ্নকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বসে থাকে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তা শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তা নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। ব্যাখ্যার জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে। অথচ রাসূল ﷺ আবু বকর ؓ-কে বলেছেন—'তুমি কিছু ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল বলেছ।'

রেগে যাবেন না

সুলাইমান ইবনে সুরাদ ﵁ বলেন—

> ‘রাসূল ﷺ-এর কাছে দুজন লোক গালিগালাজ করল। আমরা তখন তাঁর কাছে বসে আছি। একজন অন্যজনকে গালি দিচ্ছে। গালি শুনে অপরজনের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ বললেন, “আমি এমন একটা বাক্য জানি—যা কেউ বললে তার রাগ উপশম হবে। তা হলো, আউজুবিল্লাহি মিনাস শায়ত্বানির রাজিম—আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এক সাহাবি রাসূল ﷺ-এর কথাটা শুনলেন। সে সাথে সাথে গিয়ে ঝগড়ারত ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ-এর কথাটা শুনিয়ে বললেন, “তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।” এ কথা শুনে লোকটার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তার হাত কাঁপতে লাগল। তারপর বলল—“তুমি কি আমার মধ্যে কোনো প্রকার রাগ দেখতে পাচ্ছ? আমি কি পাগল? যাও, নিজের কাজে মনোযোগ দাও!”’ তিরমিজি : ৩৪৫২

এই ঘটনার শিক্ষা

এক : ক্ষোভের সময় মানুষের বক্তব্য

রাসূল ﷺ-এর ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, রাগ শয়তানের তাড়না থেকেই তৈরি হয়; যদি সে রাগ অযৌক্তিক ও অন্যায্য ব্যাপারে হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় রেগে যায়। নিজের মতকে জাহির করার জন্য রেগে যায়।

মানুষ যখন দেখে নিজের ব্যক্তিত্ব হুমকির মুখে, তখন সে সহ্য করতে না পেরে রেগে যায়। যখন নিজের আঁতে ঘা লাগে, তখন রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। নিজের নেতৃত্ব ও প্রভাবে চিঁড় ধরলে রেগে যায়।

ক্ষুব্ধ ও রাগী মানুষ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে—

প্রথমত : যারা খুবই মন্থর গতিতে রাগে, আবার তাদের রাগ ভাঙতেও অনেক সময় লাগে। একবার রেগে গেলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে বেশ সময় লাগে।

দ্বিতীয়ত : যারা দ্রুতই রেগে যায় এবং দ্রুতই রাগ দমে যায়। তার সাথে একটু বুঝে-চিন্তে আচরণ করলেই রাগ ভেঙে যাবে।

তৃতীয়ত : যারা মন্থর গতিতে রাগে, কিন্তু দ্রুতই রাগ ভাঙে। এটাই তুলনামূলক সর্বোত্তম অবস্থা। এরা সচরাচর রেগে যায় না। কালেভদ্রে রেগে গেলেও দ্রুতই রাগ প্রশমিত করে এবং আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করে। নিজের বোধ ও বিবেক ফিরে পায়।

চতুর্থত : যারা দ্রুতই রেগে যায়, কিন্তু কিছুতেই রাগ কমে না। ক্ষোভ প্রশমিত হয় না। দ্রুতই ও তুচ্ছ কারণে রেগে যায়। যদি একবার রেগে যায়, তবে তার রাগ ভাঙানো বেশ কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ে।

দুই : রাগ ও স্বভাব

রাগ মানুষের স্বভাবজাত একটা গুণ। মানব-প্রকৃতিতে রাগ বিদ্যমান থাকার কিছু প্রজ্ঞা, কৌশল ও উপকারিতা আছে। সঠিক উপায়ে রাগ ও ক্ষোভের ব্যবহার হলে অজুত-কোটি উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন রাগ মানুষের ওপর চড়ে বসে। রাগে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। রাগের বশীভূত হয়ে নানা অহেতুক কাজ করে বসে। কোনো প্রকার বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা ও ব্যক্তিত্ব তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সহনশীলতা ও বিবেক-বুদ্ধি আব্দুল কায়সকে আহত করেছিল। একবার তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে আগমন করেন। নবিজি ﷺ তাঁকে বলেন, ‘মহান আল্লাহ তোমার দুইটা গুণ পছন্দ করেন; তা হলো—সহনশীলতা ও স্থিরতা।’ তিনি বললেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! এই দুই গুণ খোদায়ি প্রদত্ত না আমার অর্জিত?’ রাসূল ﷺ বললেন—‘বরং আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন।’ তিনি বললেন—‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাকে তাঁর পছন্দের দুটি গুণ দান করেছেন।’

তিন : ক্ষোভ উপশমের পথ্য

ধৈর্য, অবিচলতা ও সহনশীলতা অনায়াসে আসে না। দীর্ঘদিনের চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আপনি হয়তো কারও সাথে কথা বলছেন। কিন্তু আপনার সাথে কথা বলা ব্যক্তিটি তুচ্ছ ব্যাপারেই রেগে ফেটে পড়ে, দাঁত কটমট করে। চেহারায় রাগ ও ক্ষোভের আলামত ভেসে ওঠে। চোখমুখ লাল হয়ে যায়। শরীরের নাড়াচড়া অস্বাভাবিক হয়ে যায়। গর্দানের রগ ফুলে যায়। এমতাবস্থায় সে হয়তো কাউকে মারতে, সীমালঙ্ঘন করতে কিংবা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

মানুষ রাগের মাথায় অনেক সিদ্ধান্ত নেয়, কাজ করে; এমনকী গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতেও রাগ সংবরণ করতে পারে না। অবশ্য এর জন্য পরে আফসোস করতে হয়। রাগের মাথায় কিছু না ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাশুল গুনতে হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা কিছুতেই শোধরানো যায় না। রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সিদ্ধান্তের কারণে কত সংসার ভেঙেছে! স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হয়েছে। পরে খুব লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে সময় অনেক দূর গড়িয়ে গেছে! রাগের মাথায় নেওয়া এমন অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে কতজন স্ত্রী, সম্পদ, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে জীবন তো হারিয়েছে, তার চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো—অনেকে দ্বীন, আখিরাতও হারিয়েছে। এতসব হারানোর মূল কারণ হলো রাগ।

কিছু মানুষ আছে যারা রাগের মাথায় গালি দিয়ে বসে। কিন্তু গালি দেওয়ার সময় খেয়াল থাকে না, কাকে গালি দিচ্ছে! রাগের চোটে অনেক সময় দ্বীন, রাসূল, কুরআন এমনকী আল্লাহকে পর্যন্ত গালি দেয়! নাউজুবিল্লাহ! এমন আরও জঘন্য কাজ করে বসে। এর একমাত্র কারণ হলো শিক্ষা ও ভদ্রতা-জ্ঞানের অভাব। শিষ্টাচার, যথাযথ দীক্ষা এবং যথার্থ উপায়ে গড়ে না তোলার অভাবেই মূলত এমন হয়। কারণ শিষ্টাচার, মার্জিত ও রুচিশীল আচরণের শিক্ষাই একমাত্র মানুষকে বিশুদ্ধরূপে গড়ে উঠতে শেখায়, নিজের রাগকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। সেইসঙ্গে রাগ, ক্ষোভ ও মানসিক উৎপীড়ন থেকে বাঁচতে শেখায়।

একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে এক লোক এলো। সেই লোক বললেন—

> ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবিজি বললেন—“কিছুতেই রাগ করো না।” এই বাক্যটা তিনি বেশ কয়েকবার আওড়ালেন।’ সহিহ বুখারি : ৬১১৬

এই উপদেশটা শুধু ওই লোকের জন্যই নয়; বরং সেটা আমার, আপনার, আমাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। মানুষের শেখা উচিত, কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কীভাবে নিজেকে চালিয়ে নিতে হয়। কেউ যখন উত্তেজিত হয়, তাকে কীভাবে এড়িয়ে যেতে হয়—সেই কৌশলও জানতে হয়। যখন কারও স্বামী রেগে যায়, তখন স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে কোমল আচরণ এবং রাগ প্রশমন করার চেষ্টা করা। স্ত্রী রেগে গেলে স্বামীরও তার রাগ ভাঙানো, শান্ত করা এবং সন্তুষ্ট করা উচিত। এতে পৌরুষ কমে যায় না। ব্যক্তিত্ব ফিকে হয়ে আসে না। কিছু মানুষ মনে করে এমনটা করলে তার জাত থাকবে না! অথচ ব্যাপারটা ঠিক উলটো। সঠিক মুহূর্তে সঠিক কাজ করাই হলো বুদ্ধিমান পুরুষের কাজ।

রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাগ শয়তানের তাড়না ও প্ররোচনায় সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর সাহাবিদের নিচের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে গড়ে তুলছেন—

১. বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

২. অজু করা। কারণ, অজু শয়তানকে দূরে ঠেলে দেয় এবং রাগ প্রশমিত করে।

৩. অবস্থার বদল। মানুষ রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে। যদি বসে থাকে, তখন শুয়ে পড়বে। কারণ, রাগের সময় বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনে রাগ কমে যায়।

রাগ দমনের জন্য বিভিন্নজন বিভিন্ন কৌশলের কথা বলেছেন। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি রাগান্বিত ব্যক্তিদের মনের অবস্থার চিত্রায়ণ করেছেন এভাবে—যদি রেগে যান, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখুন। দেখবেন, খুবই বীভৎস ও কদাকার দেখাবে। এতই বিদঘুটে ও কুৎসিত দেখাবে, আয়নার দিকে তাকাতেই পারবেন না। মনে হবে এই চেহারা আপনার পরিচিত নয়, তাকে চেনেন না। মনে হবে যেন কোনো শয়তান আপনার কাপড় পরিধান করে আছে। কিছুতেই তা আপনার শান্ত, কোমল চেহারার সাথে মেলে না। সর্বজনের কাছে পরিচিত রূপের সাথে এই রূপের কোনো মিল নেই।

সুতরাং মানুষের এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক উচিত, সে যেন কিছুতেই রাগের জন্য প্রসিদ্ধ না হয়। তাড়নাবোধের স্বীকার না হয়; বরং যে পরিস্থিতিতে সে রেগে যায়, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে। যদি আশঙ্কা হয়—অমুক পরিস্থিতিতে নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারবেন না, তাহলে সেখান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই উত্তম।

চতুর্থ : দায়িকে তার শ্রোতার পরিস্থিতি আমলে নেওয়া

এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত হাদিসে একটা বিষয় বেশ লক্ষণীয়—রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা দেওয়ার ধরন। তিনি সরাসরি রাগান্বিত ব্যক্তিকে গিয়ে বলেননি, 'অমুক! তুমি এমন করো না। আল্লাহকে ভয় করো। রাগ করো না। বলো, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' বরং তিনি তার কাছের সাহাবাদের এমনভাবে বললেন, যেন সে শুনতে না পারে—'আমি এমন একটা বাক্য জানি, তা যদি কেউ পড়ে, তাহলে তার থেকে ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে।' এক সাহাবি সেই রাগান্বিত ব্যক্তির কাছে গেল। তারপর তার কানে কানে বলল—'বলো, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা শুনে লোকটার মাথার রগ চড়ে যায়। সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—'তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ? যাও এখান থেকে!'

এখান থেকে কী বোঝা যায়? রাসূল ﷺ লোকটাকে সরাসরি কিছু বলেননি; বরং তাঁর নিকটবর্তী সাহাবাদের বললেন। কারণ নবিজি জানতেন, লোকটা রেগে আছে। এখন তাকে কিছু বলা সমীচীন হবে না। বলতে গেলে উলটো প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। তার মাথা আরও গরম হয়ে যেতে পারে। এমন কথাও বলতে পারে—যা তার দ্বীন নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। লোকটা সেই সাহাবিকে যা বলেছে, অমন কথা রাসূল ﷺ-কেও হয়তো বলতেন—'তুমি কি আমাকে পাগল ভেবেছ? সরো এখান থেকে।' এমন বক্তব্য সাহাবিকে বলা গেছে, কিন্তু কিছুতেই রাসূল ﷺ-কে বলা যেত না!

এখান থেকে তাঁর শিক্ষার ধরন ও প্রকৃতি বোঝা যায়। তিনি সরাসরি শিক্ষা দিতেন না। এ ছাড়াও উম্মাতের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাই একজন দায়ির উচিত, দাওয়াত দিতে যাওয়া লোকটার অবস্থা বোঝা। এই কথা মনে রাখা—তার সামনে বসে থাকা লোকটা অনুভূতিহীন কোনো যন্ত্র নয়; বরং রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তার মধ্যে অনুভূতি আছে, ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন আছে। আর একদিনেই সব ভুল শোধরানো যায় না। মুহূর্তেই সব পদস্খলন ঠিক করা যায় না। তাই বিজ্ঞ ও দয়ার্দ্র দায়ি কিছুতেই কোনো মানুষের ব্যাপারে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয় না। কোনো বিশেষ ঘটনা দেখে তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় না। একটা গুনাহ বা অপরাধ দেখেই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে না। তাকে জাহান্নামবাসী মনে করে না। কারণ, এই মানুষের মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে। তার ঈমান আছে। তার মন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়, আক্ষেপ করে। কিন্তু সে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন পাপ কাজে জড়িয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘প্রত্যেক মানব সন্তানই পাপপ্রবণ। পাপিষ্ঠদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো তওবাকারীরা। তিনি আরও বলেন—ওই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পাপ না করো, তাহলে তোমাদের স্থানে এমন এক জাতিকে আনা হবে যারা পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহও তাদের ক্ষমা করবেন।’ ইবনে মাজাহ : ৪২৫১

তাই আমাদের উচিত কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, পাপ, পদস্খলন ইত্যাদি দেখে মানুষের বিচার না করা; বরং তাদের মানসিক অবস্থা ও চলমান পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা। মানুষ রেগে থাকলে একরকম আচরণ করে, প্রসন্ন ও ফুরফুরে মেজাজে থাকলে আরেক রকম। কখনো দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়ে কথা বলে, আবার কখনো উদাসীন ও নির্লিপ্তভাব নিয়ে কথা বলে। তাই প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা বুঝে আচরণ করা উচিত। যারা রেগে থাকলে কোমল ও নরম সুরে কথা বলে, তাদের কাছে সুন্দর উপায় ও কৌশলে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

কিছুতেই তাদের প্ররোচিত করা ঠিক নয়। তাদের রাগ বাড়ানো কিংবা দুশ্চিন্তা ও মনের জ্বালা দ্বিগুণ করা উচিত নয়। সর্বোপরি মানুষকে খারাপ থেকে খারাপতর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে জঘন্যতম কাজ। মানুষের প্রকৃত অবস্থা ও মূল পরিস্থিতি না বুঝে তাদের সাথে কথা বলতে যাওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। তাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তাদের কঠিন পরিস্থিতি থেকে টেনে তোলা। তাদের কষ্ট ও দুশ্চিন্তা লাঘব করা। এই কাজটা অনেক বড়ো উপকার ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। সর্বদা মানুষকে পরোক্ষভাবে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে।

মানুষকে সরাসরি সম্বোধন করতে যাবেন না। মুখের ওপর কথা বলে দেবেন না। রাসূল ﷺ বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও ঘটনাকে কেন্দ্র মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতেন। তিনি বলতেন, ‘এই জাতিগুলোর কী অবস্থা—যারা বলে একটা কিন্তু করে উলটোটা?’ তারপর বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা খোলাসা করতেন।

দাওয়াত ও তিরস্কার

মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় কিছুতেই কড়া ভাষায় কথা বলা যাবে না। প্রকাশ্যে নিন্দা ও তিরস্কার করা যাবে না। দাওয়াতে যেন বিন্দুমাত্র কঠোরতা ও নির্দয়তার ছাপ না থাকে। যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তার মনোভাব, মনের অবস্থা সর্বোপরি সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়েই দাওয়াত দিতে হবে। তবেই আমরা মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি তৈরি এবং কল্যাণ বয়ে আনতে পারব।

যদি দেখি মানুষটা দাওয়াত গ্রহণ করছে না কিংবা এমন অবস্থায় আছে—দাওয়াত গ্রহণ করতে পারছে না, তবে তাকে সময় দেওয়া উচিত। ভেবে দেখার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তার ক্ষেত্রে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে পারি। সম্বোধন করবেন অন্যকে অথচ উদ্দেশ্য করবেন তাকে। উদারহণস্বরূপ; তার কিছু ভালো দিক তুলে ধরে প্রশংসা করলেন এবং এই ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে বললেন। আবার কিছু খারাপ দিক তুলে ধরে নিন্দা করলেন এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে বললেন। কিংবা শিক্ষা ও দীক্ষা আছে এমন অন্য একটা রীতি গ্রহণ করলেন। একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে—যাকে দাওয়াত দিতে যাবেন, কিছুতেই যেন তার মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক দিক নিয়ে অজ্ঞতা না থাকে।

রাসূল ﷺ রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অনুসারীদেরও রহমতরূপে আবির্ভূত হওয়া উচিত। রহমতরূপে আবির্ভূত হওয়ার অর্থ হলো মানুষের পরিস্থিতি ও অবস্থা মূল্যায়ন করে, প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে তাকে আল্লাহর দিকে ডাকা।

বিচ্ছিন্ন হয়ো না

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় শয়তানের প্ররোচনায়

আবি সা'লাবা আল খুশানি ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ যখন কোনো স্থানে গিয়ে নামতেন, লোকেরা উপত্যকায় ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে যেত। রাসূল ﷺ বলেন, "উপত্যকায় বিভিন্ন দলে তোমাদের এই বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা শয়তানের প্ররোচনা।" এর পরে যখনই কোনো স্থানে রাসূল ﷺ যাত্রাবিরতি করেছেন, একে অপরের সাথে মিলে বসেছেন। এমনকী তাদের ব্যাপারে এই কথা বলা হতো, যদি কোনো চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনায়াসেই তা তাদের ঢেকে নেবে।' সুনানে আবু দাউদ : ২৬২৮

রাসূল ﷺ- এর এই শিক্ষার রীতি ও পদ্ধতি একটা বার্তা দিয়ে যায়; বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ বার্তা। কিন্তু আমরা কি আদৌ এই বার্তা বুঝতে সক্ষম? এর মর্ম উপলব্ধি করার সক্ষমতা কি আমাদের আছে?

জাহেলি যুগে আরবরা ছিল সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও কলহপ্রিয় জাতি। তাদের অন্তঃকলহ ও মতভিন্নতা ছিল প্রবাদপ্রতিম; ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লেগেই থাকত। আর এই জাতির মাঝে ইসলাম আসে। ইসলামের সবচেয়ে বড়ো মূলনীতির একটা হলো—ঐক্য, সংঘবদ্ধতা ও নৈকট্য স্থাপন। ইসলাম তাদের দলগুলোকে এক করেছে, মতভিন্নতা দূর করেছে। রাসূল ﷺ ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান করেছেন। তিনি আরব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করেছেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে মদিনায় প্রকৃত বন্ধন ঘটান।

ইসলামের ভ্রাতৃত্ব

ভ্রাতৃত্ব হলো দ্বীনের সবচেয়ে শক্ত ও দৃঢ় বন্ধন। পৃথিবীর মাঝেও সবচেয়ে সুদৃঢ় বন্ধন হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'মুমিন নারী-পুরুষ সবাই একে অপরের বন্ধু, সহায়।' সূরা তাওবা : ৭১

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> ‘নিশ্চয় মুমিনরা একে অপরের ভাই ভাই।’ সূরা হুজুরাত : ১০

তারপর সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও আবু বকর ﵃, তার আগে রাসূল ﷺ, মুসলিম নারী-পুরুষ, দূরের ও কাছের, আরব ও আজম সবাই আল্লাহর জন্যই একে অপরের ভাই ভাই হয়ে যায়। সবাই এক জাতিতে পরিণত হয়। তাঁদের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তা দূর করে দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের কারণে একে অপরের ভাই ভাই হয়ে যাও।’ সূরা আলে ইমরান : ১০৩

রাসূল ﷺ মুসলিম উম্মাহকে এই মহান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তারপর সময় গড়িয়েছে। ইতিহাস অনেক দূর এগিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ বিজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছে। কুর্দিরা এসে এই মহান উম্মাহর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এই উম্মাহর ঝান্ডা উড্ডীন করেছে, আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছে। অনেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের বিস্তৃত ইতিহাসে তাঁদের সরব উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাঁরা সর্বদা প্রতিরক্ষা করে গেছে। মুসলিমদের মান-ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁদের মাঝ থেকে অনেক বড়ো বড়ো দুর্ধর্ষ বীর বেরিয়ে এসেছে।

আফ্রিকান বর্বর জনগোষ্ঠীও ইসলামে প্রবেশ করেছে। তারা ইসলামের ভাষা শিখেছে। দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছে। ইসলামের ইতিহাসে তাদেরও সমৃদ্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। তাদের গৌরবগাঁথা লেখা আছে প্রতিটি অধ্যায়ে। এভাবে ভারতীয়, সিন্ধি পারসিক এবং অন্যান্য জাতিও ইসলামের চিরকালের যাত্রায় এসে শামিল হয়েছে। এই দ্বীনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে।

এই ভ্রাতৃত্বের কিছু নীতি আছে। নামাজে সেই ভ্রাতৃত্ব পুনর্জীবিত হয়। মানুষ যতবারই নামাজে দাঁড়ায়, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা তাকে উজ্জীবিত করে। কারণ, সে মুসলিম ভাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়েই নামাজ আদায় করে, রুকু ও সিজদা করে এবং তার সাথেই নামাজে দাঁড়ায়। যতবারই কুরআন তিলাওয়াত করে, ভাবে—তার সাথে হাজারো মুসলিম একই সুরে তিলাওয়াত করছে। রমজানের রোজা ও ইফতারের সময় তার মাঝে এক অপূর্ব বোধের সৃষ্টি হয়। তার উপলব্ধি হয়, রমজানের রোজা সবার ওপর ফরজ। ইসলামের প্রধান এক স্তম্ভ। সমগ্র মুসলিম একযোগে আল্লাহর এই বিধান পালন করে। মুসলিম কাবা শরিফ তাওয়াফ করে। চারপাশের বিচিত্র বর্ণের মানুষ দেখে তার উপলব্ধি হয়, পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মুসলমানই এই ঘরের দিকে অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করে।

তিক্ত বাস্তবতা

কিন্তু বড়োই পরিতাপের বিষয়, আজকে মুসলিম সমাজের মাঝে জাহিলি চেতনা ঢুকে পড়েছে। অন্ধকার যুগের রীতি ও প্রবণতা মুসলিম মানসকে গ্রাস করেছে। মুসলমান আজ অন্ধ গোত্রপ্রীতি, বংশের মিছে অহংকার, আঞ্চলিকতা ও কৌলিন্য ও আভিজাত্য ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিশ্বায়ন নিয়ে মেতে আছে। বিশ্বায়ন পরাশক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী খেলার অংশ। তারা পৃথিবীর সব জাতিকেই একীভূত করতে চায়। সংবাদমাধ্যম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে এক ও অভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারই অংশ হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানির উদ্ভব ঘটেছে। যেমন : তেল কোম্পানি, কম্পিউটার, গাড়ি কোম্পানি, বড়ো বড়ো সংবাদ সংস্থা ইত্যাদি। এই কোম্পানিগুলোর মূল পুঁজি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। তারপরও তারা ভিনদেশি বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর সাথে জোট বাঁধে। এই জোটের পেছনে লুকিয়ে থাকে বিশাল লক্ষ্য; নানা চ্যালেঞ্জ ও অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির গোপন উদ্দেশ্য থাকে। বিভিন্ন দেশের স্বার্থে ও রাজনীতিতে তারা নাক গলায়, হস্তক্ষেপ করে। কোনো দেশ কিংবা রাজনৈতিক দল যদি তাদের স্বার্থপরিপন্থি নীতি গ্রহণ করে, তবে তাদের এক ঘরে করা হয়।

যেমন, আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা জানি। ইউরোপের অনেকগুলো দেশের ঐক্যবদ্ধ জোটই হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা একে অপরের সাথে জোট বেঁধেছে। ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলোর কথা বাদই দিলাম। জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো বড়ো বড়ো পরাশক্তিগুলোও একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে জোট বেঁধেছে। সেই জোটের সংবিধান, সনদ এবং নীতি-নির্ধারক হবে এক ও অভিন্ন। হয়তো ভবিষ্যতে তাদের সেনাবাহিনীও এক হবে। একই বিচারালয় হবে; যেন তাদের সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব ও স্থীতিশীলতা ঠিক থাকে। আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে। অন্যদের ওপর নিজের প্রভাব ও চাপ প্রয়োগের পরিসর থাকে।

এবার একটু মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকান। আল্লাহ তায়ালা প্রথম দিন থেকেই এই উম্মাহকে একই সূতোয় গেঁথে দিয়েছেন, যুথবদ্ধ ও সুসংহত করেছেন। ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এক অভিন্ন শরিয়াহ ও জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। রাসূল ﷺ-এর মতো নেতা দিয়েছেন। কী অবাক করা ব্যাপার! রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের কাছাকাছি থাকার কথা বলেছেন। উপত্যকায় যখন তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'এই উপত্যকায় তোমাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকাটা শয়তানের প্ররোচনা।' তারপর তাঁরা এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। একে অপরের কাছাকাছি থাকতে শুরু করে। একত্রিত হওয়ার অর্থ কিছুতেই একটা দলে পরিণত হওয়া নয়। যৌথ ব্যাপারগুলোতে এটাই মূল কথা নয়। কিন্তু যখন তাঁরা ঘুমোতে যাবে বা ছায়ায় আশ্রয় নেবে কিংবা অন্য কাজে মনোযোগ দেবে, কিছুতেই যেন একে অপরের থেকে দূরে সরে না যায়; একে অপরের কাছে ও পাশে থাকবে। এতে করে অন্যের থেকে দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকলে যে আলস্য ও কুমন্ত্রণা তৈরি হয়–তা থেকে দূরে থাকা যাবে। এ ছাড়াও তখন রাসূল ﷺ-এর আধ্যাত্মিক ও ঈমানি আলোচনা থেকেও দূরে থাকা হয়। নিজেদের মাঝেও আত্মিক বন্ধন দৃঢ় হয় না।

নিপীড়িত ব্যক্তির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের কিছু দাবি রয়েছে। সে ভ্রাতৃত্ব নিপীড়িত মুসলিমের পাশে দাঁড়াতে প্রণোদনা দেয়। বর্তমানে মুসলিম-বিশ্ব শতধা বিভক্ত। প্রতিটি মুসলিম দেশই নানা সমস্যায় জর্জরিত। অত্যাচার-নিপীড়ন ও জেল-জুলুমের শিকার। এর মূল কারণ, তাদের বিভক্তি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ত মনোভাব। অন্যান্য জাতিগুলো অগ্রগতি ও উন্নতির পথে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও আমরা এখনও ঘুমের রাজ্যের বাসিন্দা।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে আলস্য, উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা ছেয়ে আছে। তাদের সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে, পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে, অন্যরা এসে তাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। কিন্তু তারা এখনও বেহুঁশ। নাকের ডগায় চলছে এসব নৈরাজ্য অথচ কারও কোনো বিকার নেই। বৈশ্বিক সিদ্ধান্তগুলো তো বটেই মুসলিম-বিশ্বসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলোতেই মুসলমানদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশগুলো মুসলিম বিশ্বে নিজেদের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় কিন্তু কাজ করে ইজরাইলের স্বার্থে। হানাদার ইহুদি জাতির স্বার্থই তারা রক্ষা করে। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড গিলে খাওয়া শকুনরাই তাদের দোসর। এই অবৈধ রাষ্ট্রের পক্ষেই তারা ভোট দেয়। তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গোপনে ও প্রকাশ্যে সাহায্য করে। নির্বাচিত বিশ্ব মোড়লরা এই অবৈধ ভূখণ্ডের নিরাপত্তা বিধানে আদাজল খেয়ে নেমেছে।

অথচ তেলের মতো খনিজ সম্পদ এবং বিশাল জনগোষ্ঠীসমৃদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তেমন কোনো গুরুত্বই পায় না; বরং অবহেলার শিকার হয়। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মুসলিম-বিশ্বের এই অবহেলার মূল কারণ হলো, নিজেদের বিভক্তি ও কোন্দল। এই বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি শুধুই কয়েকটা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শুধুই রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও স্বার্থের জন্যই নয়; বরং একই দেশের অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা চরম আকার ধারণ করেছে। একই দেশের মধ্যে আবার আঞ্চলিক বিভক্তিও আছে।

মুসলমানরা অঞ্চলভেদে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক শহর অন্য শহরের মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখে, তাচ্ছিল্য করে। মুসলমানদের মন ও মগজে, অস্থিমজ্জায় আঞ্চলিকতা ও কৌলিন্য প্রথা ঝেঁকে বসেছে। আভিজাত্য ও বনেদি ভাব হারিয়ে গেছে। এতেই শেষ নয়; আরও আছে। এই বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার শেকড় আরও গভীরে, আরও বিস্তৃত। একই গোত্র, একই পাড়া, এমনকী একই পরিবারেও বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি আছে। আমার জীবনে এমন ঘটনাও দেখেছি, কিছু মানুষ এক মসজিদে নামাজ পড়ে না। কারণ, ওই মসজিদে গেলে তাদের বিরোধীদের সাথে দেখা হয়ে যাবে! ঈদের দিনও তারা একসঙ্গে মিলিত হয় না। অথচ ঈদ হলো ঐক্য ও মিলনের দিন, খুশি ও আনন্দের উপলক্ষ্য।

পশ্চিমা বিশ্বে অনেক মুসলমানই ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোজা রাখে। একই দেশে দুই রীতি; বরং একই মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। কেউ রোজা রাখছে তো কেউ রোজা ভেঙে ইফতার করছে।

কারণ, এক ব্যক্তি নিজের মাতৃভূমি অনুসারে রোজা রাখছে, আর অন্য ব্যক্তি তার অবস্থান করা দেশ অনুসরণ করে রোজা রাখছে! কিংবা কেউ কেউ মাস পূর্ণ করে রোজা রাখছে। তাই এই ভিন্নতা চোখে পড়ে। ঈদ এলে দেখা যায় কেউ রোজা রাখছে, আবার কেউ ঈদ উদ্‌যাপন করছে!

হায়! আমরা কতদিন এই মতভিন্নতা নিয়ে হানাহানি করব? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসবের প্রতি আমাদের একটা বিরক্তিভাব জাগা উচিত ছিল। নিস্পৃহভাব চলে আসার কথা। তা তো হয়নিই; বরং পূর্বের তুলনায় তাতে দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, নানা কিছু দিয়ে ইন্ধন জোগাচ্ছি। বিভক্তির বাড়ানোর নিত্যনতুন ইস্যু তৈরি করছি, অজুহাত দাঁড় করাচ্ছি। কবি অনেক সুন্দর করেই বলেছেন—

> 'আমি সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মের সন্ধান করেছি; পূর্ব-পশ্চিমে অনেক হেঁটেছি। ইসলামই সবচেয়ে প্রীতি ও ভালোবাসার কথা বলে, অথচ মুসলমানরাই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন।'

অন্য এক কবি বলেছেন—

> 'মুসলমানরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে আছে। প্রত্যেক গোত্রেই একেকজন "আমিরুল মুমিনিনের" দেখা মেলে, তাদের স্ব-স্ব সিংহাসন আছে।'

মতভিন্নতার কারণ

মতভিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর একটা প্রধান কারণ হলো ঘরানাপ্রীতি। হাদিসে আছে—

> 'আমার উম্মাতের মাঝে জাহিলি যুগের চারটা রীতি থেকে যাবে, তা কখনোই বিলোপ হবে না। বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশ নিয়ে কটূক্তি করা, তারার কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও বিলাপ করা।' সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

অনেক ধর্মপরায়ণ মুসলমান আছে যারা অনেক রক্ষণশীল, মুক্ত ও স্বাধীন। কিন্তু তারা গোত্রপ্রীতি, আঞ্চলিকতা ও জাত্যাভিমানের কাছে পরাধীন। কোনো কাজে কিংবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়ার সময় যোগ্যতার চেয়ে নিজের আত্মীয়, আপন ঘরানা এবং বলয়ের মানুষকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারা অযোগ্য হলেও চোখ বন্ধ করে তাদের নেওয়া হয়। অথচ আমরা বিভিন্ন আলোচনায়, মিম্বরে সমানতালে এসব আঞ্চলিকতা, ঘরানাপ্রীতি ও বলয়কেন্দ্রিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বেশ জোর গলায় বলে থাকি। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যখন নিজেরা কোনো কিছু করতে যাই, তখন কেবল নিজের দল ও মতের মানুষদের প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অন্যদের সহ্যই করতে পারি না। তাদের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো অভিযোগ করি।

এমন চিন্তা ও বোধ আমাদের কার্যক্রমে, চিন্তায় ও প্রতিক্রিয়ায় গেড়ে বসেছে। এমনকী আমাদের ভালো কাজগুলোও নিজস্ব ঘরানাতে আবদ্ধ। মুসলিম তরুণসমাজ যারা মানুষকে ঈমান, ঐক্য, কল্যাণ ও সর্বোপরি আল্লাহর দিকে ডাকবে, তারাই এই ঘরানাপ্রীতির শিকার। এভাবে বিভক্তি সৃষ্টি হয়, বিচ্ছিন্নতা আসে। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট একটা ঘরানার সঙ্গে তার সম্পর্ক দৃঢ় হতে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শাইখের দ্বারা প্রভাবিত হয় কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সিলসিলাকেই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি মনে করে। অথচ পূর্ববর্তী ইমাম ও বরেণ্য আলিমদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করতেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্য ছিল।

একবার ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম ইউনুস সাদফির মাঝে একটা ব্যাপারে তর্ক হয়। তর্ক শেষে যখন তাঁরা উঠে দাঁড়ায়, ইউনুস সাদফি বললেন—'আমি ইমাম শাফেয়ির চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি।' তারপর তিনি ইমাম শাফেয়ির হাত ধরে নিজের বুকের সাথে মেলালেন। এবার ইমাম শাফেয়ি বলেন—'আচ্ছা ইউনুস, আমরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার কারণে হয়তো কোনো মাসআলায় একমত হতে পারি না, তারপরও কি আমরা একে অপরের উত্তম ভাই হতে পারি না?'

এই ছিল ইমামদের মাঝে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নমুনা। আমরা এই মহান ইমামের কথার তাৎপর্য ও গভীরতা কখন উপলব্ধি করতে পারব? কখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ ভুলে ঐক্য ও শান্তির পথে হাঁটব? আমাদের ঐক্য নিহিত আছে কুরআনের শিক্ষায়, ঈমানের পথে, রাসূলের সুন্নাহতে এবং সর্বোপরি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। এই নববি ছায়াই আমাদের আশ্রয় ও সুরক্ষা দেবে। ইসলামের বিধানই আমাদের খোদার পথের সন্ধান দেবে।

কখন আমরা ঐক্যের বোধের প্রতি জোর দেবো? বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির পথ থেকে বেরিয়ে আসব? মতভিন্নতা ত্যাগ করে এক হওয়ার তাগাদা অনুভব করব?

মানুষের মাঝে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার কাজ করে। যখন তার সামনে কোনো একটা ব্যাপার বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য ব্যাপারগুলো চাপা পড়ে। কোনো মানুষ যদি নিজের চোখের সামনে একটা গ্লাস ধরে রাখে, তার পক্ষে কিছুতেই বিশাল পৃথিবী দেখা সম্ভব নয়। অথচ গ্লাস সরালেই দেখতে পাবে, তার সামনেই বিশাল পৃথিবী!

আমাদের উচিত পারিবারিক পরিমণ্ডলে, দাওয়াতে, ময়দানে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐক্য ও সংহতির ওপর জোর দেওয়া। মুসলিম-ঐক্যকেই বড়ো করে দেখা। মতভিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি করে এমন ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যাওয়া। মতভিন্নতা কিছুতেই যেন আমাদের শাশ্বত ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করে দিতে না পারে।

সবচেয়ে জনবহুল শহর রোম (ইস্তাম্বুল)[২]

দূরদৃষ্টি

এক বৈঠকে মুসতাউরিদ ইবনে শাদ্দাদ ﷺ বলেন—

> ‘আমি আল্লাহর রাসূল-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রোম হবে সবচেয়ে জনবহুল জনপদ।” ওই বৈঠকে আমর ইবনুল আস ﷺও ছিলেন। তিনি মুসতাউরিদকে লক্ষ্য করে বললেন—“কী বলছ, ভেবেচিন্তে বলো। তুমি কি সত্যি রাসূল ﷺ-কে এমন বলতে শুনেছ?” তিনি বলেন—“আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। রাসূল সত্যিই বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় রোম হবে সবচেয়ে জনবহুল শহর।” আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন—“যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহলে রোমের মানুষের মাঝে চারটা গুণ আছে—যা তাদের কিয়ামতের সময় সবচেয়ে সংখ্যাধিক্য হবে। তা হলো, তারা বিপদের সময় সবচেয়ে বেশি অবিচল ও সহনশীল। বিপদ চলে যাওয়ার পরে খুব দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায়। যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার পর দ্রুতই আঘাত হানে। অসহায় মানুষ এবং ইয়াতিমদের অতি সদয় ও দয়াবান। পঞ্চম গুণ হলো তারা রাজা-বাদশার নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত।”’ সহিহ মুসলিম : ২৮৯৮

আমি যখন প্রথম এই হাদিস পড়ি, তখন অবাক হয়ে যাই। রোমের মানুষের ব্যাপারে আমর ইবনুল আসের এমন বর্ণনা আমাকে যুগপৎ অভিভূত ও বিস্মিত করে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ আমাকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। সাথে সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বড়ো বড়ো গবেষণাগারের কথা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আজকাল বিভিন্ন জাতির মানসিকতা, প্রবণতা ও ঝোঁক, জীবন-পদ্ধতি এবং বিশেষ বিশেষ গুণাবলি ইত্যাদি নিয়ে বেশ গবেষণা হয়। পরে আমি ঘেঁটে দেখলাম, আমর ইবনুল আস সত্য কথাই বলেছেন। একেবারে বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেছেন। রোমের অধিবাসীদের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। একবাক্যেই তাদের সাধারণ গুণাবলিগুলো তুলে এনেছেন। সত্যি সত্যি বর্তমানের রোমের অধিবাসীরা ইউরোপ, আমেরিকায় অনেক বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত।

---

[২]. কুরআন ও হাদিস বর্ণিত রোম দ্বারা তৎকালীন কনস্ট্যান্টিনোপল উদ্দেশ্য, যার বর্তমান হলো ইস্তাম্বুল—অনুবাদক।

সংখ্যাধিক্য সাহসিকতা বাড়ায়

‘কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় রোমের অধিবাসীরা সংখ্যাধিক্যে অধিক হবে।’ এই কথাটা নবিজি বলেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাদিসে উল্লিখিত আধিক্য দ্বারা শুধুই যে সংখ্যা বোঝানো হয়েছে তা নয়; বরং শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

মুসলিম উম্মাহ শক্তিমত্তা, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গে এগিয়ে। কিন্তু রোমের অধিবাসীর মতো অন্য জাতিগুলোর মাঝে সংখ্যাধিক্য থাকবে। রাসূল ﷺ-এর এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার সময় রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। সাথে সাথে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও থাকবে। তাদের সিদ্ধান্তে, পদক্ষেপে এবং প্রণীত আইন ও রীতিতে স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকবে।

অধিকারের নিরাপত্তাই স্থায়িত্ব আনে

আমর ইবনুল আসের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে তিনি রাসূলের এই বক্তব্যের মূল কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। কিয়ামতের সময় রোমের অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার পেছনে মূল কারণগুলো ধরতে পেরেছিলেন। বাস্তবেই এই গুণাবলিগুলো তাদের মাঝে পাওয়া যায়—যা আল্লাহর রাসূলের কথার সত্যতা বহন করে। নবিজির কোনো কথাই অর্থহীন প্রলাপ নয়; বরং কুদরতের সমস্ত ব্যাপারগুলো দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে; প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থি হয় না। ন্যায়পরায়ণতা, সঠিক বিচার, সত্যতা ও জ্ঞান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যাদের মাঝে থাকে, তারা সফলতা ও বিজয়ের দেখা পায়। তাই এই ব্যাপারগুলো সবার কাছে থাকা চাই। মুসলমানরা এই গুণগুলো লালন করে বলেই তারা সফল ও বিজয়ী। নানা যোগ্যতা ও পারঙ্গমতা তাদের পদচুম্বন করে। যাদের মাঝে এই গুণগুলো থাকে না, তারা ব্যর্থ ও পরাজিত হয়, অনেক ভালো ও কল্যাণকর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর লিখিত বই *কায়েদা ফিল হাসবাহ* বলেছেন—

> ‘একটা ব্যাপারে মানুষের মাঝে কোনো প্রকার ভিন্নমত নেই যে, অত্যাচার ও শোষণের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ। আর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের প্রতিদান হবে সম্মানজনক। তাই বলা হয়, ন্যায়রায়ণ রাষ্ট্র কাফিরদের হলেও আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু মুমিন রাষ্ট্র যদি অন্যায়-অবিচার করে, তাহলে মহান আল্লাহ কখনোই সাহায্য করবেন না।’

সুতরাং খোদায়ি নিয়ম কাফির-মুমিন নির্বিশেষে সবার ওপরই প্রযোজ্য।

খোদায়ি এই বিধান রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর জন্য বেঁধে দেওয়া প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই আল্লাহ সবকিছুর ফয়সালা করবেন। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমার রহমত তার দিকে এক হাত এগিয়ে যায়। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমার রহমত তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যায়।’ সহিহ বুখারি : ৭৪০৫

এই হাদিস আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথের সন্ধান দেয়। আর সেই পথ হলো—আল্লাহর আনুগত্য, গুনাহ থেকে তওবা করা। যে ব্যক্তি তওবা করে, সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা দ্রুতই তার তওবা কবুল করেন। বান্দাকে নতুন পথে চলতে সাহায্য করেন। খারাপ ও মন্দ কাজকে, অপরাধ ও পাপকে সওয়াবে বদলে দেন।

জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা

উপরিউক্ত হাদিসটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ ও পন্থা বাতলে দেয়। এ ছাড়াও অন্য উপায়েও আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছানো যায়, তা হলো—শক্তিমত্তা অর্জন করা। কারণ, মুসলমানদের শক্তির দরকার। শক্তি অর্জন বলতে মূলত বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জন করা। প্রযুক্তি, বিভিন্ন শিল্পকর্ম ও জ্ঞানের জগৎ, এ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা অর্জন করা। মহান আল্লাহ এই কাজগুলোতে সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি এই কাজে সাহায্যে করে, আল্লাহ তাকে তাওফিক দেন। এগুলো বান্দার ওপর আল্লাহর সাহায্য।

সত্যিকার মুমিন বান্দা যদি খোদাপ্রদত্ত প্রকৃতির প্রচলিত এই নিয়মগুলো মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ তার একদিনের পরিশ্রমে ওই পরিমাণ বরকত দেবেন—যা অন্যদের এক মাসের পরিশ্রমে দেন। কিন্তু তার মাঝে দৃঢ় মনোবল ও সততা থাকতে হবে। সঠিক পথে থাকতে হবে, যে পথ তাকে আপন গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। শুধুই বড়ো বড়ো স্বপ্ন, কল্পনা ও পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। কোনো প্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই কোনো কিছু অর্জিত হয় না। চাওয়ামাত্রই স্বর্ণের থালাতে খাবার উপস্থিত হয় না!

আমর ইবনুল আস ﵁ রাসূল ﷺ-এর বাণী ব্যাখ্যা করেন। রোমানদের গুণাবলি তুলে ধরেন। নবিজির কথার যৌক্তিকতা ও অর্থবহতা তুলে ধরেন। তাদের সংখ্যাধিক্যের পেছনের কারণগুলো বর্ণনা করেন। চারটা বৈশিষ্ট্য এবং পাঁচটি গুণের কথা বলেন। এগুলোর ওপর ভর করেই তারা সংখ্যায় অধিক হবে। এই গুণগুলোর কারণেই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আসবে। এই কথাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘নিশ্চয় আপনার প্রভু বান্দাদের ওপর অত্যাচারী নয়।’ সূরা ফুসসিলাত : ৪৬

গুণাবলির বিশ্লেষণ

প্রথম : বিপদে অবিচলতা ও সহনশীলতা

বিপদে পড়লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে যায়, দিশাহীন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আবেগঘন মুহূর্তে সুস্থিরতা হারিয়ে ফেলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে না। ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কোনো কিছুকে সুস্থতা ও সুস্থির মন নিয়ে পরখ করতে পারে না। সিদ্ধান্ত ও চিন্তায় সবকিছুই গুলিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে ও বাস্তবতার ময়দানে অস্থিরতা কাটানো যায় না। সুস্থিরচিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

এগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমর ইবনুল আস রোমানদের ব্যাপারে বলেছেন, 'বিপদের সময় তারা অনেক বেশি অবিচল ও সহনশীল থাকে।' যখনই কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে, তারা পাহাড়সম ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতা নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই বর্ণনার মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন আভাস আছে, তা হলো—মুসলমানদের এই গুণ অর্জনে আগ্রহী করে তোলা। কারণ, এই গুণটা প্রশংসনীয় ও উত্তম বৈশিষ্ট্য। আর মুসলমানদের সর্বদা উত্তম গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে; এমনকী শত্রুদের কাছে পেলেও এমন গুণ অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় : বিপদের পরে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ানো

বিপদ নানা প্রকার হতে পারে। ব্যক্তিগত বিপদ যেমন থাকে, তেমনি সমষ্টিগত বিপদও। এখানে ব্যক্তিগত বিপদ উদ্দেশ্য নয়; বরং সমষ্টিগত বিপদের কথাই বলা হয়েছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির স্ত্রী বা সন্তানের মৃত্যুও বিপদ বটে। কিন্তু এখানে সমগ্র জাতির ওপর ঘনিয়ে আসা বিপদকে বোঝানো হয়েছে। এখানে জাতির ওপর নেমে আসা বিপদের পরে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতই এমনটা দেখা যায়। রোমের অধিবাসীরা তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে প্রবল ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। যুদ্ধ তাদের শেষ অবলম্বনটুকু কেড়ে নিলেও তারা দমে যায় না। শূন্য থেকে উঠে দাঁড়ায়, দ্রুতই চৈতন্য ফিরে পায়।

হয়তো এক্ষেত্রে রোমানদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিক নিয়মনীতি তাদের সাহায্য করে। কারণ, রাজনীতিতে যদি নিয়ম থাকে, চিন্তা ও সুষ্ঠু বিচারের পরিসর থাকে, ভুল সহজেই ধরা পড়ে। তারা জেদ করে ভুল আঁকড়ে ধরে থাকে না। সহজেই ভুল থেকে বেরিয়ে আসে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই দ্রুতই তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

হয়তো তাদের এই নির্বাচন ও সিদ্ধান্তগুলো অনেক বেশি নির্ভুল ও নিপুণ হয়। এই ব্যাপারগুলো আমর ইবনুল আসের সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

তৃতীয় : অসহায়, দুর্বল ও ইয়াতিমদের প্রতি সহমর্মিতা

মানবতার এই বোধ ও চিন্তা নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব। রাসূল ﷺ এ ধরায় দয়া ও ভালোবাসা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই দয়ার একটা অংশ হলো—অসহায়দের প্রতি সহায় হওয়া। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমি দুই প্রকার দুর্বলের অধিকার চাপিয়ে দিচ্ছি; ইয়াতিম ও স্ত্রীর অধিকার।' ইবনে মাজাহ : ৩৬৭৮

রাসূল সারা জীবন অসহায়, ইয়াতিম, বিধবাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তাদের প্রয়োজনে পাশে থেকেছেন। কোনো প্রকার গড়িমসি করেননি। বাস্তব জীবনে অসহায়দের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন দয়া ও ভালোবাসার জীবন্ত নমুনা। রাসূল ﷺ-এর খোদায়ি শরিয়াহ মানবতার এই বোধ ও চিন্তাকে ধারণ করেছে।

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'যখন হাবশার মুহাজিররা রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে এলো, তখন রাসূল ﷺ তাদের বললেন—"আচ্ছা, হাবশা দেশের কোনো জিনিসটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে?" তাদের একজন বলল—"একদিন আমরা বসে ছিলাম। এমন সময় মাথায় পানির মটকা নিয়ে এক বৃদ্ধাকে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম। পথিমধ্যে বৃদ্ধা এক তরুণের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল, এমন সময় তরুণটা বৃদ্ধার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিলো। সাথে সাথে বৃদ্ধার মশকটা ভেঙে গেল। তারপর বৃদ্ধা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যুবকটাকে বলল—হে প্রতারক! আল্লাহ যখন সিংহাসন পেতে বসবেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন এবং হাত-পা আপন পাপ সম্পর্কে কথা বলে উঠবে, তখন জানতে পারবে, আমার ও তোমার অবস্থা কেমন হবে।" রাসূল ﷺ বললেন, "মহিলাটা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। আল্লাহ কী করে এমন জাতিকে ছেড়ে দেবে, যারা তাদের শক্তিশালীদের থেকে দুর্বলদের অধিকার কেড়ে নেয়?"' সুনানে বায়হাকি : ১১২৩২

রাসূল ﷺ বুঝিয়েছেন সে সমাজে অসহায়, দুর্বল ও দরিদ্ররা নির্ভয়ে অবাধে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে, সেই সমাজ টিকে থাকে; কালের গর্ভে হারিয়ে যায় না। কারণ, তা মানবিকতাকে তুলে ধরে। মানবতাকে লালন করে। সেই দিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'নুহ বলল, "হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে কোনো কাফির অধিবাসী রাখবেন না।"' সূরা বনি ইসরাইল : ৭০

যে সমাজ মানবতাকে আঁকড়ে ধরে, মানুষ তাতে শান্তি পায়, স্বস্তি পায়। এমন সমাজ দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। সুষ্ঠ সমাজের নিরাপদ ছায়ায় বেড়ে ওঠে।

চতুর্থ : পলায়নের পর তীব্রভাবে আক্রমণ

তারা যদি আক্রমণের শিকার হয়, তবে ভেঙে পড়ে না; সাথে সাথেই নিজেদের শক্তিমত্তা ফিরে পায় এবং আবারও শত্রুর ওপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়।

পঞ্চম : উত্তম গুণ, শাসকের উৎপীড়ন থেকে সুরক্ষিত

তারা কখনো কোনো শাসকের নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়নি; বরং সুরক্ষিত ছিল। এই সুরক্ষা শুধুই ব্যক্তিগত ছিল না; বরং সমষ্টিগত। বলা হয়ে থাকে, আরবরা এমনই ছিল—সুরক্ষিত ও মুক্ত। অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত, নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে। কিন্তু এখানে সুরক্ষার পেছনে মূল কারণ—তাদের ঐক্য ও সংহতি। তাদের কাজ, প্রতিষ্ঠান ও অভিযান ইত্যাদি কাজগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাহায্য থাকে। এই সংঘবদ্ধ কাজগুলো তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে দূরে রাখে। তাদের নিজস্ব নিয়ম ও আইন আছে, যা তাদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখে। অত্যাচার ও উৎপীড়ন মুক্ত রাখে।

আমর ইবনুল আস নিজের দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই গুণগুলো দেখেছিলেন। তাই তিনি সাথে সাথে রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের মর্ম বুঝে ফেলেন। নবিজি বলেছেন—

> ‘কিয়ামতের সময় রোমের অধিবাসীরা সংখ্যায় অধিক হবে।’

শেষকথা : মুসলমানদের উচিত রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করা এবং জীবনে তা ধারণ করার চেষ্টা করা। সেইসঙ্গে মহান সাহাবা আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-এর দূরদৃষ্টি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো। মানুষের সাথে উপরিউক্ত গুণাবলির সাথে আচরণ করা।

দায়ি নবি

দাওয়াতি ব্যস্ততা

রাসূল ﷺ কুরাইশের নেতাদের দাওয়াত দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিল উতবা ইবনে রাবিয়া, তার ভাই শাইবা, নজর ইবনুল হারিস প্রমুখ। এই মানুষগুলোর ঈমান আনার প্রতি রাসূল ﷺ-এর মধ্যে একটা ব্যগ্রতা ছিল। তারা আসমানি ডাকে সাড়া দিক—এই ছিল নবিজির আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এমন সময় তাঁর কাছে এক অন্ধ সাহাবি এলেন; আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه। তিনি জানতেন না রাসূল ﷺ দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত। তিনি ঢুকেই বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার থেকে আমাকে কিছু শেখান।' রাসূল ﷺ একটু বিরক্ত হলেন, কিছুটা রুষ্ট হলেন। কারণ, তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, এই ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

রাসূল ﷺ মক্কায় তীব্র বিরোধিতা এবং ঘোরতর দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতেন। চারপাশেই শত্রুরা ওত পেতে থাকত। চারদিক থেকেই একের পর এক বাক্যবাণ ছোড়া হতো। সে সময় রাসূল ﷺ-এর অনুসারী ছিল খুবই কম; হাতেগোনা কয়েকজন। রাসূল ﷺ বিষণ্ন মন নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই আসমান থেকে জিবরাইল عليه السلام নেমে আসেন। নবিজিকে সান্ত্বনা দেন। সংকট থেকে মুক্তি ও বিপদে সাহায্যের আশ্বাস দেন। ব্যথিত মন নিয়ে নবিজি বসে থাকেন। আপন জাতি ও গোত্রের লোকের আচরণে সীমাহীন কষ্ট পেয়েছেন। বুকভরা ব্যথা ও কষ্ট নিয়ে নীরব হয়ে পড়েন। এমন সময় কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়—

> 'তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এলো। আপনি কীভাবে জানবেন যে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, আর উপদেশ তাঁর কাজে আসত।' সূরা আবসা : ১-৪

খোদায়ি সতর্ক

রাসূল ﷺ-কে এই কাজের জন্য সতর্ক করা হয়। সঠিক নির্দেশনা ও পথনির্দেশ করা হয়। অথচ ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয়। সর্বোচ্চ হয়তো বলা যায়, তিনি উত্তম কাজকে এড়িয়ে গেছেন। অপেক্ষকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি চিন্তা করে মনে করেছেন, তাতে ইসলামের দাওয়াতের জন্য কল্যাণ আছে। কিন্তু এই কারণে তাঁকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা জানেন, এই লোকগুলো কিছুতেই ঈমান আনবে না। তাই এদের পেছনে সময় অপচয় করার কোনো সার্থকতা নেই। যেমন : আল্লাহ তায়ালা নুহ عليه السلام-কে বলেছেন—

> ‘তোমার জাতির যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত কেউ ঈমান আনবে না।’ সূরা হুদ : ৩৬

রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। তিনি যাদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তারা কখনোই ঈমান আনবে না। আল্লাহ তায়ালা এর পরে এক আয়াতে বলেন—

> ‘না, কখনোই না। তিনি তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সে পূরণ করেনি।’

এই আয়াতের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। এই লোকগুলো অহংকারী, দাম্ভিক ও উদ্ধত। এরা কিছুতেই ঈমান আনবে না; তারা কুফুরি নিয়েই মৃত্যুবরণ করবে।

উপরিউক্ত আয়াগুলোতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে এক দুর্বল ব্যক্তির ব্যাপারে সতর্ক করেন।

পরোক্ষ সম্বোধন

আয়াতগুলোতে সম্বোধন হয়েছে প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে। নামপুরুষ দিয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি বলেননি, ‘তুমি ভ্রু কুঞ্চিত করেছ এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ’ বরং বলেছেন, ‘সে ভ্রু কুঞ্চিত করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।’ এই ধরনের সম্বোধনে একধরনের এড়িয়ে যাওয়া ভাব আছে–যা মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه-এর সাথে নবিজি করেছেন। কারণ, তিনি দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন। তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করেছেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এর পরেই বলেছেন—‘কারণ, তাঁর কাছে একজন অন্ধ লোক এলো।’ এই বাক্যের মধ্যে অন্ধ লোক বলে তাঁর অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি নবিজিকে দেখেননি। তাঁর ব্যস্ততা বুঝতে পাননি। এই ক্ষেত্রে তাঁর অক্ষমতা একেবারেই স্পষ্ট।

এই আয়াতের ফাঁকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে প্রচ্ছন্ন আভাস দেওয়া হয়েছে, তা হলো—ইসলামের কেউ আপন বৈষয়িক যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, খ্যাতি ও প্রভাব ইত্যাদির বিচারে আলাদা সম্মান ও মর্যাদা পায় না। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও পরিশুদ্ধ হৃদয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আপনি কি জানেন?

সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতে পারত।' অর্থাৎ আপনি যে লোকের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতে পারত। এ ছাড়াও বলা হয়েছে—'সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করত এবং এই উপদেশ তাঁকে উপকৃত করত।' এখানে দুটি ব্যাপার ফুটে উঠেছে—'হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো।' অর্থাৎ সে তোমার কথা শুনত। ঈমান, আনুগত্য ও হিদায়াতের কথা শুনে সে তাঁর মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং তা মেনে ভালো কাজ করত, গুনাহ ছেড়ে দিত এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে সরে আসত।

এ তো গেল আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁ সম্পর্কিত কথা। আর যেসব নেতাদের সাথে রাসূল ﷺ আলোচনা করছিলেন, তাদের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'আর যে ব্যক্তি কোনো প্রকার পরোয়া করে না, আপনি তার পিছু নিয়েছেন। অথচ সে যদি নিজে পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই।'

যে ব্যক্তির ঈমান আনার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা ছিল, সে ঈমানের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করল না।

সুতরাং আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে তার পেছনে সময় অপচয় করতে হবে কেন; বরং আপনার কাছে আসা লোকদের ব্যাপারে মনোযোগী হন। যে ব্যক্তি আপনার কাছে এসে হিদায়াতের কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব, তাকে গুরুত্ব দিন।

দরিদ্র ও অসহায়দের সাথে জোট

ইসলাম দুর্বল, অসহায় ও পীড়িতদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছে। কোনো প্রকার বৈষম্য ও বিভক্তি করেনি। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি ও মানদণ্ড হলো তাকওয়া, বৈষয়িক প্রাচুর্য নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।'

তাই ইসলামে বংশ ও আভিজাত্যের কোনো গুরুত্ব নেই। এমনকী রাসূল ﷺ-এর পরিবারভুক্তদের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমার বাপের পরিবার আমার মূল আত্মীয় ও পরিবার নয়; বরং আমার পরিবারভুক্ত হলেন আল্লাহ ও সাচ্চা ঈমানদারগণ।' সহিহ বুখারি : ৫৬৪৪

মহান লক্ষ্য

দাওয়াতের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আছে একটা গতিপথ। অযথা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ, ঝাগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং বাড়াবাড়ি করা কিছুতেই দাওয়াতের মূল কাজ নয়। আসমানি এই বার্তার মূল লক্ষ্য—মানুষের হৃদয় পরিশুদ্ধ, চরিত্র সুশোভিত, উন্নত আচার ও শিষ্টাচার শেখানো এবং মূল্যবোধ ধরে রাখতে উৎসাহিত করা। পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ

এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তোলায় ব্রত গ্রহণ করা। মানুষকে আপন জাতভাই মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া। তার স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা করা। এই দাওয়াতের মূল কাজই হলো—মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করানো। সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করে, সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে সবাইকে বিচার করা। আর এই রীতিতেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ডেকেছেন, একেবারে প্রথম মুহূর্ত থেকে—

> 'হে মানুষ! আমি তোমাদের একই নারী-পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।' সূরা হুজুরাত : **১৩**

মূল কথা হলো, হৃদয়ের পরিশুদ্ধি ও নিষ্কলুষতা, তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য। উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অনেক জাতিকে ওপরে তোলেন, আবার অনেক জাতিকে নিচে নামান।' সহিহ মুসলিম : **৮১৭**

যে ব্যক্তি এই কিতাব ও দ্বীন আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তাকে ওপরে তুলবেন। যে কুরআন থেকে দূরে থাকবে, সে অপদস্থ হবে; এমনকী সে উচ্চ বংশীয় প্রভাবশালী হলেও। কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা কাউকে সম্মানিত করে না। বংশমর্যাদা কাউকে ওপরে তোলে না। তেমনিভাবে অতীত ইতিহাসও কাউকে মর্যাদাশীল করে না; বরং কাজই মানুষকে এগিয়ে দেয়, প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রকাশ্য ও স্থায়ী সতর্ক

একটা ব্যাপার বেশ অবাক হওয়ার মতো। এই সতর্ক রাসূল ﷺ-কে করা হয়েছে প্রকাশ্যে; কানে কানে ফিসফিস করে নয়। রাসূল ﷺ ও বিষয়টি লুকাননি। এটি বরং সমস্ত মুমিনদের একত্রিত করেছে। সবাই দুর্বল ও অসহায় মুমিন, অল্পসংখ্যক মুমিন—তাদের সামনে তিনি খোদার বাণী পড়ে শোনালেন—'সে ভ্রু কুঞ্চিত করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' তারপর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁-কে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে সুস্বাগতম, যার কারণে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন।' সবার সামনে রাসূল ﷺ খোদায়ি বাণী তিলাওয়াত করলেন। মুমিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই তাঁর কথা শুনেছে!

এই আয়াতগুলোতে নবুয়তের মূল বার্তা ফুটে উঠেছে। রাসূল ﷺ নিজেকে নিজে সতর্ক করেননি; বরং সপ্তম আসমানের ওপর থেকে তাঁর প্রভু তাঁকে সতর্ক করেছেন। আর রাসূল ﷺ এই ব্যাপারটা চেপে যাননি; বরং তিনি প্রকাশ্যে সাহাবাদের এই কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁদের শিক্ষা দেন।

তিনি নামাজে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। ইসলামের শত্রুদের শুনিয়েছেন—যারা এমনিতেই রাসূল ﷺ-এর নিন্দা করার জন্য সর্বদা খুঁত খুঁজে বেড়ায়!

এই মহত্ত্বের পরে আর কোনো মহত্ত্ব থাকতে পারে না। এই গরিমা ও মর্যাদা কেবল রাসূল ﷺ-এর সাথে শোভা পায়। আপনার অভিভাবক হতে পারে পিতা কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কানে কানে বকাঝকা করে, আপনি কি তা প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে বলতে সাহস পাবেন? কখনো না। ছোটো ও হালকা তিরস্কারের ব্যাপারে যদি আপনার অবস্থা এমন হয়, তাহলে কড়া ও কঠোর তিরস্কারের ক্ষেত্রে কেমন অনুভূতি হবে? তা ছাড়া ওই তিরস্কার যদি এমন মানুষকে করা হয়—যার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই চারপাশের লোকজন বিষোদগার করে বেড়ায়, তাহলে কেমন হবে? অথচ নবিজি সেই তোয়াক্কা না করেই, নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে সবার সামনে অবলীলায় সেই আয়াত পাঠ করতে দ্বিধা করেনি।

দুনিয়ার রীতি ও মাপকাঠি এবং আসমানের মাপকাঠির মাঝে আকাশ-পাতাল ফারাক। রাসূল ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং মানুষ প্রতিনিয়তই তা শোনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘স্মরণ করুন! যখন আপনি যার ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আল্লাহও যার ওপর অনুগ্রহ করেছে—তাঁকে যখন আপনি বলেছেন, “তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখ, আল্লাহকে ভয় করো।” আর তুমি নিজের মাঝে যা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।’ সূরা আহজাব : ৩৭

একবার ভাবুন তো! আপনাকে যদি এমন কথা বলা হয়, আপনি যা লুকাচ্ছেন আল্লাহ তা ফাঁস করে দেবেন, তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে? অবধারিতভাবেই আপনি এটাকে অনেক বড়ো দোষ ও সমালোচনা মনে করবেন। এমনকী রেগেও যেতে পারেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ ছাড়াই তা গ্রহণ করেছেন এবং অবলীলায় সাহাবাদের কাছে তা তুলে ধরেছেন। নামাজে সেই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, ‘আপনি নিজের মাঝে এমন ব্যাপার রাখছেন—যা আল্লাহ তায়ালা ফাঁস করে দেবেন।’ তার পরের অংশ আরও ভয়াবহ। বলা হচ্ছে—‘আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করাই অধিক সংগত।’
এ ছাড়াও কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘কোনো নবির জন্য কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ শেষ করার আগে শত্রুকে বন্দি করা ঠিক নয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও, আর আল্লাহ আখিরাত চায়। আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও পরাক্রমশালী। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববিধান না থাকত, তাহলে তোমরা যা নিয়েছ, তার জন্য তোমাদের ওপর মহা শাস্তি নেমে আসত।’ সূরা আনফাল : ৬৭-৬৮

রাসূল ﷺ এই আয়াতগুলো পড়তেন এবং সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। সাথে সাথে এমন আয়াতও সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন—

> ‘নিশ্চয় আপনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী।’ সূরা ক্বলম : ৪
> ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কষ্ট ও অভিশাপ দেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।’ সূরা আহজাব : ৫৭

নবুয়তের প্রমাণ

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবেই নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ দেয়। রাসূল ﷺ বেফাঁস, ভিত্তিহীন কথা বলেন না। ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তা একমাত্র ওহি, যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ।’ সূরা নাজম : ৪

সাধারণত মানুষ কখনো নিজেকে তিরস্কার করে না। মানুষের সামনে বলা তো দূরের কথা, দুনিয়ার সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধও মানুষকে নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন করে না। ওহি বিবর্জিত মানুষের বিবেক কিছুতেই নিজের দোষ স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহিকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তা ওহি। আর যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে, সে সমালোচনা ও নিন্দা সহ্য করার প্রশিক্ষণ পায়। এমনকী প্রকাশ্যে দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে সমালোচনা ও নিন্দা করা হলেও মেনে নেয়। যারা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ-অনুকরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি করেন। আল্লাহর সামনে নত হওয়াকে শেখান এবং তারা বিশ্বাস করে—গোপনে ও প্রকাশ্যে সত্য ও পরিশুদ্ধ সমালোচনা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে ও বিকাশে প্রণোদনা জোগাবে। সব ধরনের নেতিবাচক গুণাবলি দূর করবে। আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন—

> ‘নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।’

দয়ার নবি

কপটতা ও মুনাফিকির তোড়জোর

মক্কায় দাওয়াতের সময় দুই ধরনের মানুষ ছিল, মুমিন ও কাফির। মাক্কি জীবন শেষে নবিজি মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তৃতীয় একটা দলের আবির্ভাব ঘটে, তারা হলো মুনাফিক; ওপরে তাকওয়া, খোদাভীতি ও ঈমানের ভান করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাক্কা মুনাফিক। গোপনে গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ পোষণ করে। এই দলের প্রধান ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। সেই ছিল মুনাফিকদের মূল হর্তাকর্তা।

একদিনের কথা। রাসূল ﷺ তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কাছে গিয়ে তাদের সালাম দিলেন। ইসলামের পথে আহ্বান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন—'শোনো হে লোক! তুমি যা বলো, আমি কিছুতেই তা ভালো মনে করব না; এমনকী সত্য হলেও।'

কী উন্নাসিকতা ও তাচ্ছিল্য ভরা ভাব! কী সংশয় ও নিন্দাপূর্ণ কথা! কী তার কথার ধার ও লাঞ্ছনাকর মনোভাব! তীক্ষ্ণ ও কঠোর স্বরে বলছে—'এখানে আমাদের একান্ত বৈঠক চলছে, জ্বালাতন করবে না! তুমি বরং নিজের তাঁবুতে ফিরে যাও। যে স্বপ্রণোদিত হয়ে তোমার কাছে আসবে, এসব কথা তাকে শোনাও, আমাদের নয়!' অথচ এই লোকটা ইসলামের সত্যতা ও অকাট্যতা বুঝতে পেরেছিল! কিন্তু ঘৃণাভরে ত্যাগ করেছে। কারণ, সে দীর্ঘদিন একটা স্বপ্ন লালন করেছে, মদিনায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে, নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। মদিনার জনগণও তাকে নেতৃত্বের আসনে বরণ করে নেওয়ার প্রতিক্ষায় ছিল। কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি! ইসলাম তার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। আর সেই ক্ষোভ ও হিংসায় তার বুক ফেঁটে যায়।

সামরিক ব্যর্থতা

রাসূল ﷺ সৈন্য নিয়ে উহুদের অভিমুখী হয়েছেন। অর্ধেকেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছেন। আর কিছু দূর এগোলেই উহুদ প্রান্তর। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বেঁকে বসে। ঘোষণা করে—কোনো যুদ্ধই হবে না। এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য সে নিয়ে মদিনায় ফিরে যায়।

তার গাদ্দারি ও প্রতারণা এখানেই শেষ নয়; আরও আছে। বনি মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় সে ঘোষণা দিলো, কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘আমরা মদিনায় ফিরে গেলে তার থেকে সম্মানিতরা (সে ও তার দল) নিকৃষ্টদের (রাসূল ও সাহাবারা) বের করে দেবে।’ সূরা মুনাফিকুন : ৮

শুধু এই নয়, সে নিজের গোত্র ও অনুসারীদের লক্ষ্য করে আরও বলেছে—

> ‘তোমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে যারা আছে—তাদের জন্য কিছুতেই ব্যয় করো না।’ সূরা মুনাফিকুন : ৭

অর্থাৎ এরা পোষ্য প্রাণী। একমাত্র দিনার-দিরহাম ও সম্পদের জন্যই তাঁরা এখানে এসেছে। তোমরা যদি তাঁদের ভাতা বন্ধ করে দাও, তবে তাঁরা চলে যাবে। এই ছিল তার ভাবনা!

সাহচর্যের কল্যাণ

তার এক সন্তান ছিল, আবদুল্লাহ। সে ছিল প্রকৃত সাচ্চা মুমিন। সে একদিন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে এলো। নবিজিকে লক্ষ্য করে বলল—

> ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি খবর পেয়েছি, আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চান। সত্যিই যদি তা করতে চান, আমাকে বলুন। আমি তার খণ্ডিত মাথা আপনার সামনে এনে রাখব। খোদার কসম! খাজরাজ গোত্রে আমাদের চেয়ে বেশি পিতৃভক্তি পোষণ করে—এমন কথা কারও জানা নেই। কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে ভয় হয়, আপনি যদি কোনো মুসলিমকে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন, আর সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তখন আমার জন্য আমার বাবার খুনিকে জমিনের ওপর হাঁটতে দেখা কষ্টকর হবে। একসময় রাগের মাথায় এক কাফিরের বদলা নিতে গিয়ে এক মুসলিমকে হত্যা করব। আর মুসলিমকে হত্যা করলে তো আমার ঠিকানা হবে জাহান্নাম! রাসূল ﷺ বললেন—বরং তার সাহচর্যকে মূল্যায়ন করব এবং সে আমাদের সাথে যতদিন থাকবে, তার সাথে কোমল আচরণ করব।’ সিরাত ইবনে হিশাম

মৃত্যুশয্যায়

সময় বয়ে চলে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জীবন শেষ হয়ে আসে। জীবনের চূড়ান্ত ক্ষণ ঘনিয়ে এলো, মৃত্যু দরজায় এসে করাগাত করছে। বাবার এই নিদারুণ কষ্ট ও দুর্দশা দেখে ছেলের স্থির থাকতে পারে না। সাথে সাথে এই বিশ্বাসী সন্তান রাসূলের কাছে ছুটে যায়। কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়—হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জামাটা আমাকে দিন। এটা দিয়ে আমি আমার বাবার কাফন দেবো। রাসূল ﷺ তাঁর জামা দিয়ে দেন।

তাকে যখন জানাজার মাঠে আনা হলো, তখন রাসূল ﷺ এগিয়ে গেলেন। নামাজ পড়ানোর জন্য ইমামের জায়াগায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় উমর رضي الله عنه ছুটে এলেন। শক্ত ও দৃঢ়চেতা উমর رضي الله عنه। রাসূল ﷺ-এর কাপড়ের বন্ধনি ধরে বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইবনে উবাইয়ের জানাজা পড়াচ্ছেন?' সে তো এমন এমন বলেছে! একের পর এক তার কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন—'উমর! সরে দাঁড়াও।' উমর رضي الله عنه যখন বারবার পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, রাসূল ﷺ বললেন—'আমাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আর আমি বেছে নিয়েছি। আমি যদি এ কথা জানতাম, দিনের সত্তরবারের চেয়ে বেশি ইসতেগফার পাঠ করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি তা-ই করতাম।'

এখানেই শেষ নয়; তার সাথে নবিজির বদান্যতা ও উদারতার আরও ঘটনা আছে। রাসূল ﷺ তার জানাজা পড়ালেন, কবরে নামলেন এবং নিজের দুই পায়ের ওপর তার লাশ রাখলেন। তাতে নিজের থুথু ছিটিয়ে দিলেন।

এই হলো নববি চরিত্র

কী বিস্ময়কর ব্যাপার! নবুয়তের কী মহত্ত্ব! নবিজি কার সাথে এমন উত্তম আচরণ করেছেন? এই ইতিহাস একটু ঘেঁটে দেখুন। তার জীবন কাহিনিতে একটু উঁকি দিয়ে আসুন। নিকষ কালো রাতের ঘোর অন্ধকারের মতোই তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়। উবাই বলেছে—'যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না।' আরও বলেছে—'আমি যদি মদিনায় ফিরে যাই, তাহলে তাঁর থেকে সম্মানিতরা নিকৃষ্টদের বের করে দেবে।' এখানেই শেষ নয়; সে আরও বলেছে—'সরো সরো! তোমার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।'

সে এর চেয়েও জঘন্য ও ভয়ানক কাজ করেছে। সে এবং কিছু কুচক্রিমহল মিলে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা رضي الله عنها-এর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রটনা রটিয়েছে। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রে অপবাদ ও কালিমা লেপন করেছে। অথচ তিনি রাসূল ﷺ-এর পবিত্র পরিবারের সদস্য। নববি শিক্ষার ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন। এই অপবাদ মদিনার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূলের পরিবার দীর্ঘ এক মাস তীব্র কষ্ট ও যাতনার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করেন। একসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসে। সূরা নুরের শুরুর কয়েকটা আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়িশা رضي الله عنها-এর সতীত্ব প্রমাণিত হয়। এই জঘন্য কাজ করেও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পার পেয়ে যায়। নবিজি তার প্রতি রুষ্ট হননি; বরং তাকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর বিশাল হৃদয় থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি মায়া উৎসারিত হয়। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস এর আগে বা পরে আর কখনো দেখেনি। কোনো রাজা-বাদশা, আলিম-বিদ্যান এমন অনুপম চরিত্র দেখাতে পারেনি; বরং প্রত্যেক মানুষই নিজের অবস্থান ও স্বার্থ ধরে রাখে। নবিজির এমন স্বতঃস্ফূর্ততা, সত্যতা ও মহত্ত্বের কোনো নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

রাসূল ﷺ এই মুনাফিক সর্দারের সবকিছুই ভুলে গেছেন। তার সাথে সর্বোচ্চ উত্তম আচরণ করেছেন। তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন, ইসতেগফার করেছেন, নিজের জামা পরিয়েছেন এবং নিজ হাতে কবরে শায়িত করেছেন।

এই অপার শক্তি দিয়েই নবিজি ﷺ সমগ্র উম্মাহকে এক করেছেন। ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের দরবারে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সারা জীবন যে লোক নেতৃত্বের জন্য রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ করে গেছে, তার সাথে এই ছিল নবিজির আচরণ। এই লোক গোপনে গোপনে আরও ষড়যন্ত্র করত, মিথ্যা অপবাদ দিত, রটনা রটাত এবং নিন্দা করত।

সে কখনোই মুসলমান ছিল না। এমনকী মৃত্যুশয্যাতেও তার মধ্যে ইসলামের কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে আসেন। তার হিদায়াতের প্রতি নবিজির ব্যাকুলতা ছিল। তিনি কখনোই নিরাশ হননি, উৎসাহ হারাননি। মৃত্যুশয্যায় নবিজি তাকে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে ইহুদিদের সাথে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছিলাম।' ইহুদিরাই মদিনায় মুনাফিকি ছড়িয়েছে। ধীরে ধীরে নিফাক ও কপটতার ধারাকে বেগবান করেছে। ইহুদিদের গোপন এই শক্তি—যারা ইসলামকে আঘাত করতে চায়, তাঁর ঐক্যকে বিনষ্ট করতে উঠেপড়ে লাগে এবং সর্বোপরি ইসলামি সংঘবদ্ধতাকে ছিন্ন করতে চায়, তাদের মদদ জুগিয়েছে।

এই লোক কখনো রাসূল ﷺ-এর কাছে বা পাশে নামাজ পড়েনি। কারণ, সে কখনোই মুমিন ছিল না। কুরআন বর্ণনা করেছে, তার হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ঈমান ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা পরে তাঁর নবিকে সতর্ক করে বলেন—

> 'আপনি কখনো তাদের কারও মৃত্যুতে নামাজ পড়াতে যাবেন না। তাদের কবরে দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করেছে।' সূরা তাওবা : ৮৪

সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরি করেছে। আর সেই কুফুরি নিয়েই সে মারা গেছে।

একটা ব্যাপার আমাদের থমকে দেয়, ভাবায় ও বিস্মিত করে। রাসূল ﷺ-এর এই মহানুভবতা আমাদের মানবীয় কল্পনাশক্তি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের গড়পড়তা বিবেক-বুদ্ধি ক্ষমা করার এমন নজিরবিহীন ঘটনা মেনে নিতে পারে না। আমাদের মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়। সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। এ-ও কি সম্ভব? তাও আবার সারা জীবন যারা ইসলাম ও মুসলমানের বিরোধিতা করেছে—তাদের সাথে? এ একমাত্র রহমত ও দয়ার আধার আল্লাহর রাসূলের পক্ষেই সম্ভব!

বড়ো মন এবং প্রশস্থ হৃদয়

বিশ্বে অনেক মুসলমানই আছে যাদের হৃদয় ঈমানি গায়রত ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ। দ্বীনের গর্বে যাদের বুক ফুলে ওঠে, হৃদয় প্রশান্তিতে ছেয়ে যায়। এই মনোভাব মানুষকে প্রতিশোধপরায়ণতা, আধিপত্য ও পেশিশক্তি প্রদর্শনের দিকে ঠেলে দেয়। এটা কিছুতেই দাওয়াতের পথকে মসৃণ করে না; কল্যাণ ও অগ্রগতি বয়ে আনে না। মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের হিদায়াতের পথে আনার ব্যাকুলতাই দাওয়াতের ক্ষেত্রকে উর্বর করে। ধৈর্য ও অবিচলতা বাড়ায়, ক্ষমা করতে শেখায়। রাসূল ﷺ মক্কা ও মদিনায় ক্ষমাকারীদের সর্দার ছিলেন। নবুয়তের শুরু এবং শেষে সর্বদাই তিনি মানুষকে হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন। হাসিমুখে ক্ষমা করে দেওয়ার চেয়ে বড়ো নমুনা আর কী হতে পারে! ক্ষমা করার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, মুনাফিকের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মাফ করে দেওয়া।

ইতিহাসে এমন আরও একটা দৃশ্যের দেখা পাওয়া যায়। মক্কা বিজিত হয়েছে। মুসলমানদের পদতলে মক্কার ভূমি। তখন নবিজি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'তোমরা আমার কাছে কেমন আচরণ আশা করো?' তারা বলল—'উত্তম আচরণ। সম্মানিত ভাই এবং বাধ্য সন্তানের মতোই।' তখন তিনি বললেন—'যাও, তোমরা মুক্ত।' এই ছিল নবিজির মন ও হৃদয়। ভুলে গেলেন দীর্ঘ ২০ বছরের কষ্ট ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা। সীমাহীন উৎপীড়ন। এমনকী দেশ ত্যাগে বাধ্য করার সেই হৃদয়বিদারক কাহিনিও! শত শত শহিদের রক্তের কথা। তাদের বিরুদ্ধে নবিজি কোনো প্রকার বিশেষ আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনাল গঠন করেননি। গণক্ষমা ঘোষণা করেন। সবাইকে আল্লাহর জন্যই মাফ করে দেন। নবিজি বলেন—

> 'আমি আমার ভাই ইউসুফ ﵇-এর মতোই বলব, আজ কোনো প্রকার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি অতি দয়াবানদেরও দয়াবান।'
> সিরাতে ইবনে হিশাম

নবিজির ক্ষমাপরায়ণতার আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো—সুমামা ইবনে উসালের সাথে তাঁর মানবিক আচরণ। একবার মুসলিম সৈন্যরা সুমামাকে ধরে আনে। মসজিদে নববির খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখা হয়। মাঝে মাঝে নবিজি তাঁকে এসে দেখে যান। এভাবে তিন দিন গত হওয়ার পর নবিজি বললেন—'এবার তাঁকে ছেড়ে দাও।' সাহাবারা তাঁকে মুক্ত করে দিলো। মুক্তি পাওয়ার পর সুমামা সোজা গোসল করতে গেলেন। তারপর মসজিদে গিয়ে সবার সামনে ঘোষণা করলেন—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।'

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের সাথে রাসূল ﷺ-এর এমন আচরণ দেখে আমি অবাক হয়েছি। ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেছি। যতই ভেবেছি, ততই নববি হিকমা ও প্রজ্ঞা,

কুশলতা ও মানবিকতা দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছি। আমার প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস বদলে গেছে। হায়! যদি নবিজির প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মানুষই ব্যাপারটার গভীরতা ও তাৎপর্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত!

হ্যাঁ, তারপরে অবশ্য আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে কোনো মুনাফিকের জানাজা পড়তে বারণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি তা হলো—তাঁর নিঃশর্ত ক্ষমা করা, ধৈর্য, অবিচলতা ও জামা দান। রাসূল ﷺ শুধুই সন্তানের দাবির ওপর ভর করে জামা দেননি; বরং আরও একটা লক্ষ্য ছিল, তার আজাব কমানো।

রাসূল ﷺ নিজের অন্তরে সমগ্র মানবতার চিন্তা ধারণ করতেন। সেই মহান দায়ভার নিয়েই সবাইকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করতেন। তাদের আল্লাহর শাস্তি ও আজাব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলতেন—'হে কুরাইশ বংশ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'

হে দ্বীনের দায়ি! রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করুন। কারণ, তিনি সত্যের ওপর ছিলেন। নিজেকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত করুন। মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন। উচ্চ মূল্যবোধ পোষণ করুন। মানুষের হিদায়াত ও সৎপথ প্রাপ্তিকে বড়ো করে দেখুন; প্রতিশোধপরায়ণতা ও প্রতিহিংসাকে নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'এরাই তারা—যাদের আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছে। সুতরাং তাদের হিদায়াতকে অনুসরণ করুন।' সূরা আনআম : ৯০

আস্থাবান নবি

আসন্ন সাহায্য

খাব্বাব ইবনে আরাত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> ‘একবার আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করতে গেলাম। তিনি তখন কাবার ছায়ায় একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। আমরা বললাম, “আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্যের আবেদন করবেন না? আমাদের জন্য দুআ করবেন না?” তিনি বললেন—“তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ে দাওয়াতের কাজ করা লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। জমিনে গর্ত করে তাঁদের সেখানে রাখা হতো। লম্বা করাত দিয়ে তাঁদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো। লোহার চিরুনি দিয়ে তাঁদের হাড্ডি থেকে গোশত আলাদা করা হতো। এমন বিভীষিকাময় শাস্তি পর্যন্ত তাঁদের দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। খোদার কসম! এই কাজ একদিন পূর্ণতা পাবেই। এমনকী একজন মুসাফির সানা শহর থেকে হাজরামাউত শহর পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে। কাউকে ভয় পাবে না। শুধু তার ছাগলপালের ওপর বাঘের ভয় করবে। অথচ তোমরা অস্থির হচ্ছো! তড়িঘড়ি করছ!”’ সহিহ বুখারি : ৩৬১২

আমি প্রায়শই অবাক বিস্ময়ে এই হাদিসের কথা ভাবি। এই আপাতবিরোধী ব্যাপার দুটি দেখে আমার বিস্ময় আরও দ্বিগুণ হয়। ঘোর লেগে যায়। একদিকে ব্যথাতুর আহত মন এবং একবুক কষ্ট নিয়ে সাহাবারা রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করছে, ‘আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্যের আবেদন করবেন না? আমাদের জন্য দুআ করবেন না?’ অথচ অন্যদিকে নবিজি চাদর মুড়ি দিয়ে কাবার চত্বরে বসে আছেন!

নিজের ধর্ম ও মতাদর্শের প্রতি এমন আত্মমর্যাদাশীল, নিষ্ঠাবান, ব্যাকুল ও আসন্ন সাহায্যের ব্যাপারে উদ্গ্রীব রাসূল ﷺ-এর চেয়ে কেউ কি আছেন? আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

> ‘আপনি হয়তো তাদের পেছনে নিজেকে শেষ করে দেবেন।’ সূরা কাহাফ : ৬

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘আপনি তাদের নিয়ে চিন্তিত হবেন না। তাদের ষড়যন্ত্র নিয়ে কুণ্ঠিত হবেন না।’ সূরা নাহল : ১২৭

চারপাশে শত্রুদের লাগামহীন ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের তীব্রতা উপেক্ষা করে তিনি শান্ত ও প্রশান্ত থাকতেন। তাঁর মধ্যে বিন্দু পরিমাণও অস্থিরতা দেখা যেত না। নীরব ও চুপচাপ থেকে কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন।

সংকটে স্থিরতা

নিদারুণ সংকটে রাসূল ﷺ-এর এমন প্রশান্ত ও স্থির থাকাটা আমাদের একটা বার্তা দেয়। সংকট মোকাবিলায় ক্রোধ, প্রতিক্রিয়া, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ কোনো সমাধান করতে পারে না। সংকট নানা ধরনের হতে পারে। যেমন : ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত কিংবা মানসিক অথবা সামগ্রিক সংকট—কোনো কিছুর মোকাবিলায় অস্থিরতা কোনো কাজে আসে না। মানুষের সাথে যেকোনো লেনদেন ঠান্ডা মেজাজে ও প্রশান্ত মন নিয়ে করতে হবে। ঠান্ডা মেজাজ নিয়ে কাজ করা মানে খারাপ কিছু মেনে নেওয়া নয়। কিছুতেই কোনো কিছুর প্রতি সমর্পিত হওয়া নয়। সর্বদা নিজের ওজন ও ভারসাম্য ধরে রাখতে হবে। কিছুতেই রুক্ষ মেজাজ নিয়ে সংকট মোকাবিলা করা যাবে না। রেগে গেলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, অসুস্থ ও অস্থির হয়ে পড়ে, সঠিক উপায়ে কাজ করতে পারে না এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই আলিমগণ বলেন—

> ‘সূর্য ডুবে গেলে আলো যেমন ম্লান হয়ে যায়, তেমনি রেগে গেলে বুদ্ধির প্রভা হারিয়ে যায়।’

সূর্য যখন উদিত হয়, সমগ্র পৃথিবী আলোয়-দীপ্তিতে ভরে যায়। গোটা চরাচর রোদে ঝলমলিয়ে ওঠে। বুদ্ধি ও বিবেকও অনেকটা তেমনি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করে। চোখের সামনে সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তুলে ধরে। সূর্য যখন ডুবে যায়, তার আলো ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। তেমনি মানুষের মধ্যে যখন রাগ ও ক্রোধ জন্মে, তখন নিমিষেই তার বুদ্ধির প্রখরতা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য চলে যায়। তখন সে নির্বোধের মতো আচরণ করে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এমন কাজ করে বসে—যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় কস্মিনকালেও করতে পারবে না। রাগ দূর হলে নিজের কৃতকর্মের কথা চিন্তা করে মাথার চুল ছিঁড়ে। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘রাগের মাথায় কেউ যেন দুইজনের মধ্যে বিচার করতে না যায়।’ সহিহ বুখারি : ৭১৫৮

কারণ, দুই পক্ষের মাঝে বিচার করতে সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। উভয় পক্ষের কথা শোনা উচিত। মানুষ যদি রেগে যায়, তাহলে সে কিছুতেই সূক্ষ্মভাবে, পরিশুদ্ধ উপায়ে কাজ করতে পারে না।

যেকোনো সংকট মোকাবিলায় সুস্থ মন-মস্তিষ্ক ও স্থিরতা খুবই প্রয়োজন। তার মানে এই নয়, অন্যায় ও ভুলের সময় চুপচাপ ও নীরব থাকতে হবে; বরং সংকট মোকাবিলায় ধীর গতিতে ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে।

নিষ্প্রভ বুদ্ধি

বাস্তবতা বড়োই তিক্ত ও কঠিন, সহস্র রকমের বেদনা ও যাতনায় পূর্ণ। চারপাশের অন্তহীন দুঃখ-শোকের ভেতরে, নিদারুণ সংকটের দরুন অনেকে লাগামহীন হয়ে পড়ে। নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে না। রাগে ফেটে পড়ে, প্রতিক্রিয়াশীল ও আতিশয্যপরায়ণ হয়ে পড়ে। উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় করে। মানুষকে আঘাত করে, কষ্ট দেয়। মানুষ তখন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কারণ জানে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই; বরং তা যন্ত্রণা-কাতর হৃদয় থেকে উৎসারিত বাক্যমালা। কষ্টের বর্ণমালা। অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড়ে উঠা অন্তরের গীত। সমস্যা জর্জরিত জীবনের বিলাপ। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণহীনতা দেখে মানুষ কষ্ট পায়। লাগামহীন আচরণে বিদ্ধ হয়। তখন সংকট দ্বিগুণ হয়। কিন্তু মানুষ যদি সুস্থ বিবেক ও স্থির মন নিয়ে সংকটের মোকাবিলা করে, তবেই সংকট থেকে উত্তোরণ সম্ভব। কিন্তু সংকটের ভয়াবহতা দেখে যদি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, তখন সংকট বাড়বে বই কমবে না।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

রাসূল ﷺ জীবনের সমস্ত কঠিন মুহূর্তই দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে শান্ত মেজাজে মোকাবিলা করে গেছেন। আমাদের সামনে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। তার মধ্যে একটা হলো হুদাইবিয়ার ঘটনা। এই ঘটনায় উমর ؓ রাসূল ﷺ-কে বলেন—'আপনি কি আল্লাহর নবি নন?' তিনি বললেন—'অবশ্যই আমি আল্লাহর নবি।' উমর বললেন—'আমরা সত্যের ওপর আর আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর নেই?' তিনি বললেন—'অবশ্যই আমরা সত্যের ওপর আছি।' উমর ؓ বললেন—'তাহলে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে এমন অপমান সইব কেন?'

সাহাবাদের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধে। সবার ভেতরে একটা চাপা অভিযোগ অনুযোগ ছিল। উমর ؓ সাহসী ও কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই এসব কথা তিনি সাহস করে প্রকাশ্যে বলে ফেললেন। তিনি প্রথমে আবু বকর ؓ-এর কাছে যান। তারপর যান রাসূল ﷺ-এর কাছে। আর এভাবেই কথা বলেন—'আমরা কি সত্যের ওপর অটুট নেই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিল নয়?' তারপর বলেন—'কীসের ভিত্তিতে আমরা দ্বীনের ওপর এমন অপমান মেনে নিচ্ছি?'

উমর ؓ এই সন্ধিকে একপ্রকার অপমান মনে করেছিলেন। চারপাশের এতসব চাপ, সাহাবাদের চাপা অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ ব্যাপারটা ঠান্ডা মেজাজে, শান্তভাবে সামাল দেন। তাঁর কথায় কিংবা আচরণে বিন্দু পরিমাণ ক্ষোভ কিংবা অস্থিরতা প্রকাশ পায়নি। নবিজির স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বে এতটুকুন ছেদ পড়েনি। গোটা ঘটনাজুড়ে তিনি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন।

তিনি বলেন—'আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি কখনোই তাঁর নির্দেশ অমান্য করব না। তিনি কখনোই আমার ক্ষতি করবেন না।' এই কয়েকটি কথা বলেছেন মাত্র। কথা স্বল্প, কিন্তু খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যময়।

প্রায় সাড়ে চোদ্দোশত বছর পরে এসে এই ঘটনা নিয়ে আমরা কথা বলছি। রাসূলের ব্যক্তিত্বের এই উন্নত বোধ ও দিক নিয়ে চিন্তা করছি। প্রতিটি মানুষই নবিজীবনের এই অনুপম দিকের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। এই গুণাবলির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটালেই আমাদের জীবন সৌন্দর্যে ভরে যাবে। তখন মানুষ শান্ত, কৌশলী ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। কাজের পরিণতি ও ফলাফল মেনে নেবে। খোদায়ি অমোঘ বিধান ও তাকদিরের কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। কুরআনের আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করবে। বলা হয়েছে—

> 'যদি আপনার কাছে তাদের প্রত্যাখ্যান কঠিন হয়ে যায়, তবে মাটিতে সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশের সিঁড়ি খুঁজে বের করুন; তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবেন। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাদের হিদায়াতের ওপর একত্রিত করতে পারতেন। আপনি কিছুতেই অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' সূরা আনআম : ৩৫

হুট করে রাগান্বিত হওয়ার মাঝে কোনো সমাধান নেই। একটা ব্যাপারে আপনার প্রচণ্ড রাগ হলো, তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, তাহলে কি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল? ব্যাপারটার নিস্পত্তি হলো? যা হয়ে গেছে তা কি বদলানো যাবে? না, কখনোই না। সুতরাং রেগে গিয়ে কী লাভ?

তাকদির ও বাস্তবতার প্রতি সমর্পণ

কত মানুষ জীবনের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে। কত স্বপ্নবাজ তরুণের অবসান হয়েছে। প্রত্যেকের বুকভরা আক্ষেপ ছিল, অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছিল, না পাওয়ার বেদনা ছিল। জীবনকে নিয়ে বর্ণিল স্বপ্ন ছিল, পরিকল্পনা ছিল। আবার স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ ও কষ্ট ছিল। জীবনের পরতে পরতে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনার সমাহারও ছিল। আমরা তা জানি না। কোনো দিন হয়তো জানবও না। কারণ, তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের না বলা কথা, অপূর্ণ আশা ও স্বপ্নের অবসান ঘটেছে। অথচ জীবনের তিক্ত বাস্তবতার সঙ্গে তাদের ভারসাম্যপূর্ণ বোঝাপড়া, ধৈর্য ও অবিচলতা, সম্পর্ক ও যোগাযোগের কথা আমরা জানি। তারা প্রত্যেকেই আপন গন্তব্যের পথে হেঁটেছেন। স্ব-স্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের কাঙ্ক্ষিত পথে হাঁটার সুযোগ দিয়েছেন।

সুতরাং বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে হবে; তা যত কঠিনই হোক না কেন। জীবনে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ভেঙে পড়া যাবে না। আমাদের জন্য শোভনীয় নয়—এমন কোনো কাজ করা যাবে না। রাগের মাথায় মানুষ কুফুরি পর্যন্ত করে। আল্লাহর অবাধ্য হয়। অথচ কুফুরি মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে বের করে দেয়।

ঈমান এমন কাজ করতে সায় দেয় না। তাকদিরের দাবি আছে। ঈমান ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে বাস্তবতা মেনে নিতে বলে। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার সাহস জোগায়। অথচ মানুষ তাকদিরের উলটো মর্ম বোঝে।

তাকদিরের অমোঘ বিধানকে মেনে নেওয়াই প্রকৃত ঈমানদারের কাজ। উমর رضي الله عنه বলেন—'আমরা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া তাকদির থেকে তাকদিরের প্রতি ছুটে বেড়াব।' অর্থাৎ অত্যাচার ও নিপীড়নের তাকদিরকে ন্যায়বিচার ও দাওয়াতের তাকদির দিয়ে মোকাবিলা করব। গুনাহের পরিণতিকে আনুগত্যের তাকদির দিয়ে পুষিয়ে দেবো। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যদি আল্লাহ মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিরোধ না করত, তবে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল।' সূরা বাকারা : **২৫১**

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অস্থিরতা, প্রতিক্রিয়া ও কাতরতার শিকার হয়। আমাদের উচিত, তা দূর করার চেষ্টা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

সুস্থিরতার ফল ও পরিণতি

হুদাইবিয়ার চুক্তিতে নবিজির শান্ত-সৌম্য মূর্তি একটা বার্তা দেয়; কঠিন পরিস্থিতিতে স্থির ও প্রশান্ত থাকার বার্তা। ঠান্ডা মেজাজে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার শিক্ষা দেয়। নবিজির এমন আচরণ প্রচ্ছন্নভাবে বলে দেয়, অর্থহীন চিৎকার-চেঁচামেচি সংকট নিরসন করতে পারে না। সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। তাই আমাদের উচিত বাস্তববাদী এবং কাজে বিশ্বাসী হওয়া।

আমাদের সমস্ত অনুভূতির লাগাম টেনে ধরতে হবে। খেয়ালি মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে হবে। অনুভূতিকে কাজের বাস্তবতায় নামিয়ে আনা চাই। কারণ, বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া, অভিজ্ঞতার কাঁকরময় পথে হাঁটা পোড়-খাওয়া মানুষ বদলে যায়। অনুভূতির ক্ষ্যাপাটে ভাব তাদের মধ্যে থাকে না। ঠান্ডা মেজাজে ও শান্ত প্রকৃতিতে পরিস্থিতিকে সামলিয়ে নিতে পারে। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সংস্কারমূলক কাজ করে। সূচনা করে জীবনে ইতিবাচক অধ্যায়ের। কারণ, তারা প্রতিটি কাজই শান্ত মন নিয়ে নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। ধীরে-সুস্থে কাজ করে, উৎপাদন বাড়ায়। কর্মক্ষেত্রে, পথচলায় তাদের নানা উটকো ঝামেলার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু এতে তারা বিচলিত হয় না, অস্থির হয়ে পড়ে না; বরং সুস্থির চিত্তে শান্ত মেজাজে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'তিনিই মুমিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি বর্ষণ করেন।' সূরা ফাতহ : ৪

ঈমানের চর্চা মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। কাজে তৃপ্তি ও প্রসন্নতা বাড়ায়। অথচ আলস্য মানুষকে অস্থির করে, মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়, সমস্যা দ্বিগুণ করে সর্বোপরি জীবনের সুস্থিরতা গিলে খায়।

তখন সে বলে বেড়ায়—'মানুষ এত কাজ কীভাবে করে? এত সমস্যা সৃষ্টি করে কেন? কেন এত শোরগোল?'

এই ধরনের মানুষগুলো সহজেই হতাশ হয়। জীবনের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। একপ্রকার বিমুখতা ও অনীহা নিয়ে পথ চলে। কাজের দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ, সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। জীবনকে দেখার, বিচার করার মানদণ্ড বদলে গেছে। তার লালিত চিন্তা বলে—এটা ঠিক নয়; এমন কাজ করার চেয়ে বসে থাকাই ভালো। কারণ, এতে দীর্ঘসূত্রিতা আসবে, অর্থহীন ও অনর্থক কাজ হবে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং বহু কর্মস্তর পার করতে হবে।

তাই যেকোনো কাজে সুস্থির চিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো সংকট মোকাবিলায় ধৈর্যশীল, অবিচল ও শান্ত থাকাটা একান্তই জরুরি। ব্যক্তিজীবনে যেমন সংকট থাকে, তেমনি সামষ্টিক জীবনেও সংকট আসে। সব সংকটই ধীরলয়ে, ঠান্ডা মেজাজে এবং সচ্ছ ও সঠিক উপায়ে নিরসন করা চাই। তাই বলে কোনোভাবেই ভুল পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না; বরং ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপই হলো সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা।

অবিচল নবি

আমাদের জন্য কি দুআ করবেন না

নবিজি কাবার চত্বরে বসে আছেন, গায়ে চাদর জড়িয়ে। একদল সাহাবা তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের কণ্ঠে অভিযোগের সুর। সবাই ব্যথায় কাতর। কিন্তু তাঁদের ভাষা সংযত। অধুনা কালের প্রতিবাদের উত্তপ্ত ভাষা নয়—ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, পরিস্থিতি অনুকূলে নেই ইত্যাদি ভাষা নয়। আর ধৈর্যহারা অস্থির জীবনের কোনো অর্থ নেই। যে ঈমানে অবিচলতা নেই, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। ধৈর্য জীবনের এক নির্মম পাঠ—তা সবাইকে গ্রহণ করতে হয়।

সাহাবারা নবিজির কাছে তাঁদের অভিযোগ জানায়। কিন্তু অভিযোগের ভাষা ছিল সংযত ও পরিমিত; লাগামহীন নয়। অধুনাকালের মানুষের মতো বল্গাহীন নয়। দুই বাক্যেই তাঁদের কথা শেষ। শুধুই মিনতিভরা কণ্ঠে বলেছেন—‘ আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না? সাহায্য চাইবেন না?’ তাঁদের বলায় আকুতি ছিল। ছিল নিজেদের অসহায়তা ও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা কিন্তু বলেননি, ‘আমরা আর সইতে পারছি না। সুতরাং আপনি সাহায্য চান, দুআ করুন।’ এমন নির্দেশের সুর তাঁদের গলায় ছিল না। তাঁরা নবিজির কাছে অত্যন্ত কোমলতাভরা কণ্ঠে নিজেদের আরজি পেশ করেছে। এই ঘটনা সাহাবাদের অনুপম গুণাবলি আর শিষ্টাচারের প্রতি ইঙ্গিত করে।

প্রথমত, তাঁরা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেনি। ক্ষোভ ও উষ্মা দেখায়নি; বরং ধৈর্য ধরেছে, অবিচল থেকেছে, স্থির থেকেছে, পূর্ববর্তী নবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, রাসূলের সাথে তাঁদের অনুপম আচরণ ও শিষ্টাচার। তাঁরা দলবেঁধে নবিজির কাছে অনুযোগ জানিয়েছে। কষ্টে তাঁদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেছে, এমনকী হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে। আল্লাহর রাসূলের অনেক সাহাবা ইতোমধ্যেই শাহাদাতবরণ করেছেন। তীব্র অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়েছেন। ব্যাপারটা দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তাঁদের অনেকেই কুফুরি ও ধর্মত্যাগের ব্যাপারে বাধ্য হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'তবে যারা (কুফুরি করতে) বাধ্য হয়, অথচ তাঁর হৃদয় ঈমানের ওপর অবিচল আছে—তারা ব্যতীত।'

সাহাবারা এই তিক্ত কঠোর পরিস্থিতি মুখোমুখি হতো। একপর্যায়ে পরিস্থিতি তাঁদের অনুকূলের বাইরে চলে যায়। তাই তাঁরা আল্লাহর রাসূলের কাছে আসতে বাধ্য হয়। মিনতিভরা কণ্ঠে কোমলতার সাথে আকুতি জানায়—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না? সাহায্য চাইবেন না?'

তাঁদের এমন মিনতিভরা সম্বোধনের একটা কারণ ছিল। তাঁরা জানত, সাহায্য খোদায়ি তাকদিরের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, গণ্ডি ও বলয় ঠিক করে দিয়েছেন। উপযুক্ত সময়েই সবকিছু হয়। সময়ের আগে-পরে কিছুই হয় না। এটাই খোদায়ি বিধান ও রীতি। তাই তাঁরা শুধুই মানবীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। মিনতি জানিয়ে বলেছেন! 'হে রাসূল—আপনি কি সাহায্য চাইবেন না?'

রাসূল ﷺ ব্যাপারটা গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন। তারপর তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

> 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। কবর খুঁড়ে তাঁদের সেখানে রাখা হতো। বিশাল এক করাত দিয়ে তাঁদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো। লোহার ঝালর দিয়ে হাড় থেকে গোশত বের করে আনা হতো। এমন নির্মম নিপীড়ন ও অসহনীয় অত্যাচার তাঁদের দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। খোদার কসম! এই দ্বীনকে আল্লাহ অবশ্যই পূর্ণতা দেবেন। এমন এক সময় আসবে, যখন একজন মুসাফির সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে। এই দীর্ঘ পথচলায় সে কাউকে ভয় করবে না। শুধু তার ছাগলপালের ব্যাপারে বাঘের আশঙ্কা করবে। কিন্তু তোমরা বড়ো বেশি অস্থির। সবকিছুই আগে আগে চাও।' সহিহ বুখারি : ৩৬১২

প্রত্যাবর্তনের চিত্র

রাসূল ﷺ সাহাবাদের সামনে পূর্ববর্তী মুমিনদের অভাবনীয় কষ্ট ও সীমাহীন যাতনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কথার ফাঁকে তাঁদের উদাহরণ টেনেছেন। তাঁরা নিদারুণ কষ্ট ও সীমাহীন নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়ে ঈমানের ওপর অবিচল ছিলেন। কোনো শক্তিই তাঁদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। রাসূল ﷺ পূর্ববর্তীদের উদারহণ টেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছেন—'তোমরা সাবধান হয়ে যাও। কিছুতেই কোনো বিপদ যেন তোমাদের দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। কিছুতেই যেন ধর্মত্যাগের মতো ব্যাপার তোমাদের সামনে এসে না দাঁড়ায়।'

কিছু কিছু মানুষ বৈষয়িক লোভ, মানসিক বা শারীরিক চাপের কারণে দ্বীন থেকে বিমুখ হয়। কিছু মানুষ আছে যারা দ্বীন ত্যাগ করে না বটে, কিন্তু দ্বীনের অনেক বিধান ছেড়ে দেয়, ধৈর্যচ্যুত হয়ে যায়, আশা হারিয়ে ফেলে।

আবার এমন অনেক মানুষ আছে—যারা সামান্য কষ্ট পেলেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। হয়তো কখনো কখনো প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। কিন্তু এটা দ্বীনের শিক্ষা নয়। মানবতার বিজয় নয়। শরিয়াহ বিজয় অর্জন করার কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু যে জুলুম করেছে, তার ওপর জুলুম করার অনুমতি দেয়নি। রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘আমানতদারের আমানত ঠিক ঠিক রূপে ফিরিয়ে দাও। যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তার সঙ্গে কিছুতেই প্রতারণা করা যাবে না।’ তিরমিজি : **১২৬৪**

যে ব্যক্তি আপনার সঙ্গে মিথ্যা বলেছে, প্রতিশোধস্বরূপ তার সঙ্গে মিথ্যার বলার অনুমতি ইসলাম আপনাকে দেয় না। যে অন্যায়ভাবে আপনার সম্মানহানি করেছে, তার সম্মানহানি করার অধিকার আপনার নেই। যে আপনার নামে কুৎসা রটিয়েছে, বাজে কথা বলেছে, তার ব্যাপারে বাজে কথা রটানো আপনার পক্ষে শোভনীয় নয়। যে অন্যায় করেছে, প্রতারণা করেছে, তার সাথে অন্যায় কিংবা প্রতারণা করার কথা ইসলাম বলে না। এই হলো ইসলামের মূল্যবোধ এবং তার অনুপম চরিত্র।

কিন্তু মানুষ স্বভাবগত কারণে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তার সাথে খারাপ আচরণ করা লোকের সাথে ভালো আচরণ করতে পারে না; উত্তম আচরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যের ওপর বিজয় লাভ করার প্রবণতা কাজ করে, প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। অথচ ইসলাম তা অনুমোদন করে না। এই মনোভাব পোষণ করা ব্যক্তি ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করে। নববি শাশ্বত চরিত্র ও অনুপম শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়—কিছু মানুষ জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলে। জীবনের ছন্দপতন ঘটে; চেষ্টা ও পরিশ্রম করা ছেড়ে দেয়। প্রাত্যহিকতার চাপে পড়ে জীবনের বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। জীবনের কাছে হার মেনে নেয়।

কিন্তু একজন সৎ ও ঈমানদার ব্যক্তি সহজেই হাল ছেড়ে দেয় না। কর্ম-দায়িত্ব ভোলে না। নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হতে পারে না। নবি-রাসূলের কাছ থেকে পরম্পরা সূত্রে পাওয়া উত্তরাধিকারের মর্ম তাঁরা জানে। তাই সেই নববি উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা জীবন বাজি রাখে। নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যের পূর্ণ ব্যবহার করে। কারণ, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সে সাবধানে পথ চলে। সংযত পদক্ষেপে পা ফেলে। কাউকে নামাজের কথা বলতে গেলেও কৌশলের সাথে বলে।

জীবনের পরতে পরতে বহু রকমের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু কিছুতেই ভেঙে পড়া যাবে না। অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়লে চলবে না; বরং দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ঠান্ডা মেজাজে এবং সুবিবেচক মনে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক কিংবা বাস্তবতা যতই তিক্ত ও কঠিন হোক, কিছুতেই দ্বীন ছাড়া যাবে না। মানুষের সামনে পার্থিব স্বার্থ এসে ধরা দেবে। আর এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মুমিন সেই স্বার্থ আদায়ে দ্বীন ত্যাগ করে না। স্বার্থের জন্য কাতর হয়ে পড়ে না। যদিও বর্তমান দুনিয়ায় অনেক সংগঠন ও সংস্থা মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তাদের অসহায়তা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থা, ক্ষুধা ও বেকারত্ব ইত্যাদিকে পুঁজি করে আপন আপন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য আদায়ে লিপ্ত হয়। সাধারণ মন-মগজে, চিন্তা-ভাবনায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। কিন্তু সাচ্চা মুমিন এসব ফাঁপা বুলি ও অসার কর্মসূচিতে ভোলে না। তারা থাকে ঈমানের ওপর অনড় ও অবিচল।

নবিজি সাহাবাদের বলেন—'তোমরা বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করো।' অথচ তাঁরা শুধু বলেছে, 'হে রাসূল! আপনি আমাদের জন্য দুআ করবেন না? সাহায্য চাইবেন না?' এতটুকু কথাতে নবিজি তাদের বললেন—'তোমরা বড়ো বেশি তাড়াহুড়োপ্রবণ।' অথচ এই দাবির পেছনের ইতিহাস তিনি জানেন। তাঁরা দ্রুতই বিজয় চাইছে। কিন্তু সবকিছুর ব্যাপারে খোদা তায়ালার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময়ের আগে কিছুই ঘটে না। আপন সময়েই সবকিছু হয়। তাই বলে কিছুতেই বসে থাকা যাবে না; বরং আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ মন নিয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানাতে হবে, আর এটাই মুমিনদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাই মুমিনের জন্য কল্যাণকর। দ্বীনের মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে তাঁর আত্মমর্যাদা অনেকগুণ বেশি। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আল্লাহ জানেন; তোমরা জানো না।' সূরা বাকারা : ২১৬

আল্লাহর সাথে রাসূলের সম্পর্ক

আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করেনি

জুনদুব ইবনে সুফিয়ান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

'একবার রাসূল ﷺ অসুস্থ ছিলেন। তাই দুই কি তিন রাত জেগে নামাজ পড়তে পারেননি। নবিজির এই অবস্থায় এক মহিলা এসে বলল—'মুহাম্মাদ! তোমার কাছে বোধ হয় ওই শয়তানটা আসা বন্ধ করে দিয়েছে? গত দুই কি তিন রাত পর্যন্ত তো তাঁকে দেখতে পেলাম না!' তখন তিনি খোদার বাণী তিলাওয়াত করে শোনান। কুরআন বলছে—

> 'পূর্বাহ্নের শপথ! এবং রাত যখন আঁধার হয়, তার শপথ! আপনার প্রভু আপনাকে ছেড়ে দেয়নি, ত্যাগও করেনি। আপনার জন্য আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। অচিরেই আল্লাহ আপনাকে এমনভাবে দেবেন, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' সূরা দ্বোহা : ১-৫

রাসূল ﷺ দীর্ঘ রাত অবধি নামাজ পড়তেন। জীবনের জ্বরা ও কষ্ট থেকে মুক্তি কামনা করতেন। খোদার কাছে আকুতিভরা প্রার্থনা করতেন। আল্লাহর কাছে গোপনে মোনাজাত করার চেয়ে বড়ো কোনো ইবাদত আর কী হতে পারে! মোনাজাত হৃদয়ের দুঃখ-কষ্ট লাগব করে। কারণ, খোদায়ি রহমতে সিক্ত হৃদয় কিছুতেই কাহিল হয় না। ক্লান্তি ও বিপর্যয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হতাশা ও ব্যর্থতা তার ওপর গেঁড়ে বসতে পারে না। খোদায়ি রহমতের চাদর তাকে ঢেকে রাখে, ছায়া দেয়।

জীবনের পরতে পরতে তিক্ততা ও প্রতিকূলতা থাকে। বিষাদময় নানা অধ্যায়ের উপস্থিতি জীবনকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু মানুষের হৃদয় যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, খোদায়ি রহমতে সিক্ত হয়, তাহলে কোনো যাতনাই তাকে অস্থির করে তুলতে পারে না। রাতের আঁধারে খোদার সামনে নামাজে নতজানু হওয়া হৃদয় কিছুতেই অস্থির হয় না, ভেঙে পড়ে না। এমনকী প্রাত্যহ ফরজ নামাজে খোদার দরবারে আত্মসমর্পিত চিত্ত এক অপার্থিব প্রশান্তিতে ছেয়ে যায়। মানুষ যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, সাথে তার হৃদয়ও লুঠিয়ে পড়ে খোদার দরবারে মিনতি জানায়। নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তা তুলে ধরে। নামাজ শেষে তার হৃদয় পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে ওঠে।

প্রাণচাঞ্চল্যে দেহমন সজিব হয়ে ওঠে, উদ্যম ফিরে আসে। এভাবেই রাসূল ﷺ দীর্ঘ জীবনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। জীবনকে উপভোগ্য ও মনোরম করে গড়ে তুলেছেন। সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে জীবনের মূল গন্তব্যে উপস্থিত হয়েছেন।

নবুয়তের প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> ‘হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! রাতের কিছু অংশে নামাজ পড়ুন।’

অন্য জায়গায় বলছেন—

> ‘হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি! আপনি উঠুন এবং মানুষকে সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর বড়োত্ব ঘোষণা করুন। কাপড় পবিত্র করুন। পৌত্তলিকতাকে বর্জন করুন। বেশি পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না।’ সূরা মুদ্দাসসির : ১-৬

তারপরের আয়াতে বলেন—

> ‘এবং আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন।’ সূরা মুদ্দাসিসর : ৭

আমরা কোনো কল্পিত চিত্রের কথা বলছি না; বরং ইসলামি শরিয়াহর বিধানের আলোচনা করছি। পূর্ববর্তী যুগে এমন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান মুমিন ছিলেন, যারা ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম, সাধারণের ঊর্ধ্বে। তাঁদের কথা আলাদা। এখানে আমরা সাধারণ গড়পড়তা মুমিনদের কথা বলছি। সহজ ও অনুকূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছি। প্রতিটি বিপদ ও বিপর্যয়ে, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সংকটে আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল থাকা প্রয়োজন। যেমন : একবার এক লোক বলল—‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর ইসলামের বিধান ভারী হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন কিছু বলুন, যা নিয়ে আমি ইসলামে টিকে থাকতে পারব।’ নবিজি তাকে বললেন—‘তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত রাখবে।’

কারণ, জিকির করতে মানুষের তেমন বেগ পেতে হয় না। জিকির করতে কোনো প্রকার পবিত্রতা বা ওজুর প্রয়োজন হয় না। মানুষ খুব সহজেই ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে পারে।

ওই মহিলা নবিজির প্রতিদিনের ইবাদতে ভাটা পড়তে দেখে প্রশ্ন করল, ‘তোমার কাছে আসা শয়তানটা হয়তো তাঁর আগমন বন্ধ করে দিয়েছে?’ মহিলার এভাবে প্রশ্ন করার কারণ, সে মুশরিকদের এমনটাই বলতে শুনেছে। মুশরিকরা বলত, ‘মুহাম্মাদের কাছে একটা শয়তানের পক্ষ থেকে ওহি আসে।’ মহিলার এমন তীর্যকপূর্ণ ও শ্লেষমাখা কথা শুনে নবিজির মন খারাপ হয়। আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে সান্ত্বনার বাণী শোনান এবং এই সূরা অবতীর্ণ করেন। সপ্তম আসমানের ওপর থেকে কসম কেটে এই সূরা শুরু করেন এবং নবিজিকে আশ্বাস দেন।

মহান শপথ

সূরা দ্বোহার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কসম করেছেন। দিনের শুরু এবং রাতের আগমনের কসম কেটেছেন। এই দুই সময় উল্লেখ করার মাঝে একটা তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য আছে। দিন ও রাতের প্রথমভাগ উল্লেখ করে সমগ্র বিশ্বকে কসমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সাধারণভাবে জীবন, দিন-রাত ইত্যাদি নিয়ে শপথ কেটেছেন। কারণ, তা হলো ভালো খারাপের সংরক্ষণাগার। কিন্তু এই শপথ একটু ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে এমন সময় উল্লেখ করেছেন—যা মানুষের কৃতকর্মের সংরক্ষণাগার। এখানে একটা সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ আছে। রাতের আঁধার যখন নেমে আসে, আল্লাহ তায়ালা সেই সময়ের শপথ কেটেছেন। কারণ, রাসূল ﷺ এমন সময়ে, রাতের আঁধারে ইবাদতে মশগুল হন, তাহাজ্জুদে মহান রবের কাছে কাকুতি-মিনতি জানান। আর পূর্বাহ্নে রাসূল নামাজ পড়েন। আরও একটি সুপ্ত ব্যাপার আছে—নবিজির কখনো তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে পূর্বাহ্নে কিছু নামাজ পড়ে নিতেন। অনেকটা তাহাজ্জুদের বদলাস্বরূপ। তাই মুসলিম শরিফের বর্ণনায় দেখা যায়, নবিজি কখনো অসুস্থ বা ঘুম তীব্র হলে পূর্বাহ্নে বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। এই নামাজ দুই রাকাত করে পড়তেন। প্রতি দুই রাকাতেই সালাম ফেরাতেন। বিতরের নামাজ ছুটে গেলে শেষ রাতে পড়তেন। আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে বা ভুলে বিতর নামাজ পড়তে পারে না, সে যেন স্বরণ হলেই পড়ে নেয়।' আবু দাউদ : **১৪৩১**

আঁধার ঘনিয়ে আসা রাত ও পূর্বাহ্নের শপথ কাটার মূল কারণ হলো, এই সময়ের তাৎপর্য ও মর্যাদা বর্ণনা করা। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আপনার প্রতিপালক আপনাকে ছাড়েননি এবং ত্যাগও করেননি।'

এই কথাটা ছিল সেই মহিলার কথার জবাব। আল্লাহ রাসূলকে ছাড়েননি এবং ত্যাগও করেননি। একাধিক শব্দের ব্যবহারের কারণে ব্যাপারটা আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়।

রাসূল ﷺ দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশা

আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ আপনাকে প্রথমটা দিয়েছেন। সুসংবাদ শুনিয়েছেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং ছেড়ে দেননি।' এই কথাটার মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে; ভালোবাসার ইঙ্গিত। বান্দার জন্য প্রতিপালকের ভালোবাসা হলো সমস্ত কল্যাণ ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাঁর কোনো কিছুর হারানোর বা খোয়ানোর আশঙ্কা থাকে না। দুনিয়ায় হোক

বা আখিরাতে সব জায়গায় সে আশঙ্কামুক্ত। কেউ মহান রবের ভালোবাসা ও শুভদৃষ্টি পেলে তার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি চলে আসে, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আসে। তার জীবন থেকে সব ধরনের পঙ্কিলতা ও কদর্যতা দূর হয়ে যায়। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তার জীবন সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ থাকে। কোনো প্রতিকূলতাই তার জীবনের স্বাভাবিক গতিপথে প্রভাব ফেলতে পারে না।

সুখ ও আত্মার প্রশান্তির জন্য সুন্দর পোশাক, মনোরম রসালো খাবারের কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন আছে বটে, তবে সুখের মূল উৎস হলো হৃদয়। হৃদয়-বন্দরে যখন সুখের ফোয়ারা উৎসারিত হয়, তখন মানুষ সবকিছুতেই সুখ খুঁজে পায়। এমনকী কোনো জিনিস থেকে বঞ্চিত হলেও তার মন খারাপ হয় না, সুখানুভূতি নষ্ট হয় না। অতি তুচ্ছ ও স্বল্প জিনিসের মাঝেই সে সুখ খুঁজে পায়। জীবনের এই বোধ ও মর্মের প্রতি কুরআন নির্দেশ করেছে 'দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম'—এই কথার বলার মাধ্যমে।

দুনিয়ায় রাসূল ﷺ-কে সব ধরনের আনন্দের উপলক্ষ্য, মনের প্রশান্তি জোগায় এমন বস্তু এবং চক্ষুশীতলকারী সব উপকরণ দিয়েছেন। পৃথিবীতে নবিজির চেয়ে বেশি সুখী ও প্রশান্ত হৃদয়ের মানুষ আর কেউ জন্মাননি। এতটা খুশি ও আনন্দে কেউ জীবন পার করেনি। কারণ, আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে অন্তহীন প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। তারপর উক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানান দিচ্ছেন—'আখিরাতের জীবন আরও অধিক সুন্দর, মনোরম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।' দুনিয়ার জীবন অনেক কল্যাণপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ছিল, কিন্তু আখিরাতের জীবন তার চেয়েও কোটিগুণ বেশি সমৃদ্ধময়। তারপর আল্লাহ বলছেন—

> 'অচিরেই আল্লাহ আপনাকে এত বেশি পরিমাণে দেবেন যে, আপনি সুখী হয়ে যাবেন।'

নবিজি সর্বদাই তাঁর মহান রবের প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন ছিলেন। এমনকী তায়েফের অমানুষিক নির্যাতনের পরেও তাঁর মধ্যে কোনো অনুযোগ-অভিযোগ দেখা যায়নি; বরং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন—

> 'যদি আমার প্রতি আপনার কোনো অসন্তোষ না থাকে, তবে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু আপনার ক্ষমাই আমার জন্য অনেক প্রশান্তিস্বরূপ।' সিরাত ইবনে হিশাম

নবিজির এমন মনোভাবের পরও আল্লাহ তায়ালা বলছেন—'অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে এত বেশি দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' অর্থাৎ দানের পর আবার দেবেন। সবচেয়ে বড়ো দান হলো—আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞ রাখা।

প্রতিশ্রুতি

উপরিউক্ত কথার পরে আল্লাহর তায়ালা নবিজিকে দেওয়া অসংখ্যা নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তিনি কি আপনাকে ইয়াতিম অবস্থায় পাননি, তারপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন?’

রাসূল ﷺ খুব ছোটো বয়সেই বাবা-মাকে হারান। দাদা আব্দুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের আশ্রয় বেড়ে ওঠেন। দাদা-চাচা তাঁকে বুকে আগলে রাখেন, লালন-পালন করেন। কিন্তু মূল আশ্রয় দিয়েছিলেন আল্লাহ; সমগ্র সৃষ্টিকুলকে তাঁর অধীনস্থ করেছেন। সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নবিজিকে রক্ষা করেছেন, সুরক্ষা দিয়েছেন।

তারপর হিদায়াত ও সৎপথের দিশা দেওয়ার অমূল্য নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—‘তিনি আপনাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত পেয়েছিলেন, অতঃপর সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।’ অর্থাৎ আপনি সরল ও সঠিক পথ চিনতেন না, আল্লাহ আপনাকে সেই পথের দিশা দিয়েছেন। নবিজি দ্বীনের পথ খুঁজে বেড়াতেন। আল্লাহ সত্য দ্বীনের সন্ধান দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘আপনি কুরআন ও ঈমান সম্পর্কে জানতেন না। কিন্তু আমি ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছি—যা দিয়ে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই।’

তারপর আল্লাহ আরও বলেন—

> ‘তিনি তোমাকে অসহায় পেয়েছিলেন, তারপর সহায় দিয়েছেন।’

রাসূল ﷺ ছিলেন নিঃস্ব ও অসহায়। মৃত্যুর সময়ও নবিজির কাছে কিছু ছিল না। কোনো দিনার-দিরহাম কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যাননি; বরং ইলম ও জ্ঞান রেখে গেছেন। সেই জ্ঞানই সমগ্র মানবজাতির জন্য খোদাপ্রদত্ত সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে সম্বোধন করছেন—

> ‘তিনি আপনাকে অসহায় অবস্থায় পেয়েছেন তারপর আশ্রয় দিয়েছেন।’

প্রকৃত প্রাচুর্য হলো অন্তর ও হৃদয়ের প্রাচুর্য। এই আয়াতের ভিন্ন একটা অর্থও আছে; সমগ্র উম্মাহকে সচ্ছল করে গড়ে তোলা। যেমনটা নবিজি বলেছেন—

> ‘আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার হাতে দুনিয়ার সম্পদের চাবি নিয়ে আসা হয় এবং তা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়।’ সহিহ বুখারি : ২৯৭৭

আবু হুরায়রা ﵁ বলেন—

> ‘রাসূল ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা তা কেড়ে নিচ্ছো।’

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। এই দীর্ঘ সময় পরে এসে আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখছি—মুসলিম বিশ্বেই জগতের সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে আছে। এটা খোদায়ি প্রতিশ্রুতির অংশ। প্রাচুর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এই উম্মাহর স্থায়িত্বের প্রমাণ। সম্পদ ও প্রাচুর্যের এই বিশাল সম্ভাবনা মুসলিম বিশ্বের উপস্থিতি জানান দেয়, প্রভাব ও কার্যকারিতা তুলে ধরে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্‌পদতাকে ঢেকে দেয়। মুসলিম উম্মাহর এতসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও খোদায়ি প্রতিশ্রুতি এই জাতিকে টিকিয়ে রেখেছে।

কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বাড়ে

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমগ্র উম্মাহকে এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়ামত তিনি সারা জীবন দেবেন। আখিরাতে দুনিয়ায় প্রদত্ত নিয়ামতের অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। তাই তিনি বলেছেন—

> ‘সুতরাং কোনো ইয়াতিমকে ধমক দেবেন না। কোনো ভিক্ষুককে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেবেন না। আর আপনার প্রভুর নিয়ামতের বর্ণনা করুন।’ সূরা দ্বোহা : ৯-১১

অর্থাৎ এই অগণিত নিয়ামতের বিনিময়ে ইয়াতিম, অসহায় ও দরিদ্রদের সাথে সদাচরণ করুন। তাদের সাথে কিছুতেই রূঢ় আচরণ করবেন না। কারণ, তারা দুর্বল ও আর্তপীড়িত; বরং যাদের কোনো সহায় নেই, আশ্রয় নেই, মাথা গোজার ঠাঁই নেই, তাদের সহায় হোন। তাদের সুরক্ষায় এগিয়ে যান। এই আর্তপীড়িত মানুষগুলোর জন্যই আপনার সুপারিশ ও আবেদন করা চাই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘সুতরাং প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।’ অর্থাৎ কোনো অসহায় ও সাহায্য প্রার্থীকে রূঢ় স্বরে কথা বলতে নেই। তার সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে নেই; বরং তার হাতে কিছু তুলে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর কিছু দিতে না পারলে সুন্দর ও কোমল কথা বলুন। তখন অন্তত তার মনটা খুশি হবে।

রাসূল এবং কথা বলার শিষ্টাচার

তাকে বলতে দাও

মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাজি রাসূল ﷺ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক ও বাইহাকির একটা বর্ণনা তুলে ধরেন—কুরাইশের সব সর্দাররা কাবার চত্বরে একত্রিত হলো। রাসূল ﷺ এবং তাঁর নতুন দ্বীন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল—'এই দ্বীন আমাদের স্বপ্ন মাটি করে দিয়েছে, পূর্বপুরুষের ধর্মকে মন্দ বলছে। সর্বোপরি এমন সব ব্যাপার নিয়ে এসেছে, যা আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

একপর্যায়ে কুরাইশ সর্দার উতবা কথা বলা শুরু করে। সে বলল—'হে কুরাইশের নেতারা! আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে। আমি মুহাম্মাদের কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করব। এই ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলব। সে সবগুলো প্রস্তাব মেনে না নিলেও অন্তত কিছু করতে পারে। তাঁর মেনে নেওয়া প্রস্তাবগুলোতে আমরা সাড়া দেবো। সে যা চায়, তা-ই দেবো। আর এভাবেই সে তাঁর দ্বীন প্রচারে ক্ষান্ত দেবে।'

এই প্রস্তাবে সবাই এক কথায় সম্মতি জানাল। 'ঠিক আছে আবুল ওয়ালিদ, আপনার কথাই সই। আপনি তাঁর সাথে কথা বলে দেখুন।' উতবা মজলিস ছেড়ে উঠে আসে। ধীরে ধীরে রাসূল ﷺ-এর ঘরের দিকে পা বাড়ায়। নবিজির কাছে গিয়ে বলে—'ভাতিজা! তুমি তো জানোই, তুমি আমাদের মধ্যে অতি মধ্য পন্থি মানুষ। তা ছাড়া বংশের দিক দিয়েও অতি উচ্চ বংশীয়। অথচ সেই তুমি এমন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার নিয়ে এলে—যা তোমার স্বজাতির মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে, তাদের স্বপ্ন মাটি করে দিয়েছে, তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্ম ও প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলেছে এবং অনেক সন্তান তার বাবার অবাধ্য হয়েছে। আমি তোমার কাছে কয়েকটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আশা করি প্রস্তাবগুলো তোমার ভালো লাগবে। তার কিছু তুমি হয়তো গ্রহণও করতে পারো।'

রাসূল ﷺ তাকে বললেন—'হে আবুল ওয়ালিদ! বলুন, আমি শুনছি।' সে বলল, 'ভাতিজা! তোমার এই মিশনের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ অর্জন হয়, তাহলে আমাদের বলো। আমরা তোমাকে এত পরিমাণ সম্পদ দেবো; আমাদের মাঝে তুমিই হবে সবচেয়ে সম্পদশালী। আর যদি তুমি নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি চাও, তবে আমরা তোমাকে নেতা বানাব; তোমার কথাই হবে শেষ কথা। যদি তুমি রাজত্ব চাও,

তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানাব। আর যদি তুমি জাদুগ্রস্ত কিংবা বিকারগ্রস্ত হও—যা তুমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছ না, তাহলে আমরা তোমার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করব। এর সমস্ত ব্যয়ভার আমরা গ্রহণ করব।'

উতবা ইবনে রাবিয়া রাসূল ﷺ সাথে এমন অর্থহীন অসার কথা বলে চলছে। বিজ্ঞ-জ্ঞানী ও সবজান্তার সুরে বলল—'যদি তোমার কোনো প্রকারের জিন বা ভূত-প্রেতের আছর লেগে থাকে—যা তোমার মাথা নষ্ট করে দিয়েছে, মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করছে, তাহলে আমাদের বলো, আমরা উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।'

অশালীন মানুষের সাথে শালীন আচরণ

একবার ভাবুন তো, এমন প্রস্তাব যদি আপনাকে দেওয়া হয়, তখন কী করবেন? প্রস্তাব দেওয়া লোকটার প্রতি আপনার অনুভূতি কেমন হবে? আপনার কাজের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা লোকটাকে ঘৃণা করবেন না পছন্দ করবেন? আপনার সদিচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করা মানুষের প্রতি আপনার ব্যবহার কেমন হবে; যে লোক অপবাদ দিয়ে বলে, আপনার কাজের পেছনে মূল মতলব সম্পদ ও খ্যাতি, সুন্দরী রমণী ও প্রতিপত্তি অর্জন? আর এসব অর্জনের জন্য সাধারণ প্রচলিত পথে পা না বাড়িয়ে দ্বীন ও ধর্মকে ব্যবহার করছেন, অনুপম চরিত্র ও উন্নত মূল্যবোধের বুলি দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করছেন, এরই ফাঁকে নিজের মতলব ও গোপন বাসনা চরিতার্থ করছেন—তখন তার প্রতি আপনার কেমন মনোভাব কাজ করবে?

সাধারণ গড়পড়তা মানুষ এমন কথা শুনে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না, রেগে ফেটে পড়বে; বরং রাগা করাটাই স্বাভাবিক। তাকে হয়তো কথাই শেষ করতে দেবে না। তার আগেই তার ওপর হামলে পড়বে। অথচ রাসূল ﷺ পুরো সময় নীরবে তার কথা শুনেছেন। বিন্দু পরিমাণ বিরক্ত বোধ করেননি। অস্থির হননি; বরং সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছেন। তার কথা শেষ হলে নবিজি মাথা তুলে বললেন—'আবুল ওয়ালিদ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?' সে বলল—'হ্যাঁ।'

এখানে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ফুটে ওঠে; নববি শিষ্টাচার ও শালীনতাবোধ। তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নবিজি কথা বলেননি; বরং তার আরও কোনো কথা আছে কি না জানতে চেয়েছেন, যেন তার মাঝে কোনো প্রকার দ্বিধা না থাকে।

এখানে একটা ব্যাপার বেশ লক্ষণীয়, তা হলো—নবিজির সম্বোধনের ধরন ও প্রকৃতি। নবিজি বেশ কোমলতার সাথে তাকে সম্বোধন করেছেন। তার উপনাম ধরে ডেকেছেন। উপনাম ধরে সম্বোধন করাটা বেশ আদরের ও সম্মানের। এই সম্বোধনের মাঝে একপ্রকার উষ্ণতা ও ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। এতে মানুষ তুষ্ট হয়। রেগে যায় না। প্রতিক্রিয়াশীল হয় না। তারপর নবিজি তাকে

কোমলকণ্ঠে বললেন—'এবার আমার কথা শুনুন। হা-মিম, অতি দয়ালু ও করুণাময়ের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' তারপর সূরা ফুসসিলাত থেকে কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান—

'যদি তারা বিমুখ হয়, তখন আপনি বলুন—"আমি তোমাদের সামুদ ও আদ জাতির ওপর নেমে আসা বজ্রপাতের মতো বজ্রপাত থেকে সতর্ক করছি। যখন তাদের সামনে-পেছনে রাসূলগণ এসেছিল।"' সূরা ফুসসিলাত : **১৩-১৪**

এর পর আরও কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। এমন সময় উতবা দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর রাসূলের মুখে হাত রেখে বললেন—'হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এবার তুমি একটু চুপ করো।'

ব্যাপক পরিবর্তন

উতবা আয়াতগুলো শুনে অবাক হয়ে যায়। আয়াতের ভাষার প্রভাবে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার মধ্যে একধরনের ঘোর লাগা কাজ করে। বজ্রাহত ব্যক্তির মতো হয়ে পড়ে; নির্বিকার, অভিব্যক্তিশূন্য। তার গোটা সত্তাজুড়ে এক শিহরন খেলে যায়; অনেকটা চৈতন্যহীন, ভাবলেশহীন। এভাবে সে আপন দলের কাছে ফিরে যায়। যখন সে তাদের কাছে পৌঁছল, তারা বলল—'খোদার কসম! আবুল ওয়ালিদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তার চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। অথচ সে এই চেহারা নিয়ে মুহাম্মাদের কাছে যায়নি।'

তারা চেহারা দেখে মনের অবস্থা মেপে ফেলে। সে অনেকটা ঘোর লাগা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মতো টলতে টলতে এলো। কুরআনের আয়াতের রেশ ও প্রভাব তখনও তার চোখে-মুখে লেগে আছে। ধীরে ধীরে সে মজলিসে এসে থামল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—'খোদার কসম! আজ এমন কথা শুনেছি, যা পূর্বে কখনো শুনিনি। এই কথাগুলো কোনো কবিতা নয়, কোনো জাদু নয় কিংবা নয় কোনো গণনা ও তেলেসমাতি। হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা আমার কথা শোনো। এই লোককে ছেড়ে দাও। তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও; সেটাই উত্তম হবে। খোদার কসম! আমি তাঁর থেকে যে কথা শুনেছি, নিঃসন্দেহে তা অনেক বড়ো ও ভয়াবহ সংবাদ। আরবরা যদি তাঁকে পরাজিত করে, তবে তোমরা তাঁর থেকে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই মুক্তি পেলে। সাপও মরল, লাঠিও অক্ষত রইল। আর সে যদি আরবের ওপর বিজয় লাভ করে এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে তাঁর সেই বিজয় ও প্রভাব মানে তোমাদেরও বিজয়। তাঁর সম্মান মানে তোমাদেরও সম্মান। তখন তোমরাই হবে সবচেয়ে সুখী মানুষ।'

উতবা সবাইকে নিরপেক্ষ থাকার উপদেশ দিলো। বলল—'তাঁকে আপন পথেই ছেড়ে দাও। তাঁকে নিজের মতো থাকতে দাও। যদি আরবরা তাঁকে গ্রহণ করে, তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাহলে তাঁর সম্মান মানে কুরাইশের সম্মান।' আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘নিশ্চয় তোমার এবং তোমার জাতির জন্য উপদেশস্বরূপ। অচিরেই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।’

‘যদি আরবরা তার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে তোমরাও বিনা যুদ্ধে তাঁর ওপর বিজয় লাভ করবে। তাই কুরাইশদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়ানোর কোনো দরকার নেই।’

আলাপচারিতার শিষ্টাচার

নবি-জীবনের এই ঘটনা একটা বিশাল তাৎপর্য বহন করে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বার্তা দেয়। এই ঘটনায় সবচেয়ে বড়ো যে ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো—উতবার সাথে কথা বলার ধরন ও প্রকৃতি। মানুষের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, তার একটা উত্তম রূপ এই ঘটনার মাঝে নিহিত রয়েছে। রাসূল ﷺ পুরো সময় চুপ থেকে উতবার কথা শুনেছেন। তাকে মনভরে কথা বলা সুযোগ দিয়েছেন। ধৈর্য ধরে তার কথা শুনেছেন। বিরক্তিভাব দেখাননি।

এখানে এক বিশাল শিক্ষা পাওয়া যায়। কিছুতেই কারও কথাকে ছোটো করে দেখা যাবে না; তা যত তুচ্ছই হোক না কেন। কথা বলার সময় কাউকে থামিয়ে দেওয়া কিছুতেই ভদ্রতা ও শালীনতার পর্যায়ে পড়ে না। চিৎকার-চেঁচামেচি করে কারও ওপর জয়ী হওয়া যায় না। জোর করে কারও মন পাওয়া যায় না। এভাবে যদি কেউ কারও ওপর জয়ী হতে পারত, তাহলে তর্ক-বিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য অজ্ঞতাই যথেষ্ট ছিল। মানুষ এত যুক্তিবিদ্যা, দলিল ও প্রমাণের পেছনে ছুটত না। অথচ হাজার বছরের ইতিহাসে তেমন নজির মেলা ভার। অথচ বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য, যুক্তিতর্ক এবং সঠিক ও বাস্তবধর্মী প্রমাণই মানুষকে তর্কে জয় এনে দিয়েছে। তাই রাসূল ﷺ উতবাকে কথা বলার সুযোগ দিলেন। মাঝপথে তাকে থামিয়ে দেননি। তাকে বলেননি—‘তুমি যা বলছ তার সবই ভিত্তিহীন, অসার, বোকামো।’ বরং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছেন। তার কথা পরিপূর্ণভাবে শেষ হলে নবিজি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন। নিজের কোনো কথা বললেন না।

ছোটো হয়ে সম্বোধন করার রীতি ও কৌশল

কুরআনে সম্বোধনের রীতি ও কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—

> ‘বলে দিন, আকাশ ও জমিন থেকে কে জীবিকা দেয়? বলুন, আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছো। বলুন, আমরা যে অপরাধ করেছি, তার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। আর তোমরা যা করছ, তার ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।’ সূরা সাবা : ২৪-২৫

'আমাদের অপরাধের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং প্রত্যেককেই আপন আপন কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা যা করছ, তার ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।' এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। তাদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া ব্যাপারকে বলা হয়েছে—'কাজ', অপরাধ বলা হয়নি। আলিমগণ এই ব্যাপারটিকে প্রতিপক্ষের জন্য নত হওয়া বলেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, প্রাত্যহিক আচরণ ও লেনদেনে, বৈঠক ও আড্ডায় এই রীতি অনুসরণ করা উচিত। মানুষের সাথে আলাপচারিতায়, কোনো কিছু দেওয়া ও গ্রহণ করা ইত্যাদিতে এই রীতি মেনে চলা উচিত। যার সাথেই কথা বলি না কেন, খোদায়ি এই রীতি ও ধরন মেনেই কথা বলা চাই। কিছুতেই মানুষের কথার মাঝখানে কথা বলা যাবে না।

মিডিয়ায় আলাপচারিতা

বর্তমান সময়টা মিড়িয়ার। এই যুগে মিড়িয়ার ব্যাপক ছড়াছড়ি। বলা যায়, মিড়িয়ার বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রচুর টকশো, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং নানা মত প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়; বরং সব ধরনের রাজনৈতিক, চৈন্তিক, সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন এবং বাদ-বিবাদের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে মিডিয়া। সব দল ও মতের মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম মিডিয়া। নিজেদের কথা, বক্তব্য, ইশতেহার পেশ করার উপযুক্ত মাধ্যম মিডিয়া।

এই মানুষগুলো মানুষের কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই নিজেদের ইশতেহার ও বক্তব্যে, কথা ও আলোচনায় প্রতিপক্ষের ওপর হামলে পড়ে, তীর্যক মন্তব্য করে। কথা বলার সময় চিৎকার-চেঁচামেচি করে, জোর ও দাপট নিয়ে কথা বলে। অথচ টিভির পর্দায় হাজারো দর্শক-শ্রোতা তাদের দেখছে। তাদের দেখে মনে হয়, তারা যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করছে। এই বুঝি প্রতিপক্ষকে গিলে খেলো! অনুষ্ঠানে দেখা যায় অমুক জিতল, তমুক হারল। কিন্তু প্রকৃত জয়-পরাজয়ের মূল মানদণ্ড কী? আলোচনায় বসলে কেমন স্বরে কথা বলা উচিত?

আমার ব্যক্তিগত মত হলো—আলোচনায়, টকশোতে গঠনমূলক ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত। তথ্যনির্ভর, যৌক্তিক এবং দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত। প্রজ্ঞাপূর্ণ ও কৌশলী বক্তব্য প্রদান করা উচিত। শান্ত স্বরে এবং ঠান্ডা মেজাজে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথে কথা বলা উচিত। প্রতিপক্ষকে সম্মান ও সব ধরনের চিৎকার-চেঁচাচেচি থেকে দূরে থাকা জরুরি। আর সত্য ও বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

ইসলাম ও মানবাধিকার

জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় আবু জাহেল

ইবনে ইসহাক তাঁর লেখা সিরাত গ্রন্থে একটা অসাধারণ গল্প বর্ণনা করেছেন। আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সুফিয়ান আস-সাকাফি বলেন—একবার 'ইরাশা' থেকে এক লোক মক্কায় উট নিয়ে এলো। আবু জাহেল তার থেকে একটা উট কিনল। কিন্তু যথাযথ মূল্য পরিশোধ না করে একটা অংশ রেখে দিলো। ইরাশা থেকে আগত লোকটি কুরাইশের বৈঠকখানায় গিয়ে অভিযোগ করল—'হে কুরাইশের লোকেরা! কেউ কি আমাকে আবুল হাকাম ইবনে হিশামের সন্ধান দিতে পারো? আমি একজন আগন্তুক মুসাফির। সে আমার অধিকার খর্ব করেছে। আমার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য দেয়নি।'

নবিজি ওই সময়ে পাশে বসে ছিলেন। কিছু লোক মুখে বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে রাসূল ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল—'ওই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছো?' তাদের মুখে চাপা হাসি। সে বলল—'হ্যাঁ।' তারা বলল—'তাঁর কাছে যাও, সে সন্ধান দিতে পারবে।'

তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি আবু জাহেলের বিদ্বেষের কথা বেশ ভালোভাবেই জানত। তাই একটা কাণ্ড দেখার জন্য নবিজিকে ব্যাপারটাতে জড়ালো, যেন তারাও মজা নিতে পারে। লোকটা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে সবিস্তারে ঘটনা খুলে বলল। কথা শুনে রাসূল ﷺ তাকে সঙ্গে নিয়ে আবু জাহেলের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

এই ছিল নবিজির আচরণ। তিনি বলেননি, আবু জাহল আর আমার মাঝে মনোমালিন্য আছে। সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই; বরং তাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। পূর্বের লোকগুলো যখন রাসূল ﷺ-কে যেতে দেখল, তখন তারা তাদের এক লোককে বলল—'তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দেখ তো কী ঘটে। আবু জাহেল তাঁর সাথে কী করে দেখে এসো।'

রাসূল ﷺ লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে আবু জাহেলের বাড়িতে হাজির হলেন। তার দরজায় করাঘাত করলেন। আবু জাহেল দরজা খুলে বের হলো। নবিজিকে দেখেই সে হতভম্ব হলো। রাসূল ﷺ তাকে নির্দেশের সুরে বললেন—'এই লোকের পাওনা দিয়ে দাও।' আবু জাহেল কোনো বাক্য ব্যয় না করেই বলল—'অবশ্যই। একটু দাঁড়াও, আমি এখনই তার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।' এ কথা বলে দ্রুতই ঘরের ভেতরে গেল এবং ফিরে এসে লোকটার পাওনা মিটিয়ে দিলো। তারপর রাসূল ﷺ ফিরে এলেন। শেষে ইরাশা থেকে আগত লোকটাকে বললেন—'এবার নিজের কাজে যাও।' লোকটা কুরাইশের বৈঠকখানায় এসে পূর্বের লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল—'আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।'

তারপর তাদের পাঠানো লোকটা এলো। তারা তাকে বলল—'তুমি কী দেখেছ, তাড়াতাড়ি বলো।' সে বলল—'এক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখেছি। মুহাম্মাদ দরজায় করাঘাত করা মাত্রই আবু জাহেল বেরিয়ে এলো। মনে হলো, তখন আবু জাহেলের দেহে প্রাণবায়ু ছিল না। মুহাম্মাদ বলল—"এই লোকের পাওনা মিটিয়ে দাও।" সে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। বলল—"একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি তার পাওনা নিয়ে আসছি।" এই বলে সে দ্রুত ঘরে ঢুকল এবং ফিরে এসে সাথে সাথে লোকটার পাওনা মিটিয়ে দিলো।'

এসব শুনে এবার তারা সবাই মিলে আবু জাহেলের কাছে গেল। আবু জাহেলকে বলল—'তোমার কী হলো? তোমাকে তো আগে কখনো এমন কাপুরুষসুলভ কাজ করতে দেখিনি।' এবার আবু জাহেল বলল—'খোদার কসম! যে-ই মুহাম্মাদ এসে দরজায় করাঘাত করল এবং আমি তার গলার স্বর শুনতে পেলাম, অমনি আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। দরজা খুলতেই দেখি তাঁর মাথার ওপর এক বিশাল দৈত্যাকার উট। এমন দৈত্যাকৃতির উট আমি কখনোই দেখিনি। বিশাল বিশাল এক-একটা দাঁত! উটটা আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। মনে হয় তাঁর কথার অবাধ্য হলে উটটা আমাকে গিলে খেত।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা বলল—'এভাবেই মুহাম্মাদকে ভয় পেলে? জবাবে সে বলল—'খোদার কসম! আমি তাঁর সাথে একদল লোক দেখলাম। সবার হাতেই ধারাল বর্শা চকচক করছে। আমি যদি লোকটার পাওনা মিটিয়ে না দিতাম, তারা বোধ হয় বর্শা দিয়ে আমার পেট ফেড়ে ফেলত।'

রাসূল ﷺ মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময় ইসলামের মূল নীতিমালা নিপুণভাবে তুলে ধরতেন। ইসলামের মূল নীতিমালা হলো—ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে দাওয়াত দেওয়া। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সীমালঙ্ঘনকারীদের টুঁটি চেপে ধরা এবং তাদের হাত থেকে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। এজন্যই রাসূল ﷺ এই লোককে সঙ্গে নিয়ে আবু জাহেলের কাছে যান এবং তার অধিকার আদায়ে সাহায্য করেন।

হিলফুল ফুজুল

রাসূল ﷺ হিলফুল ফুজুল সম্পর্কে বলেন—

> ‘আজও যদি আমি হিলফুল ফুজুলের ডাক পাই, সাড়া দিতে প্রস্তুত আছি।’ সুনানে বায়হাকি : ৩৬৭

রাসূল ﷺ বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত মানবাধিকার ও মানবাধিকার সংস্থার কথা বলেছেন। নবিজির যুগে কুরাইশের মহান নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের ঘরে একটা জমায়েত হয়েছিল। এই জমায়েতের লক্ষ্য ছিল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, দয়ালু, অভিজাত ও পৌরুষসম্পন্ন একজন মানুষ। আর মক্কা ছিল তৎকালীন সময়ের আরব উপদ্বীপের প্রধান শহর এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেই জায়গায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ান তাঁর মানবিক গুণাবলির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

রাসূল ﷺ নবুয়তের বেশ কয়েক বছর পূর্বে সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিয়ে হওয়া এই শপথ-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই সংগঠন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, নিপীড়িত ও দুর্বলদের অধিকার রক্ষায়, অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকের হাত থেকে দুস্থদের অধিকার আদায় করার এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল।

অবাক কাণ্ড হলো, এমন একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় জাহেলি যুগে; যখন মানুষের কোনো অধিকার ছিল না, সমাজে কোনো প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। তখন তারা বুঝতে পেরেছিল, জীবনের মূল ভিত্তি হলো অধিকার প্রতিষ্ঠায়। জাতি ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে মানবাধিকারের ওপর। যে রাষ্ট্রে মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা আছে, সে রাষ্ট্র স্থিতিশীল ও স্থায়ী। তার ওপর খোদায়ি রহমত নেমে আসে। এমনকী অমুসলিম রাষ্ট্রও যদি মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, সে রাষ্ট্র আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পায়। অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র মুসলিম হলেও আল্লাহর রহমত পায় না।

রাসূল ﷺ এই মানবাধিকার সংগঠনের ব্যাপারে কথা বলেছেন। সাড়া দেওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন—‘আজও যদি এমন ডাক আসে, আমি সাড়া দেবো।’ নবিজির এই উক্তি মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক করে। মুসলিম উম্মাহকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। নিজেরা দিতে না পারলে অন্যেদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। যারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

পশ্চিমা বিশ্বে মানবাধিকার সংস্থাগুলো জোর গলায় কথা বলে। জনগণের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকে। অথচ মুসলিম বিশ্বে কাউকে এমন কথা বলতে দেখা যায় না। কারও কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। একটু-আধটু যা শোনা যায়, তা-ও পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণে ক্ষীণ গলার চাপা স্বরে কিংবা তাদের কাজের প্রত্যুত্তর। অথচ আমরা মুসলিমরা বলে বেড়াই,

ইসলাম মানবাধিকারের কথা বলে। তাই প্রতিটি মুসলমানের মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করা উচিত। শরিয়াহ সমর্থিত সব অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে তৎপর হওয়াই মুসলমানের কাজ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকর সনদ

জাতিসংঘের বিশাল মানবাধিকার সনদের কথা আমরা জানি। গোটা বিশ্বে আজ তা স্বীকৃত। কিন্তু তার গোড়ায় কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। তা নির্ণয় করা দরকার এবং শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করার দাবি রাখে। এই সনদের অনেক নীতিই সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ আমরা তা অবলীলায় গ্রহণ করছি। তার মানে এই নয়, তার মূল ভিত্তি ভুলে ভরা। এই সনদ অবশ্যই মানবাধিকারের কথা বলে। তার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো—মানুষকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

অধিকার ও দায়িত্ব

মুসলিম সমাজ সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই কারও অধিকারের জন্য দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয় না। অনায়াসেই সবাই সবার অধিকার ভোগ করে। কিন্তু এর আগে তার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগ করার মাঝে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সুবিবেচক ও সুবোধ হওয়া উচিত। নিজের অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্বের প্রতিও সচেতন হওয়া জরুরি, যেন কিছুতেই অন্যের অধিকার খর্ব না হয়।

কারও কারও হয়তো অনেক বড়ো কোম্পানি আছে। সেই কোম্পানিতে হাজারো শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে। প্রতিটি কর্মচারীই অমানুষিক পরিশ্রম করে। কিন্তু কোম্পানির মালিক খুবই বাজে আচরণ করে, বেতন দেয় দেরিতে, চিকিৎসা ভাতা দিতে গড়িমসি করে, নানা ছুঁতোয় বেতন কাটে ইত্যাদি। কোম্পানির মালিকের দুর্ব্যবহার আর অশোভন আচরণে হাজারো কর্মচারী অতিষ্ঠ। আর কোম্পানির মালিক অতিষ্ঠ সরকারের জ্বালায়। অথচ মুসলিম সমাজে এমন চিত্র কিছুতেই কাম্য নয়। সমাজের নিচ থেকে ওপরের অংশের সমস্ত মানুষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করাই মুসলিম সমাজের করণীয়। কিন্তু হচ্ছে তার উলটোটা। এই চিত্র খুবই বেদনাদায়ক ও হতাশাজনক। এভাবে একটা জাতি টিকে থাকতে পারে না। স্থায়ী ও স্থিতিশীল হয় না। ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ মানুষের একটু সামান্য সচেতনতা ও প্রচেষ্টা এই সমস্যা দূর করতে পারে। মানুষের উচিত পরিবারের ভেতরে, স্বামী-স্ত্রীর, সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা। এভাবে শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে যেকোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, প্রশাসন—সব জায়গায় প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তখন সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। আর এই জাতি স্থায়ী হবে এবং আজীবন টিকে থাকবে।

উন্নত বিশ্বে মানবাধিকার

পশ্চিমাবিশ্ব মানবাধিকার নিয়ে গালভরা বুলি আওড়ায়। কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকারের পক্ষে কাজও করে বটে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না—তাদের এবং আমাদের মধ্যে ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত পার্থক্য আছে। তাদের অধিকার-বোধ ও আমাদের অধিকার-চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের অধিকার-চেতনার সাথে মিশে আছে ইসলামের উন্নত মূল্যোবোধ। তাদের অধিকার-বোধ শুধুই আপন দেশ ও প্রজাদের সুরক্ষা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইসলাম সমগ্র মানবগোষ্ঠীর নিশ্চয়তা চায়, পক্ষান্তরে তারা শুধুই নিজেদের সুরক্ষা ফিকিরে ব্যস্ত থাকে। এখানেই তাদের এবং আমাদের মূল পার্থক্য।

হ্যাঁ, তারা স্বদেশের বাইরে জাতীয়তাবাদ ও শত্রুতার বিষ ছড়ায়। তার প্রমাণ বহন করে আছে ইউরোপের উপনিবেশগুলো। কিন্তু আমরা ইসলামের মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ইসলাম মুসলিম বিশ্বের বাইরেও পৃথিবী প্রতিটি ভূখণ্ডে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। তার পক্ষে আওয়াজ তোলে। শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়; কুরআন আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করছে—

> ‘তোমাদের প্রতি কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদের অন্যায়-অবিচার করতে প্রণোদনা না দেয়; বরং তোমরা সুবিচার করবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। তা-ই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।’ সূরা মায়েদা : ৮

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তোমাদের প্রতি কোনো জাতির শত্রুতা—যারা তোমাদের মসজিদে হারামে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে—যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে।’ সূরা মায়েদা : ২

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন; এমনকী নিজেদের শত্রুদের সাথেও।

একটি প্রশ্ন : আমরা ন্যায়পরায়ণ, ইনসাফভিত্তিক পরিচালিত, মানবাধিকার প্রশ্নে সোচ্চার মুসলিম বিশ্ব কখন ফিরে পাব? মুসলিম জাতি আবার কখন একযোগে মানবাধিকারের শপথ নেবে? নাগরিক সংঘ গড়ে তোলাতে প্রয়াসী হবে? নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবে? নিপীড়ক অত্যাচারীদের হাত থেকে গরিবের অধিকার ছিনিয়ে আনবে? এই কাজগুলো যখন সাধিত হবে, তখনই দেশ ও মানুষ রক্ষা পাবে।

তিনি তাদের পিতা

আপনার চেয়েও আপন

কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের বাবা নয়; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি।’ সূরা আহজাব : ৪০

এই আয়াতের মাঝে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে—রাসূল ﷺ কোনো পুরুষের প্রকৃত পিতা হতে পারবেন না। দত্তক নেওয়ার মাধ্যমেও তা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি। সাধারণত তাঁকে যে পিতা বলে সম্বোধন করা হয়—তা রূপক, প্রকৃত পরিচয়ের কারণে নয়; বরং তিনি মর্যাদায়, অবস্থানে এবং ভালোবাসায় পিতার স্থানে। রাসূল ﷺ অধিকাংশ মানুষকেই ‘হে আমার ছেলে’ বলে সম্বোধন করতেন, যেমন : ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিককে এভাবেই ডাকতেন। তাঁরাও রাসূলকে ﷺ পিতা বলে ডাকতেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘নবি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের কাছের এবং উত্তম। তাঁর স্ত্রীরা হলেন তাদের মাতা।’ সূরা আহজাব : ৬

সাধারণত অনেক মানুষকে নবিজিকে পিতা বলতে দেখা যায়। রাসূল ﷺ সমস্ত মুমিনরই পিতা। কিন্তু এই পিতৃত্ব বংশগত নয় কিংবা দত্তকের পিতৃত্বও নয়; বরং তিনি মুমিনদের কল্যাণ চান, তাদের অধিকার ও সুরক্ষা কামনা করেন, তাদের ভালোবাসেন এবং দুআ করেন। রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ও জীবন ছিল এমনই। সেই বিবেচনায় তিনি সবার পিতা; বংশগত বিবেচনায় নয়। সূরা তাওবার আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে—

> ‘তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের থেকে একজন রাসূল এসেছে। তোমাদের যা কষ্ট দেয়, তা তাঁর জন্যও কষ্টকর।’ সূরা তাওবা : ১২৮

যে ব্যাপারটা তোমাদের কষ্ট দেয়, আহত করে, তা রাসূল ﷺ-এর জন্যও কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। কুরআনের আর এক জায়গায় আছে—

> 'তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী এবং মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র।' সূরা তাওবা : **১২৮**

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায়, রাসূল ﷺ কোনো ছেলে সন্তানের পিতা নন। তাই নবিজির একজন ছেলেও বাঁচেনি; বরং তারা সবাই বাল্যকালে মারা গেছেন। মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে রাসূল ﷺ-এর সন্তান ইবরাহিমের মৃত্যুর কথা তো বেশ বিখ্যাত। এভাবে নবিজির অন্য ছেলেরা যেমন : কাসিম, তায়্যিব, তাহেরও ছোটো বয়সেই মারা যান।

দত্তক প্রথা রহিতকরণ

জাহেলি যুগে দত্তক প্রথার বেশ প্রচলন ছিল। ইসলাম সেই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে। জাহেলি যুগে মানুষ বাচ্চা দত্তক নিয়ে লালন-পালন করত। সেই দত্তক-পুত্রকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করত। সে সন্তান তার পালক পিতার উত্তরাধিকারী হতো। আল্লাহর এই প্রথা রদ করে দেন। কুরআনে অবতীর্ণ করেন—

> 'তাদেরকে তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো, তাই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সংগত। যদি তাদের পিতৃ পরিচয় খুঁজে না পাও, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু।' সূরা আহজাব : ০৫

জায়েদ ইবনে হারিসা প্রথমে মক্কার লোকদের কাছে জায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই আয়াতের পরে জায়েদ ইবনে হারিসা নামেই পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর গভীর সম্পর্ক ছিল।

নবিজি তাঁর সাথে নিজের লালন-পালনকারী উম্মে আইমানকে বিয়ে দেন। তাঁদের সংসারে উসামা ইবনে জায়েদের জন্ম হয়। উসামা রাসূল ﷺ-এর খুবই প্রিয় ছিল। রাসূল ﷺ তাঁকে বাম উরুর ওপর বসাতেন আর হাসান-হোসাইনকে ডান উরুর ওপর বসাতেন। তারপর একসঙ্গে সবাইকে জড়িয়ে ধরতেন, আদর করতেন। এমনকী একবার বনু মাখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করে। কুরাইশরা এ নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে যায়। তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য একজন লোকের সন্ধান করছিল। পরে তারা উসামাকেই বেছে নিল। কারণ, উসামা রাসূল ﷺ-এর খুবই প্রিয়ভাজন ছিল। সে ছাড়া এমন স্পর্শকাতর ব্যাপারে নবিজির সাথে কথা বলার স্পর্ধা আর কার আছে!

মহান ভালোবাসা, অনুপম চরিত্র

জায়েদ ইবনে হারিসার ﵁-এর কথা ভাবলে একটা প্রশ্ন আপনাআপনিই চলে আসে, জায়েদ ইবনে হারিসা ﵁ রাসূল ﷺ-কে এতটা ভালোবাসতে গেলেন কেন? কেন রাসূল ﷺ-কে আপন বাবা-মা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-পরিজনের ওপর অগ্রাধিকার দিলেন? কোন জিনিস তাঁকে এই চিন্তার প্রতি ঠেলে দিলো, অথচ তখনও নবুয়ত আসেনি? কোন জাদুবলে তিনি রাসূলের কাছে থেকে গেলেন? মূলত নবিজির উত্তম চরিত্র-সুষমা ও অনুপম গুণাবলিই তাঁকে আটকে রেখেছিল। আর তাঁর ব্যাপারেই তো এমন কথা নাজিল হবে—'নিশ্চয় আপনি সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী।' এতে বিস্ময়ের কী আছে! নবিজি নবুয়তের সারকথা একবাক্যে বলেছেন— 'আমি উন্নত চরিত্র-সুষমার পূর্ণতা দিতে আবির্ভূত হয়েছি।' নবিজির মুখেই তো এমন কথা শোভা পায়!

নবিজির স্বভাবজাত গুণাবলি ও চরিত্র ছিল খুবই কোমল ও নিষ্কলুষ। এই শুভ্র ও নির্মল চরিত্রই সমস্ত মানুষের কাছে তাঁকে প্রিয় ও বিশ্বস্ত করে তোলে। শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করে। সবার প্রিয় ও আপনজন হয়ে যান; বরং মানুষ আপন মা-বাবাকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মুসলমানরা প্রতীক্ষায় বসে আছে। মক্কা থেকে উরওয়া ইবনে মাসউদ দূতিয়ালি করতে এলো। নবিজিকে দেখেই ফিরে গেল। মক্কায় গিয়ে বলল—'আমি অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গিয়েছি, রোম ও পারস্যের দরবার থেকে শুরু করে নাজ্জাসি পর্যন্ত সবার রাজদরবারে অতিথি হয়েছি, খোদার কসম! কোনো বাদশাকে তার রাজন্যবর্গরা অতটা সম্মান করে না, যতটা সম্মান মুহাম্মাদকে তাঁর সাথিরা করে।'

বদরের যুদ্ধে কিছু মুসলমান সম্মুখ সমরে অংশ নিতে অগ্রসর হলো। তাদের একজন ছিল উবাইদাহ ইবনুল হারেস ﵁। রাসূল ﷺ-এর সামনে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বীরদর্পে লড়ে যান। একসময় শত্রুর আঘাত তাঁর শরীরে এসে লাগে; তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। রাসূলের সামনে তাঁকে নিয়ে আসা হয়; রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। রাসূলকে দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'আমাকে যদি আবু তালিব দেখতেন, তবে তিনি স্বীকার করতেন, তাঁর উক্তি আমার ব্যাপারই প্রযোজ্য হয়—

> "তাঁকে তোমাদের হাতে অর্পণের আগে আমাদের লাশ পড়বে। আমাদের সন্তান ও স্ত্রী-পরিজনের কথা বিস্মৃত হব।"' আসাদুল গ-বা

নবিজির সামনেই তাঁদের শরীর থেকে রক্ত ঝরত। এতে তাঁদের কোনো আক্ষেপ ছিল না। ছিল না কোনো পরিতাপ; বরং তা তাঁরা খুশি মনেই মেনে নিতেন, গর্ব করতেন। নবিজির পায়ে সামান্য কাঁটার আঁচড় লাগুক—তা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি।

চরিত্রের মূলনীতি

নবি-ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য শোভাবর্ধনকারী দিক হলো—তাঁর অনুপম চরিত্র-সুষমা ও কোমল মানবিক আচরণ। রাসূল ﷺ জীবনে চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। সংগতি ও সচ্ছলতার সুখ যেমন পেয়েছেন, তেমনি দারিদ্র্য ও অনটনের নিদারুণ কষ্টও ভোগ করেছেন। শক্তি ও প্রতিপত্তির জোর যেমন দেখেছেন, তেমনি দুর্বলতা ও নিঃস্বতার অসহায় অবস্থাও সহ্য করেছেন। সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের জীবন যেমন উপভোগ করেছেন, তেমনি রোগ-শোকের যাতনাও সয়েছেন। প্রবাসের ঠিকানাহীন জীবনের তিক্ত স্বাদ যেমন পেয়েছেন, তেমনি ঠিকানা ও নীড়ের সুস্থিরতাও পেয়েছেন। সাধারণত একজন গড়পড়তা মানুষ জীবনের চলার পথে যত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, সবই নবিজি মোকাবিলা করেছেন। কিন্তু তাঁর উন্নত চরিত্র-সুষমা ও অনুপম গুণাবলি বদলায়নি। প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই তিনি অনুপম চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কখনোই তাঁর মহান গুণাবলিতে ভাটা পড়েনি।

নবিজি ছিলেন একজন দায়ি। আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। দাওয়াতের মাধ্যম ছিল তাঁর অনুপম চরিত্র। তাঁর অনুপম চরিত্রই মানুষকে ইসলামের পথে এনেছে, সাহাবাদের তাঁর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে উৎসাহী করেছে। তাঁর প্রভু তাঁকে বলেছেন—

> ‘আল্লাহর রহমত ও দয়ার কারণেই আপনি তাঁদের জন্য কোমল হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশ, শক্ত হৃদয়ের হতেন, তবে তাঁরা আপনার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত।’ সূরা আলে ইমরান : **১৫৯**

অনেকেই ভালো কথা বলতে পারে। কথা ও সংলাপের শিল্প তাদের ভালোই জানা আছে। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা, সঠিক-ভুল, ভালো-খারাপ ইত্যাদি বেশ গুছিয়ে সাবলীল ভাষায় বলতে পারে। এই ব্যাপারগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ দরকারি। কিন্তু তার চেয়ে যে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেশি, তা হলো—নীতি ও চরিত্র। নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র-সুষমাই মানুষের অত্যধিক প্রয়োজন। সমস্ত নবি এই কথাই বলেছেন। আসমানি কিতাবগুলো এর ওপর জোর দিয়েছে। শেষ আসমানি কিতাব হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আর কুরআন উন্নত চরিত্রের ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে।

চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা বই পড়ে হয় না। অথচ আমরা নৈতিক শিক্ষার বই হাতে ধরিয়ে দিয়েই দায়িত্ব আদায় করে ফেলি! নৈতিক শিক্ষার নানা দিক, নানা রূপ ও নানা প্রকার নিয়ে আলোচনা করছি। অথচ মূল ব্যাপার তা নয়। নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র-সুষমা কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নয় যে, মুখস্থ করেই পার পেয়ে যাব।

চরিত্র হলো শুদ্ধ জীবনাচারের বাস্তব প্রতিফলন ও বিরামহীন চর্চা। কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলনই মূল মানদণ্ড। বর্তমান সমাজ বাস্তব আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বাস্তব আদর্শের অভাবে মরছে আজকের মানবসমাজ। অনেক মানুষই সদাচারণ, বিশ্বস্ততা, অন্যের প্রতি সদয় আচরণ ইত্যাদি সদ্‌গুণের ওপর নানা বক্তব্য, লেকচার ইত্যাদি শোনে। কিন্তু দিনশেষে তারাই বলে—এগুলো অনেক সুন্দর ও মনোগ্রাহী কথা বটে, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনই শেষ কথা।

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে করে দেখাতে হয়। তখনই অন্যরা তার কথা শুনবে, প্রভাবিত হবে। নবিদের শ্রেষ্ঠ বক্তা শুয়াইব ﷺ বলেন—

> ‘আমি যে কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করি, তাতে তোমাদের ব্যতিক্রম করব না।’ সূরা হুদ : ৮৮

বারণ করা লোকটি

মানুষের হুমকি ও খোদায়ি হুংকার

বুখারি শরিফে এসেছে, আবু জাহেল বলল—'আচ্ছা, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে তাঁর চেহারা মাটিতে ছোঁয়ায় (সিজদা করে)? কেউ একজন বলল—'হুম, করে তো।' আবু জাহল বলল—'লাত ও উজ্জার কসম! আমি যদি তাঁকে এই কাজ করতে দেখি, তবে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করব এবং তাঁর চেহারা মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়াব।' তারপর সে রাসূল ﷺ-এর কাছে এলো। তখন তিনি নামাজ আদায় করছেন।

আবু জাহেল পরিকল্পানা মাফিক রাসূলের ঘাড়ে পা রাখতে গেল। কিন্তু মাঝপথেই সে থমকে গেল। পেছনে ফিরে এলো এবং হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল—'কী হলো, থমকে গেলে যে?' তখন আবু জাহেল জবাব দিলো—'তাঁর এবং আমার মাঝে বিশাল একটা আগুনের পরিখা দেখতে পেলাম, খুব ভয়াবহ কিছু ডানা দেখলাম!' পরে রাসূল ﷺ বলেন—'যদি সে আমার কাছের আসার চেষ্টা করত, তাহলে তাকে ফেরেশতারা টুকরো টুকরো করে ফেলত।' তিনি বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে। কারণ, সে নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। এটা নিশ্চিত, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে—যখন সে নামাজ পড়ে? আচ্ছা বলো তো, সে (অর্থাৎ নামাজ আদায়কারী) যদি হিদায়াতের ওপর থাকে অথবা তাকওয়ার আদেশ করে, তখন তাঁকে বাধা দেওয়া কি পথভ্রষ্টতা নয়? আচ্ছা বলো তো, সে (বাধাদানকারী—আবু জাহেল) যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন? খবরদার! সে নিবৃত্ত না হলে আমি তার মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব। সেই চুলগুচ্ছ—যা মিথ্যাচারী গুনাহগার। সুতরাং সে ডাকুক তার জলসা-সঙ্গীদের। আমিও ডাকব জাহান্নামের ফেরেশতাদের। সাবধান! তার আনুগত্য করো না; বরং সিজদা করো এবং নিকটবর্তী হও।' সূরা আলাক : **৬-১৯**

এই হাদিসে একটা ব্যাপার ধরা পড়ে—রাসূলের প্রতি আবু জাহেলের প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও অনাচার। রাসূলের চেহারা মাটিতে লাগা না লাগাতে তার কী আসে যায়? সে অবাধ্য, পাপাচারী ও স্বেচ্ছাচারী এক হৃদয়ের অধিকারী। সে কিছুতেই স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতাকে মেনে নিতে পারে না; সৌন্দর্যের সুকুমার রূপ তার ভালো লাগে না। তাই সে নবিজির ওপর হামলে পড়ে। তাঁকে সিজদা করতে দেখলে তার কদর্য পা দিয়ে তাঁর ঘাড় মাড়াতে চায়, নাউজুবিল্লাহ! রাসূল ﷺ নিরাপদ ও সুরক্ষিত, খোদায়ি সুরক্ষার জালে আচ্ছাদিত।

আল্লাহ মূলত আবু জাহেলকে পরীক্ষায় ফেলেছেন; সে পালিয়ে যায়, স্বজাতির সামনে লাঞ্ছিত ও হাসির পাত্রে পরিণত হয়। স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সে রাসূল ﷺ ও তার মাঝে বিশাল একটা আগুনের পরিখা দেখেছে, যার কাছে ঘেঁষলে সে তাতে পড়ে যেত এবং জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেত! কুরআনে এই ঘটনাটা স্থান পেয়েছে। কুরআনের বর্ণনার ধরন ও উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এক চরম বিস্ময়ের ব্যাপার লুকিয়ে আছে। কুরআন বলছে—

> 'তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে—যখন সে নামাজ পড়ে?' সূরা আলাক : ৯

এখানে নামাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, অথচ আবু জাহেল-ই উদ্দেশ্য। তারপরও তার নাম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলা মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং ব্যাপারটা সাধারণভাবে তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য।

নামাজই দাসত্ব

আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যে বান্দা নামাজ আদায় করে...' এখানে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দাসত্বের শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে এই ইঙ্গিত দেওয়া যে, দাসত্বই এক মহান গুণ। বান্দার জন্য তার স্রষ্টার প্রতি দাসত্বই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য। কারণ, আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর গড়ন ও আকৃতি দিয়েছেন এবং সর্বোপরি তাকে সুবিন্যস্ত ও সুশোভিতরূপে গড়েছেন। তাই ফুজাইল ইবনে ইয়াদ বলতেন—

> 'আমি যে আপনার কথা "ইয়া ইবাদি"র (হে আমার বান্দা!) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি এবং আহমদকে যে আমার নবি করেছেন, এতেই আমার সম্মান ও মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এমনকী আমি শূন্য উদরে ঊর্ধ্ব আকাশের তারা মাড়িয়ে যাই।'

আল্লাত তায়ালা বলেন—'বান্দা যখন নামাজ আদায় করে...' অর্থাৎ একজন মানুষ আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করার সময় তাকে কী করে নিষেধ করা হয়? অথচ পরিস্থিতির একটা দাবি থাকে—মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা। সেই দাবি অনুসারে তাকে তার রবের ইবাদত করতে দেওয়াই সংগত।

সে তো কোনো অন্যায় কাজ করেনি; নিরাপদে রবের ইবাদত করতে চেয়েছে মাত্র। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আচ্ছা বলো তো, সে (অর্থাৎ নামাজ আদায়কারী) যদি হিদায়াতের ওপর থাকে।' সংলাপের এই রীতিটাও অতি দারুণ ও চমকপ্রদ, বক্তব্য উপস্থাপন ও দলিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। আল্লাহ তায়ালা কিন্তু চাইলে এমনও বলতে পারতেন—'সে হিদায়াতের ওপর ছিল।' কিন্তু বলেননি; বরং বলেছেন—'যদি সে হিদায়াতের ওপর থাকে!' এতে করে হিদায়াতের ওপর থাকাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আচ্ছা একবার ভাবুন তো, যদি এমন দ্বিধাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে পড়তেন, তবে কি এমন আচরণ করা আপনার সাথে শোভনীয় হতো? এই পদ্ধতিতে তাঁর মুখোমুখি হওয়াও কি আপনার পক্ষে সম্ভব? কিংবা তাঁর অধিকার খর্ব করা? তারপরে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'অথবা তাকওয়ার আদেশ করে...(তখন তাঁকে বাধা দেওয়া কি পথভ্রষ্টতা নয়)' মানে তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি নির্দেশ দেওয়া ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

তারপর কুরআন বলছে—'আচ্ছা বলো তো, সে (বাধাদানকারী—আবু জাহেল) যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।' অর্থাৎ আবু জাহেল যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছে। পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—'তবে সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছে?'

আল্লাহ তায়ালা জানতেন, আবু জাহেল কুফুরি ও পথভ্রষ্টতা নিয়ে মারা যাবে। বদর প্রান্তরে খুব বিশ্রীভাবে নিহত হবে। কারণ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করে বেরিয়েছে। জনসম্মুখে গর্ব ও ঔদ্ধত্য, ভাব ও গৌরব নিয়ে বদর প্রান্তরে হাজির হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার নিহত হওয়ার স্থানও দেখিয়ে দিয়েছেন। আবু জাহেলের ঔদ্ধত্যের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়, সে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলেছে—'মেষের রাখাল! তুমি বেশ বেড়ে গেছ দেখছি!'

এই লোকের শেষ পরিণতি আল্লাহ জানতেন। তবুও কুরআনের ভাষার ব্যবহার কত উন্নত—'তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে—যখন সে নামাজ পড়ে?'

আল্লাহ এখানে তার নাম উল্লেখ করেননি। এর মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আভাস আছে—ইসলাম কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে দ্বান্দ্বিক অবস্থানে যায় না; বরং ইসলাম মানুষের মাঝে সুকুমারবৃত্তি, উন্নত মূল্যবোধ এবং মানুষের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন দৃঢ় করে।

দ্বীনের কাজ উৎপীড়ন নয়

এই প্রসঙ্গে দ্বীনের এই উন্নত বোধ ও চিন্তার কথাও আমরা পড়ে নিতে পারি। দাওয়াতের ময়দানে নবিজির নানা পরিস্থিতির কথা তো আমরা জানিই। স্বজাতির কাছে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে গিয়ে

তাঁর বিভিন্ন অবস্থাও আমাদের কাছে অবিধিত নয়। দাওয়াতবিরোধী চক্র ও কাফিরদের কাছে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন তিনি। অথচ তিনি ভেঙে পড়েননি। ধৈর্য ও অবিচলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। মুমিনদের সাথে সর্বোচ্চ সহনশীল আচরণ করেছেন এবং ইসলামের আঙিনায় উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে বরণ করেছেন।

অবশ্য কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করত, তার সম্মানে কোনো জলসা কিংবা আয়োজন-অনুষ্ঠানের কথা কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়নি; বরং রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—যখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কায় তাঁদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি, মানুষের কাছে পাওয়া ঋণ ইত্যাদি বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা শুধু আল্লাহ ও রাসূলের পথে হিজরত করেছেন। তাঁদের রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি কাফিররা ভোগ-দখল করে। রাসূল ﷺ এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেন, তাঁরা সেগুলো আল্লাহ ও রাসূলের জন্য ত্যাগ করে এসেছে। যখন আল্লাহ তাঁদের দিয়ে মক্কা বিজয় করলেন, বিজয়ীর বেশে যখন তাঁরা মক্কায় ফিরে এলেন, মুশরিকদের কাছ থেকে কোনো সম্পদ কেড়ে নেননি; এমনকী অতীতে ঘটা কোনো কিছুর জন্য কোনো জবাবদিহি করেননি।

বেশ সুন্দর ও অর্থপূর্ণ প্রবাদ আছে—'পলায়নপর শত্রুর জন্য একটা সেতু নির্মাণ করে দাও।' অর্থাৎ শত্রু যদি তোমার থেকে পালায়, তবে তাকে পালাতে দাও, বাধা দিয়ো না। পারলে তাকে পালাতে সহযোগিতা করো; এমনকী সেতু তৈরি করে হলেও। জীবনের সবটা স্বচ্ছতায় ভরা নয়। তাই কখনো ক্ষমা করতে হয়, চোখ ফিরিয়ে রাখতে হয়—যেন দেখেননি। কখনো সহনশীল ও সহিষ্ণু হতে হয়। জীবনে এই মূল্যোবোধ ধারণ করেই মানুষের সমাজে থাকা উচিত। সহাবস্থানপূর্ণ সুন্দর সমাজের জন্য এই মূল্যবোধের কোনো বিকল্প নেই। দ্বীনের কাজ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করা, উৎপীড়ন চালানো নয়। দ্বীন মানেই কল্যাণকামিতা। মানুষের মর্যাদা ও মানবিকতার শেষ আশ্রয়ের নাম হলো দ্বীন। শুধু তা-ই নয়, দ্বীনই সম্মান ও মর্যাদা, মুক্তি ও স্বাধীনতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার একমাত্র রক্ষাকবচ—এই বোধ ও চিন্তা লালন করা উচিত।

মানুষের জীবিকা ও মর্যাদার নিশ্চয়তা

মক্কা বিজিত হয়েছে। মক্কার অলি-গলিতে এখন ইসলামের হেলালি পতাকা পতপত করে উড়ছে। রাসূল ﷺ ঘোষণা করলেন—

> 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে অস্ত্র ফেলে দেবে, সে নিরাপদ। যে আপন ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।' সহিহ মুসলিম : ১৭৮০

আবু সুফিয়ানের ঘর তো ছোটো। মক্কার এত মানুষের ধারণক্ষমতা কি ওই এক চিলতে ঘরে সম্ভব? তাতে মাত্র গুটিকয়েক মানুষই তো প্রবেশ করতে পারবে। রাসূল ﷺ তাদের মুক্তির পরিসর ও সুযোগ বিস্তৃত করে দেন। তারা চাইলে দরজা বন্ধ করে নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে পারবে, মসজিদে হারামে এসে অবস্থান করতে পারবে। আর আবু সুফিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রচ্ছন্নভাবে ইসলামের জন্য তাঁর মনকে প্রস্তুত করা, উৎসাহ জোগানো, যেন সে কিছুতেই এমন না ভাবে, ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মান-মর্যাদা ছোটো হয়ে যাবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাবে, অবস্থান ফিকে হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবার এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা উচিত—আল্লাহর দ্বীন কখনোই মানুষের অর্জিত সফলতা খর্ব করে না। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া মানে কিছুতেই অর্জিত সফলতা ও প্রাপ্তি বিসর্জন দেওয়া নয়।

কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়—'এই লোকটা ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে ছিল, পরে সেখান থেকে ফিরে এসেছে। তাই তার উচিত জনসম্মুখে তওবা করা এবং দ্বীনের আশ্রয়ে ফিরে আসা।'

এখানে একটা প্রশ্ন এসেই যায়, কেন সে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে যাবে যে, সে ভুলের মধ্যে ছিল; এখন তা ছেড়ে দ্বীনের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। যদি কোনো পথভোলা মানুষকে আল্লাহ হিদায়াত দেন এবং সে সত্যিকার মুমিন হয়, ঈমানের পথে মানুষকে ডাকে, ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাস মনের মধ্যে লালন করে, এতটুকুই কি যথেষ্ট নয়? মানুষের ইসলামের দীক্ষিত হওয়ার পথে উটকো ও অযাচিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কি শুভবুদ্ধির পরিচায়ক? রাসূলের নির্দেশিত পথে আসার ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর দাঁড় করা কি অন্যায় নয়? রাসূল ﷺ মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে পাঠান। যাওয়ার সময় তাঁকে বলেন—'তুমি যাদের কাছে যাচ্ছো, তারা আহলে কিতাব (ইহুদি, খ্রিষ্টান)। তাই তাদের প্রথমে এই মর্মে দাওয়াত দেবে—আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। তারা যদি এই বাণী স্বীকার ও বিশ্বাস করে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে, আল্লাহ দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এটাও যদি তারা মেনে নেয়, তারপর জাকাতের ব্যাপারটা খোলাসা করবে—যা তাদের ধনী থেকে গরিব ও অসহায় মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হবে।'

ধীর গতিতে দাওয়াত

মুয়াজ رضي الله عنه ও রাসূলের কথার মাঝে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়—দাওয়াতের ধরন ও কৌশল। রাসূল ﷺ মুয়াজকে ইয়েমেনে দাওয়াতের স্তর ও পর্যায় শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল বলছেন—'ইয়ামেনের লোকেরা আহলে কিতাব। তারা হয় ইহুদি, নয় খ্রিষ্টান। তাদের কাছে পূর্বের আসমানি কিতাব আছে।

তাই প্রথমে তাদের আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেবে। ঈমানের ছায়াতলে যদি তারা চলে আসে, তারপর নামাজের দাওয়াত দেবে এবং পরে জাকাতের কথা বলবে।' এই ছিল রাসূল ﷺ-এর শেখানো দাওয়াতের রীতি ও কৌশল। কারণ, মানুষকে শরিয়াহর সমস্ত বিধিবিধান, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণ যদি একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তা কিছুতেই ক্রিয়াশীল ও ফলপ্রসূ হবে না এবং মানুষ তা গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে না।

তাই আমাদের উচিত মানুষের কাছে ধীরে ধীরে ইসলামের দরজা উন্মোচন করা। মানুষের কাছে সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামকে পেশ করা দরকার, যেন সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিছুতেই মানুষের সামনে প্রতিবন্ধকতা ও বাধার প্রাচীর দাঁড় করানো উচিত নয়। অথচ আমরা অনেকেই জেনে বা না জেনে এমন গর্হিত কাজ করছি!

মুসলমানের ফরজ কাজ

রাসূলের আবির্ভাবের পূর্বে

মানব-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্ত, শুভক্ষণ। এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকবে। ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে ইতিহাসে এই মাহেন্দ্রক্ষণ—নবুয়তের মুহূর্ত।

নবুয়তের পূর্বে নবিজি প্রতিবছরই হেরা গুহায় যেতেন। মানব সমাজের কোলাহল ও কর্মময় জগতের ব্যস্ততা থেকে পাহাড়ের নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন। একটানা বেশ কয়েক দিন সেখানে থাকতেন। সাথে প্রয়োজনীয় পাথেয় নিয়ে যেতেন। দীর্ঘ রাত ধরে ইবাদতে মগ্ন হতেন। হৃদয়ের বোঝা ও অন্তরের পঙ্কিলতা দূর করতেন। তারপর ঘরে ফিরতেন।

জাহেলি যুগে, তমসাচ্ছন্ন কালের বুকে হেঁটে চলেছেন এক মহান নবি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন এবং জাহেলি যুগের সব ধরনের কদর্যতা ও পঙ্কিলতা থেকে দূরে রাখেন। সেই সময় দশটা সাধারণ মানুষ যে কাজে জড়াত, নবিজি কখনোই তেমন কোনো কাজে নিজেকে জড়াননি। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি কখনোই কোনো মূর্তি-প্রতিমা স্পর্শ করেননি। মূর্তির চারপাশে চক্কর দেননি। মূর্তির জন্য কোনো কিছু নিবেদন করেননি; কোনো পশু জবাই করেননি। ক্রীড়াকর্মে যোগ দেননি। সাধারণত মক্কার আর দশটা তরুণ যে ক্রীড়াকর্মে লিপ্ত হতো, নবিজি ছিলেন তা থেকে যোজন যোজন দূরে। অনেকেই রাত জেগে ফুর্তি করত, নবিজি কখনোই তাদের সঙ্গে যোগ দেননি।

রাসূল ﷺ ছিলেন স্নিগ্ধ, কোমল, পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তাঁর জীবনের কোথাও কোনো কালিমা ছিল না। তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি স্বচ্ছ ও সুন্দর। কোনো প্রকার বক্রতা তাঁর মধ্যে ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত রেখে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছেন। রাসূল ﷺ 'উলুহিয়্যা'র অর্থ পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছেন। মানুষের থেকে দূরে নির্জনে একাকিত্বে থাকতেন, অনেকটা এতেকাফের মতোই। অনেক রাত হেরা গুহায় কাটাতেন। আল্লাহর ইবাদত করতেন। নামাজ ও জিকিরে মশগুল থাকতেন। তওবা ও ইসতেগফার করতেন। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর ইবাদতে কিছু সময় পার করে ফিরে আসতেন।

রাসূল ﷺ বেশ আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে হেরা গুহায় গমন করতেন। মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন। প্রভুর কাছে মিনতিভরা কণ্ঠে মোনাজাত করতেন। হৃদয়ের কদর্যতা ও পঙ্কিলতা পরিষ্কার করতেন। জীবনের ঝুট-ঝামেলা থেকে নিজেকে দূর রাখতেন। পৌত্তলিক মক্কার প্রতিমা পূজা তাঁর ভালো লাগত না। মূর্তিতে ঠাঁসা কাবা ঘরে তিনি শান্তি পেতেন না। সর্বোপরি সমগ্র মক্কায় যে নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং পৌত্তলিকতায় পুঁথিগন্ধময় রীতিনীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছিল—তা তাঁর নিষ্কলুষ হৃদয়কে আহত করত। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই তিনি মানুষের সাহচর্যকে ভয় পেতেন, পারতপক্ষে তাদের এড়িয়ে চলতেন। লোকালয়ের বাইরে চলে যেতেন। ইবাদত ও ধ্যানে মগ্ন হতেন। কোলাহলমুক্ত নীরব ও নিস্তব্ধ হেরা গুহার শান্ত পরিবেশে নিজেকে মেলে ধরতেন।

আকস্মিক সংবাদ

একদিন রাসূল ﷺ হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। চারপাশ সম্পর্কে তাঁর কোনো খরব নেই। গভীর আচ্ছন্নতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। এমন সময় হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্নতায় ছেদ পড়ে। চোখে মেলে দেখে তাঁর সামনে একটা বিকট চেহারার লোক। এই চেহারা সাধারণ মানুষের নয়। নিশ্চয় তিনি সম্মানিত ফেরেশতা। প্রথম দেখাতে নবিজি তাঁকে চিনতে পারেননি। রাসূল ﷺ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে বললেন—'আপনি পড়ুন।' রাসূল ﷺ জবাব দিলেন—'আমি তো পড়তে জানি না।'

রাসূল ﷺ 'উম্মি' নবি ছিলেন। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। এ ছিল মহান আল্লাহর এক প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তিনি নবিজিকে রক্ষা করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, মুশরিকরা তাঁকে নানা অপবাদ দেবে, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করবে। তাই আল্লাহ তাঁর নবিকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে মুক্ত রেখেছেন; উম্মি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব পড়োনি এবং নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখওনি। সে রকম কিছু হলে ভ্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত।' সূরা আনকাবুত : ৪৮

রাসূল ﷺ যখন বললেন—'আমি পড়তে জানি না।' অর্থাৎ আমি ভালো পড়তে পারি না। তখন জিবরাইল রাসূল ﷺ -কে জড়িয়ে ধরলেন। বুকের সাথে জোরে চাপ দিলেন। সেই চাপে রাসূল ﷺ-এর ক্লান্তি চলে আসে। তারপর রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে দেন। তারপর আবার তাঁকে বললেন—'পড়ুন।' রাসূল ﷺ পুনরায় একই জবাব দিলেন—'আমি পড়তে জানি না।' তৃতীয়বারও তেমন করলেন। তারপর জিবরাইল রাসূল ﷺ-কে বললেন—

> ‘পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত দ্বারা। পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব; যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন—যা সে জানত না।’ সূরা আলাক : **১-৫**

রাসূল ﷺ আয়াতগুলো পড়লেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা ﵂-এর কাছে গেলেন।

রাসূল ﷺ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ফিরে এলেন। তিনি বললেন—‘আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।’ তাঁকে বস্ত্রাবৃত করা হলো। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ভয় কেটে যায়। সুস্থির ও স্বাভাবিক হওয়ার পর খাদিজা ﵂-কে গোটা ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন—‘আমি আমার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।’ খাদিজা ﵂ এবার আরও ভালো করে তাঁর শরীর বস্ত্রাবৃত করে দেন এবং কোমল কণ্ঠে আশার বাণী শোনান—

> ‘খোদার কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অন্যের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের মুখে আহার তুলে দেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং সর্বোপরি বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান।’ সহিহ বুখারি : **৪**

প্রথম নির্দেশ : পড়ো

এখানে অনায়াসেই একটা প্রশ্ন চলে আসে। আসমানি একটা ‘মেসেজ’—বার্তা ‘পড়ো’ শব্দ দিয়ে শুরু করতে হবে কেন? আকাশ থেকে রাসূলের ওপর নেমে আসা প্রথম নির্দেশনাই হলো পড়ার, অধ্যয়নের। এই কথার সূত্র ধরে অনেক আলিম বলেন, ‘শরিয়াহর মুকাল্লাফদের—যাদের ওপর শরিয়াহর বিধান ফরজ হয়েছে, তাদের প্রধান কর্তব্য ইলম শেখা এবং জ্ঞান অর্জন করা। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘সুতরাং (হে রাসূল!) নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মুসলিম নর-নারীর জন্যও।’ সূরা মুহাম্মাদ : **১৯**

কারণ, সমগ্র জীবনের শুদ্ধি নির্ভর করে আছে জ্ঞানের ওপর। আমরা এমন এক জাতি—যার উত্থান ও জাগরণের ভিত্তিই হলো ইলমের আলো ও জ্ঞানের দ্যোতি। ইলমই ইবাদতের মূলভিত্তি, আমল ও ব্যাবসার প্রকৃত বুনিয়াদ, জিহাদ ও রাজনীতির মূল স্তম্ভ এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের এক বিশাল সেতুবন্ধন; বরং বলা চলে, জ্ঞানই সকল ক্ষেত্রের মূল চালিকাশক্তি।

আমার আশ্চর্যের সীমা সপ্তমে ঠেকে। এই সহজ ও মহা তাৎপর্যবাহী কথার নিগূঢ়ার্থ ভেবে থমকে যাই। কারণ, যে জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল 'ইকরা' দিয়ে, সে জাতি আজ কাফেলার পেছনে পড়ে রয়েছে। জ্ঞান ও জ্ঞানের অর্জনে আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সূচকে বিশ্বের পশ্চাদতম জাতিতে পরিণত হয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের এই আধুনিক যুগে যখন প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হচ্ছি, নিত্যনতুন 'আইড়িয়া' ও 'ফর্মুলা' পাচ্ছি, তখন আমরা যুগের বিভিন্ন সূচকের সর্বশেষ প্রান্তে পড়ে আছি। অথচ পাশ্চাত্য দুনিয়া জ্ঞান ও আবিষ্কারের ওপর ভর করে অগ্রগতি ও উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে। তারা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুনিয়ার ওপর রাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ যে জাতির পথচলা শুরু হয়েছিল 'ইকরা' দিয়ে, সে জাতি এখনও সূচকের পেছনে।

একটা ব্যাপার বেশ চোখে লাগে। ইউরোপ কি জাপান যেখানেই হোক, বাস বা ট্রেনের অপেক্ষারত যাত্রীকে দেখা যাবে—একটা বই বগলদাবা করে রেখেছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করার সময় হাতে দুই-তিনশো পৃষ্ঠার একটা বই। সারা পথে বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে বসে থাকে। অথচ 'ইকরা' জাতির কোথাও এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না! ব্যাপারটা চিন্তা করলে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়।

আমি প্রায়শই নিজেকে এবং অন্যদের একটা প্রশ্ন করি—আচ্ছা যে জাতির কাছে পড়তে উৎসাহ জোগায় এমন কোনো ঐশী বাণী নেই, নেই কোনো খোদায়ি ফরমান, সেই জাতি কী করে অগ্রগতিতে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়? অথচ আমাদের প্রভু তাঁর কিতাবে আমাদের ডাক দিয়ে যায়, 'পড়ো'। খোদায়ি ফরমানের প্রথম বাণী 'পড়ো'। তারপরও আমরা পাঠবিমুখ, অধ্যয়নে চরম অনীহা ও উদাসীনতা। খোদায়ি নির্দেশ ও পবিত্র বাণীর কোনো মূল্যই আমাদের কাছে নেই। ফলে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত পথহারা পথিকে পরিণত হয়েছি।

জ্ঞান অর্জন ফরজ

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অর্জন ফরজ।' সুনানে বায়হাকি : ১০৩৭

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়—রাসূল ﷺ কিন্তু বলেননি যে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর। কারণ, মুসলিম শব্দটা স্বাভাবিকভাবে নারী-পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। বিধিবিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার ভেদাভেদ নেই। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপরই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার কাছে কুরআনের মতো কোনো ঐশী কিতাব নেই, যার প্রথম নির্দেশই হলো পড়ো। কিন্তু তারা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝেছে, জীবনের জন্য জ্ঞান অর্জন খুবই প্রয়োজনীয় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা পড়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর কাছে আসমানি কিতাব আছে—যা পড়ার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। তবুও তারা অজ্ঞতার তীরহারা ঢেউয়ের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। জ্ঞান-রাজ্যের সীমা থেকে তাদের অবস্থান যোজন যোজন দূরে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ প্রদান এখানেই শেষ নয়। আপনি অবাক হয়ে যাবেন, রাসূল ﷺ বলছেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা রোগ যেমন দিয়েছেন, তেমনি আরোগ্যের পথ্যও দিয়েছেন। যে জেনেছে সে তো জেনেছেই। আর যে জানেনি, সে অজানাই রয়ে গেল।' সুনানে নাসায়ি : ১৯৪

অন্য এক বর্ণনায় আছে—

> 'রোগের পথ্য যদি খোঁজা হয়, আল্লাহর রহমতে খুব সহজেই মিলে যায়।' সহিহ মুসলিম : ২২০৪

এই হাদিস মানুষকে একটা বার্তা দিয়ে যায়, প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। এমন কোনো রোগ নেই—যার চিকিৎসা নেই। এমনকী এখনও যে রোগগুলো দুরারোগ্য ব্যাধি বলা হচ্ছে; যার কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা ও পথ্য নেই, হাদিসের ভাষ্যমতে তারও চিকিৎসা ও পথ্য আছে। কিন্তু মানুষ কখন তা উদ্‌ঘাটন করতে পারবে?

আমার বিশ্বাস, হাদিসের এই উক্তিগুলোর মাধ্যমে রাসূল ﷺ প্রচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। রোগের সঠিক ওষুধ ও পথ্য খুঁজে বের করার নির্দেশনা দিয়েছেন। জীবনের চলার পথে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু আবিষ্কারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

শুধুই চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়; বরং দুনিয়ার সব ধরনের জ্ঞান ও প্রকৃতির নিয়ম জানার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই আল্লাহ আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য আমাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা কোথায়? আজ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান কতটুকু? কেন জ্ঞান পশ্চিমাদের হাতে কুক্ষিগত? মুসলমানরাই-বা কেন জ্ঞানরাজ্যের অনিন্দ্য ভুবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? এ কথা কি বলা যাবে—পশ্চিমারা জ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করছে?

এই কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ধরে নিলাম পশ্চিমারা আমাদের বঞ্চিত করেছে, কিন্তু আমরা তো তা অর্জন করতে পারি। জাপানের কথা মনে আছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসা বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর দেশ। হাজারো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে জ্ঞান ও উন্নতির চরম শেখরে আজ জাপানের অবস্থান; এমনকী পৃথিবীর বড়ো বড়ো

শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর সাথে পাল্লা দিচ্ছে। অথচ সম্ভব হলে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির এই উন্নতিকে মুহূর্তেই মিশিয়ে দিত। মূল ব্যাপার হলো যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> ‘বলো, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে।’ সূরা আলে ইমরান : ১৬৫

জ্ঞান অর্জনে যখন আমরা দৃঢ় ইচ্ছা ও মনোবল নিয়ে মাঠে নামব, খোদার প্রথম নির্দেশ (পড়ো) সামনে রেখে পথ চলব, তখন অচিরেই আমরা জ্ঞানরাজ্যের সর্বোচ্চ শেখরে আরোহণ করব, ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞানের পথে

বিশ্বাসের জ্ঞান

'পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।' সূরা আলাক : ০১

এই ছিল রাসূল ﷺ-এর কানে ঊর্ধ্ব জগতের প্রথম আহ্বান। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, আল্লাহ যখন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তার সাথে আরও একটা বিষয় জুড়ে দিয়েছেন—'তোমার প্রতিপালকের নামে।'

একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, যে ইলমের দিকে আল্লাহ আমাদের আহ্বান করছেন, তা কোনো বস্তুগত ইলম বা জ্ঞান নয়। এমন জ্ঞানও নয়—যা মানুষের মাঝে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতা সৃষ্টি করে। এমন জ্ঞানও নয়—যা মানুষের জীবন বিনষ্ট করে দেয় কিংবা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, জীবনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবার এমন জ্ঞানও নয়—যা মানুষের জীবন বিধ্বংসী অস্ত্র-সরঞ্জাম ও বোমা তৈরি ও আবিষ্কারে উৎসাহ জোগায়। হতে পারে সেগুলো কিছু ভবন, স্থাপনা ইত্যাদির সুরাক্ষা দিতে পারে—তবে তা মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। আর মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার সেবায় দুনিয়ার সবকিছু নিবেদিত। তাই মানুষের জীবনের হুমকি হয় এমন কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। সবকিছু মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়েসের জন্যই করা উচিত; ধ্বংস ও বিনাশের জন্য নয়।

শরিয়াহসংক্রান্ত ও দ্বীনি জ্ঞান মানুষের জীবন সুন্দর, অর্থবহ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও খোদার নিকটবর্তী করে। এমন অনেক মানুষকে দেখা যায়, যারা প্রচুর জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও আসমানের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। এমনটা হলে সেই ব্যক্তি কী করে আকাশে পৌঁছবে? পৃথিবীতে আসার পথের সন্ধান না জানলে চাঁদে পা রাখবে কী করে? আজ মানুষ নিজ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আত্মহত্যার সূচক ইতিহাসের সর্বোচ্চ মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর ও উন্নত দেশেও হতাশা ও অবসাদগ্রস্ত মানুষের ছড়াছড়ি। মাথাপিছু আয়, জীবনমান এবং অর্থনৈতিক সূচকে সর্বোচ্চ অগ্রসর দেশেও এই চিত্র অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

জ্ঞান যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, তখন তা হবে মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। দুনিয়াবি ব্যাপারে যেমন কার্যকর হবে, তেমনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে। জ্ঞান অর্জন করা কিছুতেই আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা নয়, যেমনটা প্রাচীন গ্রিসের পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস করা হতো। তারা বিশ্বাস করত, সৃষ্টিকর্তা সব জ্ঞান নিজের মাঝে কুক্ষিগত করে রেখেছে আর মানুষকে তার থেকে বঞ্চিত করেছে। মানুষ চাইলে জ্ঞানের এই রাজ্যে হানা দিতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তাই জ্ঞান অর্জন করাকে খোদার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা মনে করা হতো। অথচ ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। আমাদের মহান রব মানুষকে জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাড়না জুগিয়েছেন।

বুদ্ধির কাজ ও দায়িত্ব

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অজ্ঞ অবস্থায়। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না।’ সূরা নাহল : ৭৮

মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে বের হয় অজ্ঞ অবস্থায়, শূন্য মস্তিষ্কে। কিন্তু তাকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আবিষ্কারের শক্তি দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর অনুভূতি শক্তি দেওয়া হয়েছে, যা ওহিরূপে আসা খোদায়ি জ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে। এবং ওহিই জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও ঝরনাধারা।

বুদ্ধি মানুষকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু তাকে উলুহিয়্যাহ বা আল্লাহসংক্রান্ত ব্যাপার, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, বান্দার ওপর তাঁর হক বা অধিকার যেমন : নামাজ পড়া, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া, হজ করা ইত্যাদি বিস্তারিত জানায় না। বুদ্ধি ওহির মাধ্যমে নবি ও রাসূলগণের নিয়ে আসা ব্যাপারগুলোর সত্যতা, প্রমাণ ও দলিল পায়, তাঁদের রিসালাতের অকাট্যতা উপলব্ধি করতে পারে। এ ছাড়াও নিজের প্রখর অনুভূতি দিয়ে জগৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে, তা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং সঠিক পন্থায় তার ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া চিন্তা, গবেষণা, বিশ্লেষণ, নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অজ্ঞ অবস্থায়। তাকে চোখ দিয়েছেন, শোনার জন্য কান দিয়ে দিয়েছেন, বোধ ও উপলব্ধির জন্য হৃদয় দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত দ্বারা।’ সূরা আলাক : ১-২

‘পড়া’র দ্বিরুক্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব; যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন—যা সে জানত না।’ সূরা আলাক : ৩-৫

এখানে আল্লাহ তায়ালা পড়ার কথা আবারও উল্লেখ করেছেন। এর কিছু কারণ ও উদ্দেশ্য আছে—

প্রথম : কেউ যেন এমন চিন্তা না করে, পড়াশোনার একটা স্তর ও পর্যায় আছে। নির্দিষ্ট সময় পেরোলেই পাঠের সময় শেষ হয়ে যায়। কারণ, এমন কিছু ছাত্র আছে যারা কিছু দূর পড়াশোনার করার পর ভাবে, এখন আমরা জ্ঞানের একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে গেছি; আর না পড়লেও চলবে। অথচ জ্ঞান এক বিরামহীন কর্মযজ্ঞের নাম। একজন মানুষের প্রতিমুহূর্তেই জানার জগৎ ও পরিধিকে বাড়ানো উচিত। সেইসঙ্গে তার অর্জিত জ্ঞানকে সময়ের সাথে সাথে নতুনরূপে জানা উচিত। অর্থাৎ এককথায় তাকে ‘আপডেট’ থাকতে হবে। কারণ, প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য ও চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে, নতুন নতুন বই লেখা হচ্ছে। নতুন নতুন মতাদর্শ ও দর্শনের আবির্ভাব হচ্ছে—যা মানুষের জানা উচিত এবং এর ভালো ও খারাপ দিক, উপকারী ও ক্ষতিকর দিক বোঝা উচিত। জ্ঞান অর্জনে শেষ বলে কোনো কথা নেই। এখানে আল্লাহর বাণী মনে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে বলেন—

> ‘মৃত্যু পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।’ সূরা হাজর : ৯৯

জ্ঞান অর্জন মানেই ইবাদত; বরং তা বড়ো ইবাদত। এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—

> ‘যার নিয়্যাত পরিশুদ্ধ, তার জন্য জ্ঞান অর্জন নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।’

ইমাম আহমদ (রহ.) তখন বেশ বুড়িয়ে গেছেন। ছাত্রদের পড়ানোর সময় হাঁটাহাঁটি করতেন। হাতে সর্বদা একটা কলম ও খাতা রাখতেন, নতুন কিছু পেলেই টুকে রাখতেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল—‘শেষ বয়সে এসেও কি এমনটা করতে হয়?’ তিনি জবাব দিলেন—‘দোলনা থেকে একেবারে কবর পর্যন্ত।’

তাঁদের কাছে জ্ঞান অর্জনের ধরাবাঁধা সময় ছিল না; বরং জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। ইমাম আহমদ (রহ.) যেমনটা বলেছেন—‘দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।’ বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি মানে যে পাঠ চুকিয়ে ফেলার একটা ধারণা প্রচলিত আছে—তা মারাত্মক। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব; যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।’

দ্বিতীয় : একাধিকবার পাঠের প্রতি জোর দেওয়ার মাঝে একটা বার্তা আছে। সাধারণত মানুষ প্রথমবার পড়ে কোনো কিছু বুঝতে ও আত্মস্থ করতে পারে না। বারবার পড়তে হয়। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন—'একবার করে তিনটা বই পড়ার চেয়ে একটা বই তিনবার পড়া উত্তম।' আর কিছু কিছু জ্ঞান আছে যা বারবার পড়তে হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আবারও দৃষ্টিপাত করে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?' অতঃপর বারবার দৃষ্টিপাত করো। দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।' সূরা মুলক : ৩-৪

বারবার পড়লে ও শুনলে যেকোনো বিষয় অন্তরে বদ্ধমূল হয়।

তৃতীয় : একাধিকবার পড়তে নির্দেশ দেওয়ার আরও একটা কারণ আছে; প্রথম পাঠ নিজের জন্য আর দ্বিতীয় পাঠ মানুষের জন্য। অর্থাৎ প্রথমবার নিজের বোঝার জন্য, পরেরবার অন্যকে বোঝানো ও শেখানোর জন্য। মুসলিমরা আত্মকেন্দ্রিক কিংবা অন্তর্মুখী নয়। সে শুধু নিজের জন্যই শেখে না; বরং অর্জিত জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার তার কাজ। তাই কুরআনে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ এসেছে—

> 'তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে।' সূরা নাহল : ১২৫

এই আয়াতের মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন আভাস আছে, তা হলো—অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। তাদের মাঝে ঈমানের আলো জ্বালাতে হবে এবং জ্ঞানের দ্যোতি ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই সাহাবাগণ সবাই ছিলেন এক একজন আলোকবর্তিকা। তাদের কেউ আপন শহরে বসে স্থির থাকেননি; বরং ছড়িয়ে পড়েছেন পৃথিবীর আনাচে-কানাছে। তাই তো তুর্কিতে, ইরাকে, সিরিয়া, লেবাননে, ফিলিস্তিনে, মিশরে এবং মুসলিম বিশ্বের শেষ প্রান্তেও তাঁদের কবর পাওয়া যায়!

সুতরাং একাধিকবার পাঠের নির্দেশের মূল রহস্য হলো—মানুষ প্রথমে নিজের জন্য পড়বে, পরে অন্যের কাছে ছড়িয়ে দেবে।

ইলম ও ঈমান

মুসলমানদের উচিত এই সূরার মূল মর্ম ও ভাব উপলব্ধি করা। এর চিন্তা ও চেতনা হৃদয়ে ধারণ করা। কিছুতেই এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বোধ ও চিন্তাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। নিজেকে প্রশ্ন করা, আর কতকাল কুরআনের এই বোধ ও চেতনাকে নিচক হেঁয়ালি কথা ভেবে যাব? কখন এই গভীর অর্থবহ বাণীগুলো কাজের প্রান্তরে দেখা যাবে? পাঠের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের কখন বুঝে আসবে?

আমাদের প্রত্যেকেরই শেখা উচিত। আমাদের শিশুদের একেবারে ছোটোবেলা থেকে পাঠমনস্ক করে গড়ে তোলা দরকার। যে বাচ্চা ছোটোবেলা থেকেই মাকে বই হাতে তার সঙ্গে খেলতে দেখে কিংবা বাবাকে পড়তে দেখে অভ্যস্ত হয়েছে, এই দৃশ্য বাচ্চার ভবিষ্যতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। অথচ বইয়ের সঙ্গে আমাদের একটা বৈরী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা জ্ঞান নিয়ে অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু পড়াশোনা করি না এক বিন্দু! সুতরাং—

> ‘হে মুসলিম নারী-পুরুষ! পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব; যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন—যা সে জানত না।’ সূরা আলাক : **১-৫**

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায় হলো পড়া, পড়া ও পড়া। এই সূরা শেষ হয়েছে—

> ‘সাবধান! তার আনুগত্য করো না এবং সিজদা করো ও নিকটবর্তী হও।’ সূরা আলাক : **১৯**

জ্ঞান ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইলম ইবাদতের পথের সন্ধান দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি আনে, জান্নাতের পথ সুগম করে। যথার্থ জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি ছাড়া আমরা কিছুতেই নিজেদের দুনিয়া গড়ে নিতে পারব না, আখিরাত নির্মাণ করতে পারব না। তাই প্রথমেই আমাদের জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। তবেই আমরা সুন্দর বসুন্ধরা গড়তে পারব, জান্নাতের সন্ধান পাব।

মুখ সামলে রাখুন

অবরোধ ও নির্যাতনের করুণ দৃশ্য

পবিত্র ভূমি মক্কার বরকতময় মাটিতে রাসূল ﷺ প্রথম মহান আসমানি দাওয়াতের রূপরেখা আঁকেন। এই নিরাপদ পবিত্র নগরী থেকে উৎসারিত নুর ও ঈমানের দীপ্তিমান মশালের ভিত্তি অনুপম চরিত্র ও সুউচ্চ মূল্যবোধ। যদি দৈববলে আপনি কালের সীমা-পরিসীমা পেরোতে পারেন এবং চোদ্দোশো বছরের পূর্বে কাবার ঘরের চারপাশের দৃশ্য দেখার দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, তাহলে দেখবেন—রাসূল ﷺ সিজাদায় পড়ে রয়েছেন, আর তাঁর চারপাশে মুশরিকরা তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র বুনে যাচ্ছে।

এক মুশরিক রাসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এলো। রাসূল ﷺ তখন সিজদারত। সেই মুশরিক উটের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি রাসূল ﷺ-এর মাথার ওপর ঢেলে দিলো। রাসূল ﷺ কিছুতেই সিজদা থেকে মাথা তুলতে পারছেন না। চারপাশে অনেক মানুষ তাকিয়ে দেখছে। কারও কারও মনে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সামনে এগোনোর সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ফাতিমা رضي الله عنها ছুটে এলেন। ছোট্ট ফাতিমা رضي الله عنها দুঃসাহসিক দ্রুততায় এগিয়ে এসে রাসূলের পিঠ ও মাথায় চাপিয়ে দেওয়া উটের বিশাল ভুঁড়ি সরিয়ে দেন। রাসূল ﷺ নামাজ শেষ করার পর আকাশের দিকে হাত তোলেন। তাঁর কাছে মিনতিভরা কণ্ঠে ফরিয়াদ জানান—

> ‘হে আল্লাহ! কুরাইশদের দায়ভার আপনি গ্রহণ করুন। আবু জাহেলের শাস্তির ভার আপনার ওপর অর্পণ করলাম। উতবা ইবনে রাবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওয়ালিদ ইবনে উতবা, উমাইয়্যাহ ইবনে খালফ, ইবনে আবি মুয়িদ ও উমারা ইবনে ওয়ালিদদের আপনি দেখে নেবেন।’ সহিহ বুখারি : ২৪০

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه সমগ্র ব্যাপারটার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বর্ণনা করেন—

> ‘খোদার কসম! আমি বদরের দিন তাদের সবাইকে ভূপতিত অবস্থায় দেখেছি। তাদের লাশ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।’ সহিহ বুখারি : ২৪০

তারপর 'বদরকূপে' তাদের নিক্ষেপ করা হয়, চিরতরে খসে পড়ে শিরকের দম্ভ। একে একে প্রত্যেকে নিহত হয়। বদরকূপে পড়ে থাকে তাদের রক্তমাখা নিথর দেহ। কুফুরির অন্ধকার, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিরোধিতা করার এই হলো করুণ পরিণতি, সংকীর্ণ কূপের উদরে গড়াগড়ি খাওয়া।

রাসূল ﷺ এমন হাজারো অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন। কখনোই প্রতিশোধ নেননি; বরং ধৈর্য ধরেছেন। স্থির ও অবিচল থেকেছেন। অনুপম গুণাবলি ও উন্নত চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

এই ছিল দাওয়াতের প্রথমদিকের অবস্থা ও চালচিত্র। সময়ের আবর্তনে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। ইতিহাস নিজস্ব বাঁকে বয়ে গেছে। কিন্তু দাওয়াতের আওয়াজ স্তিমিত করে দিতে চাওয়া, খোদায়ি আলো ও জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করে দিতে চাওয়া লোকজন নিজেদের শিরক ও কুফরের মিছে দম্ভ নিয়েই মৃত্যুকূপে আপতিত হয়েছে।

এরা চেয়েছিল রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে। ষড়যন্ত্রের জাল বুনে নববি রশ্মিকে শেষ করে দেবে। শুধু ষড়যন্ত্র বুনেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বহু সাহাবাকে হত্যা করেছে। সুমাইয়া, ইয়াসির رضي الله عنه সহ অনেকেই তাদের শিরকের অন্ধ দম্ভের বলি হয়েছে। অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিলাল, আম্মার رضي الله عنه সহ অনেকে। তাঁদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, হাবশা পর্যন্ত তাঁদের ধাওয়া করেছে। এমনকী সমবেতভাবে রাসূল ﷺ-এর ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালানোর নীলনকশাও তারা এঁকেছিল। দাওয়াতের সামনে তারা সিসাঢালা প্রাচীর দাঁড় করিয়েছিল। রাসূল ﷺ বিভিন্ন মৌসুমে, নানা উপলক্ষ্যে, মেলা ও হজের সময়ে বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে দাওয়াত পেশ করতেন। তখন রাসূল ﷺ-এর পেছনে তাঁর চাচা আবু লাহাব আঠার মতো লেগে থাকত। যেই রাসূল ﷺ কারও কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন, অমনি পেছন থেকে আবু লাহাব বলে উঠত—'তোমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করো না। আমরা তাঁর গোত্রের লোক, সুতরাং আমরাই তাঁর ব্যাপারে ভালো জানি।' কিন্তু রাসূল ﷺ বিন্দু পরিমাণ বিরক্তবোধ করতেন না। তিনি অটল পাহাড়ের মতো দৃঢ়, শান্ত, মৌন হয়ে থাকতেন। চরম ধৈর্য ও অবিচলতা নিয়ে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতেন।

মৃত ব্যক্তিদের গালি দিয়ো না

একটা বিষয় চিন্তা করে বিস্মিত হই, থমকে যাই। বুখারি শরিফে আয়িশা رضي الله عنها-এর বর্ণনা এসেছে, রাসূল ﷺ সাহাবাদের উপদেশ দিতেন—

> 'তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালি দিয়ো না। কারণ তারা যা করেছে, তার কাছে চলে গেছে।' সহিহ বুখারি : **১৩৯৩**

অন্য শব্দে এমনও বর্ণিত হয়েছে—

> ‘তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কারণ, তার মাধ্যমে জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।’

এই হলো নবুয়ত! এই হলো সত্যবাদিতা! এই হলো প্রকৃত মূল্যবোধ! রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের সত্যরূপ; যারা খাবার খায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষের সাথে লেনদেন করে। অনেকটা খোদায়ি ইশারায় এই লোকগুলো মৃত্যুবরণ করে, ইসলাম বিবর্জিত হয়ে। তাদের ইতিহাস রাসূল ﷺ-এর সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। মৃত্যুকূপে পতিত এই লোকগুলো রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে। আজ তারা ইসলামের তরবারির আঘাতে মৃত্যুকূপে ঢলে পড়েছে। তারপরও রাসূল ﷺ সাহাবাদের বলছেন—

> ‘তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কারণ, এতে জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।’

বদর যুদ্ধে মারা যাওয়া এই লোকগুলোর সন্তান, ভাই, স্ত্রী-কন্যা, নিকটাত্মীয়দের আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাঁদের পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে নিন্দনীয় কথা তাদের কষ্ট দেয়। আর জীবিতদের কষ্ট অনেক বেশি ও বেদনাদায়ক।

মৃত ব্যক্তিদের নিন্দা করাটা বেশ ক্ষতিকর। বিশেষত জীবিত মুসলমানদের জন্য তা অনেক বেশি পীড়াদায়ক। এমনকী সত্য ব্যাপারেও যদি নিন্দা করা হয়, তা-ও শরিয়াহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইসলামের কোনো ‘হদ’-এর ক্ষেত্রে নিন্দা করা যাবে।

গালি কি ইবাদত হতে পারে

কেউ একজন মারা গেল। সে জীবনে কখনোই ফেরাউন, হামান, কারুনদের গালমন্দ করেনি। শুধু কুরআনের তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে করে তার কোনো ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ সময়জুড়ে ফেরাউন, হামান প্রমুখ কাফিরদের গালি ও অভিশাপ দিয়ে কাটিয়েছে। এই জন্য সে কোনো প্রতিদান পাবে না। গালি ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য কাউকে প্রতিদান দেওয়া হয় না। তবে কুরআন মুমিনদের কাছে এই লোকগুলোর ইতিহাস তুলে ধরেছে। এরা পথভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি ও কুফরির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, তাদের গালি দিতে বলা বা তাদের মর্যাদাহানি করা।

এই ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক মানুষই পরচর্চা লিপ্ত থাকে। অন্যের সম্মানহানি করে বেশ তৃপ্তি পায়। অনেকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়, এমনকী ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শরিয়াহর গণ্ডির বাইরে চলে যায়। মনে করে সে বিদআত ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করছে, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিকে দূর করছে, ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরনিন্দা ও পরচর্চা মুসলমানের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে, মতানৈক্য ও বিরোধ বৃদ্ধি করে। হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। কিছু মানুষ শুধুই পরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিজের গড়ার কথা বেমালুম ভুলে যায়।

হাদিসে নববি 'আলজারহু ওয়াত তাদিল' তথা বর্ণনাকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি নিয়ে যারা বিচার-বিশ্লেষণ করে, তারা বিশেষ শ্রেণির মানুষ। এই ব্যাপারে কথা বলেছেন আবু হাতেম, আবু জারয়া, বুখারি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়িন, আলি ইবনে আল মাদিনি (রহ.)সহ এমন আরও অনেক বড়ো বড়ো বরেণ্য ইমামগণ। কিন্তু গড়পড়তা মানুষের কথায় কান দেওয়া যাবে না। তাদের নিজেদের পরিশুদ্ধ হওয়া উচিত। অন্যজনকে বিচার করা তার কাজ নয়। অন্যজনকে বিচার করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি হয়, আমল নষ্ট হয়, হৃদয় ও অন্তর কঠোর হয়ে যায়। অতিরিক্ত পরচর্চার কারণে হৃদয়ে কালো দাগ বসে।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ একদিন সাহাবাদের বললেন—

> 'আচ্ছা তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? তাঁরা বলল, "আমাদের রীতিতে নিঃস্ব হলো যার কোনো দিনার-দিরহাম নেই, কোনো আসবাবপত্র নেই। অর্থাৎ যার কিছুই নেই।" রাসূল ﷺ বললেন, "নিঃস্ব হলো ওই ব্যক্তি—যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা, জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। সাথে সাথে সে এই ব্যক্তিকে গালি দিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে অপবাদ দিয়েছে, ওই ব্যক্তির ধন খেয়েছে, ওই ব্যক্তিকে খুন করেছে, ওকে মেরেছে। প্রত্যেককে তার ভালো কাজগুলো থেকে দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে যখন ভালো কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে। অথচ তখন তার ওপর মানুষের পাওনা শেষ হয়নি! তারপর তাদের পাপগুলো তার ঘাড়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"' সহিহ মুসলিম : ২৫৮১

সুতরাং হাদিসের বাণী—

> 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কারণ, এতে শুধুই জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।'

এখানে একটা প্রচ্ছন্ন আভাস আছে, মৃত ব্যক্তি এমনকী সে কাফির হলেও গালি দেওয়া যাবে না। কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে—

> 'আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।' সূরা লাহাব : ১-৩

আবু লাহাবের নিন্দার কথা কুরআনে এসেছে। তার শেষ পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে। রাসূল ﷺ সাহাবাদের তার ব্যাপারে বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং কুরআনের এই সূরা কম পড়তে বলেছেন। আরও বলেছেন—'কোনো মুসলিম যেন কোনো কাফিরের কারণে কষ্ট না পায়।' কারণ, আবু লাহাবের কোনো কোনো উত্তরপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই তার ব্যাপারে কথা বলা এবং তাদের সামনে এই সূরার তিলাওয়াত করলে তারা কষ্ট পায়। আর কোনো মুসলিম কষ্ট পাক—তা ইসলাম চায় না।

আখিরাতের ব্যাপারে নাক গলাবেন না

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> 'মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করো না। কারণ তারা যা করেছে, তার কাছে চলে গেছে।'

অর্থাৎ তারা তাদের সমস্ত কর্ম আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে এখন আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর কাছেই তাদের গোপন বিষয়ের খবর জানা আছে। তাঁর কাছেই সবকিছুর প্রতিদান আছে। তাঁর কাছেই হিসাব-নিকাশ হবে। তাঁর হাতেই জান্নাত-জাহান্নাম। তিনিই শাস্তি এবং সবকিছুর প্রতিদান দেবেন। প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। এগুলো একান্তই আল্লাহর ব্যাপার। আপনি কিছুতেই নিজেকে ইলাহের পর্যায়ে নেবেন না। মানুষের ব্যাপারে হুকুম দেবেন না, 'এই লোক জান্নাতি, এই লোক জাহান্নামি।'

আমি কিছু ওয়েবসাইটে দেখেছি, কিছু লোক নিজেদের সৎকর্মপরায়ণ ও ভালো মানুষ, একনিষ্ঠ দ্বীনের দায়ি ও সেবক দাবি করছে। অথচ তাদের বিপরীত চিন্তা লালনকারী কেউ যখন মারা যায়, তখন তারা নির্দ্বিধায় বলে, অমুক জাহান্নামে গেল। কী আজব ব্যাপার! মানুষ কি আল্লাহকে ভয় করে না? সে কি বুঝতে পারে না, একটা বাক্যই তার দুনিয়া শেষ করে দিতে পারে? আখিরাত নষ্ট করতে পারে? আল্লাহর কাছে তার আমল নষ্ট করে দিতে পারে? এই সব লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন—

> 'আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিয়েছি।'

ব্যক্তি নয়, কাজই মুখ্য

আসলে কোন জিনিসটা মানুষকে এমন ভাবনার দিকে ঠেলে দেয় যে, সে অনেক তাকওয়াবান ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী? অন্যরা পাপাচারী, পথভ্রান্ত ও বিপথগামী? আপনি আল্লাহর বাণী শোনেননি? তিনি বলেন—

> 'যারা ছিল অপরাধী, তারা মুমিনদের নিয়ে হাসত। যখন তাদের কাছ দিয়ে যেত, তখন একে অন্যকে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেত, তখন ফিরত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে। আর যখন তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট। অথচ তাদের মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।' সূরা মুতাফফিফিন : ২৯-৩৩

আপনি তো তাদের প্রতি দায়বদ্ধ নন। তাদের দায়িত্ব তো আপনার ওপর আরোপিত হয়নি। তাদের ব্যাপার তাদের প্রভুর ওপর ছেড়ে দিন।

এ ছাড়াও আরও একটা গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। কিছু মানুষ তাদের কর্মের কারণে মানুষের মাঝে সর্বদা আলোচিত থাকে, এমনকী মৃত্যুর পরেও; তাদের কর্ম ভালো হোক বা খারাপ। কারণ, এই আলোচনার মাঝে কিছুটা গুরুত্ব আছে। মানুষের কাজ, জীবনাচার, রাজনৈতিক অবদান, জ্ঞানের জগতে তার বিচরণ ইত্যাদি কারণে মানুষ যুগ যুগ ধরে আলোচিত থাকে। এতে কোনো সমস্যা নেই; বরং নিষিদ্ধ হলো বিশেষভাবে কোনো মানুষের কুকীর্তি আলোচনা করা। তবে কেউ যদি তা শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বলে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইসলাম কিছুতেই অতীতের সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হয় না। বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের মুখে বাধা সৃষ্টি করে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়মকানুন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানের জগতে তাদের অগ্রগতি থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ ইসলাম রেখেছে। কিন্তু ইসলাম কিছুতেই ব্যক্তিগত আক্রমণকে সমর্থন করে না। কারণ, ইসলাম উন্নত রুচিবোধ ও উচ্চ মূল্যোবোধের পূজারি। ইসলামে নিন্দা ও অহেতুক সমালোচনার কোনো সুযোগ নেই।

মুসলমানদের সম্ভ্রম

তিনি যেন আমাদের দেখছেন

রাসূল ﷺ-এর অনেক অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা রয়েছে। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর মুজিজা হলো—বিদায় হজের ভাষণে রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য : 'মানুষের কাছে নিশ্চুপ ও নীরব থাকা কামনা করো।' কারণ, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হবে। রাসূল ﷺ ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কাফির হয়ে যেয়ো না। তোমরা তখন একে অপরের গর্দান কাটবে।'

এই কথার মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন আভাস আছে—অচিরেই মুসলমানরা একে অপরের রক্ত চুষতে উদ্যত হবে। এক মুসলিম অবলীলায় অন্য মুসলিমের জীবন নাশ করবে। তার ব্যাপারে নানা ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা দাঁড় করাবে। অথচ রাসূলের সমস্ত হাদিস পড়লে জানা যায়, ইসলামে কোনো প্রকার 'হবে, হতে পারে'র স্থান নেই। ইসলামের সব বিধান স্পষ্ট। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> 'মুমিন অবৈধ হত্যাকাণ্ডের জন্য নানা ছুঁতোর আশ্রয় নেবে, দ্বীনের ভেতর নানা ফাঁকফোকর খুঁজবে। মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করার মতোই অপরাধ।'
> সহিহ বুখারি : ৬৮৬২

বরং রাসূল ﷺ বলেছেন—'মুমিনকে হত্যা করা একপ্রকার কুফুরি।' তার মানে এই নয়, কেউ মুমিনকে হত্যা করলে সে সরাসরি কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু সে কাফিরদের মতো কাজ করল। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা একে অপরকে হত্যা করত, একে অপরকে গোলাম বানাত। ইতিহাসের পাতায় আরবদের শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র পাওয়া যায়। যেমন : বসুসের যুদ্ধ, দাহিসের যুদ্ধ, গাবরার যুদ্ধ ইত্যাদি। যে লোকগুলো নববি এই শিক্ষা পেয়েছে, তাদের মাঝে মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা করা এবং তাদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারে একটা তীব্র স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। এমনকী এমন কাজে তারা প্রচ্ছন্নভাবেও জড়িত থাকতে চায় না। প্রকৃত নববি আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলিমরা এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে।

একবার এক লোক রাসূল ﷺ-কে বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন।' তখন এক সাহাবা রেগে গিয়ে বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এই লোকের গর্দান উড়িয়ে দেবো?' তিনি বললেন—'না, হতে পারে সে নামাজি।' নামাজ মুসলমানদের জীবন রক্ষা করে, তাই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

একদিন কিছু তরুণ আমাকে বলল—'এই লোকগুলো মুনাফিক।' আমি বললাম—'ধরেই নিলাম তারা মুনাফিক, কিন্তু রাসূল ﷺ কি কখনো কোনো মুনাফিককে হত্যা করেছেন? কখনোই না; বরং তাদের সুরক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে তাদের হত্যা করতে বারণ করেছেন। বলেছেন—"মানুষ যেন এই কথা বলতে না পারে, মুহাম্মাদ তাঁর সাহাবাদের হত্যা করে।"'

ইসলামের ইতিহাসের পাঠকমাত্রই এই কথা জানে—যারা রাসূল ﷺ শিক্ষা ও হিদায়াতের মূল মর্ম বুঝেছে, তারা মুসলমানদের রক্তপাত ও তাদের মর্যাদাহানি করাকে জাহান্নামের 'সুড়ঙ্গ' ভেবেছে। অথচ আজ নানা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে বেপরোয়াভাবে মুসলমানদের মান-মর্যাদা নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। কখনো কখনো নিছক দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য মুসলমানদের সম্মানহানি করা হয়, অবলীলায় হত্যা করা হয়। মুসলমানদের ইতিহাস মাজহাবি দ্বন্দ্বে, গোত্রগত শত্রুতায়, মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, দলে দলে কোন্দলে ভরে গেছে। এই অহেতুক কাজে কত শত মুসলমান লাশ হয়েছে, জীবনের মায়া ত্যাগ করেছে। অথচ ওই লোকটা সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য, কদর্যতা ও শালীনতা বিবর্জিত পন্থায় রাসূল ﷺ-কে বলেছিল—'হে মুহাম্মাদ! সুবিচার করো।'

অন্য একদিনে ঘটনা। একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে এক লোক এলো। নবিজি এক প্রসঙ্গে শপথ করলেন। তখন আগত লোকটা বলে উঠল—'এই কসমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি।' তখন রাসূল ﷺ বললেন—'আল্লাহ মুসা عليه السلام-কে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি ধৈর্য ধরেন।'

অন্য একদিন তিনি বললেন—'তোমরা কি আমার প্রতি আস্থা রাখো না? আমি আল্লাহর কাছে আস্থাশীল। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যা আকাশ থেকে সংবাদ আসে।'

তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন।'

তিনি বললেন, 'কী বললে? আমি কি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করার অধিকারী নই?'

তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি এই লোকের গর্দান কাটা উচিত নয়?'

তিনি বললেন—'না, হতে পারে সে নামাজি।'

খালিদ বলল—'কত নামাজি তো এমন কথা বলে—যা তার অন্তরে নেই।'

তখন রাসূল ﷺ বললেন—'তোমাকে তো মানুষের অন্তর চিড়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তাদের পেট ছিঁড়ে দেখা তো আমার কাজ নয়।'

তাই উমর ﵁ বলতেন, 'রাসূল ﷺ-এর যুগে অপরাধী ওহির মাধ্যমে ধরা খেত। এখন ওহি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন মানুষকে তাদের কাজ দেখে ধরতে পারব। যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভালো আচরণ করবে, আমরা তাকে নিকটে আনব। তার গোপন বিষয় তো আমরা জানি না। সেজন্য আল্লাহই তাকে পাকড়াও করবেন। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করব না; এমনকী সে যদিও বলে, তার ভেতরটা অনেক ভালো।

জীবন ও মর্যাদার রক্ষাকবচ

ইসলামে মুসলমানের জীবন ও মর্যাদার গুরুত্ব অপরিসীম। এতে বিন্দু পরিমাণ সংশয় নেই। কোনো প্রমাণ ও দলিলের প্রয়োজন নেই। মুসলমান হয়ে অন্য মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করা এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখানো সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। কিছু মানুষ আছে সকাল-সন্ধ্যা অন্য মুসলিমের সমালোচনা ও নিন্দায় ব্যস্ত থাকে, প্রহার করে, এমনকী হত্যাও করে। এগুলো সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়; এমনকী শাসকের জন্যও তা বৈধ নয়। শুধু তা-ই নয়, কোনো প্রকার বাড়াবাড়িমূলক আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, শরিয়াহর নামে মুসলমানের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়।

ইসলাম মুসলমানের ওপর সব ধরনের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িকে রহিত করেছে। যারা এসব গর্হিত ও অবৈধ কাজে লিপ্ত, তাদের মনে রাখা উচিত, তারা স্পষ্টতই ইসলামের পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করছে। কোনো প্রকার তোয়াক্কা ছাড়াই আল্লাহর বিধান অমান্য করছে। রাসূল ﷺ এসব গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন। মুসলিমের সম্মান ও মর্যাদা হলো একটা লাল রেখা (রেড সিগন্যাল); তা পার হওয়া অনেক বিপজ্জনক।

সুতরাং সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন। কীভাবে নিজের শরীরে অন্যের রক্তের দাগ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন? তাই কিছুতেই কোনো হত্যাকাণ্ডে নিজেকে জড়াবেন না। এমনকী পরোক্ষ ভূমিকা থেকেও দূরে থাকবেন। মুসলমান হয়ে অন্য মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াবেন না। যদি প্রত্যেক মুসলমান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতো—প্রমাণ ছাড়া ভিত্তিহীন কোনো কাজে নিজেকে জড়াব না, তবে বহু সমস্যা অনায়াসেই সমাধান হয়ে যেত। আর বহু মুসলমান নানা ফিতনা, ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে যেত। কিন্তু প্রতিপত্তির মনোবৃত্তি, আমিত্বের প্রভাব এবং প্রবৃত্তিতে ঠাসা মনের গোলামিতে পড়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তখন তার কাছে খারাপ জিনিসও ভালো মনে হয়।

পবিত্র কাবা শরিফ

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে মতবিরোধ

রাসূলের সিরাতের এক দীপ্তিময় অধ্যায় হলো, হাসরে আসওয়াদকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠা বিরোধ নিরসন করার অনন্য কাহিনি। কুরাইশের সর্দাররা ঠিক করল, এই বছর কাবা ঘরের সংস্কার করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা কাজে নেমে পড়ে। ধীরে ধীরে সংস্কার কাজ শেষও হয়ে আসে। বাকি থাকে শুধু হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন। এই পবিত্র পাথর আপন জায়গায় কে রাখবে, এই ছিল দ্বন্দ্বের মূল কারণ। একসময় বিরোধ চরমে ওঠে। যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। এমনকী সবাই রক্তস্নান করার শপথ নেয়। সবাই আপন শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে একটা পাত্রে রাখে। সেই পাত্রে হাত রেখে সবাই রক্ত দেওয়ার শপথ নেয়। তাই এটাকে অনেকে 'রক্তস্নান' বলে। এটা তাদের কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। প্রত্যেকের অন্তিম ইচ্ছা ছিল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নববি কৌশল

এই দ্বন্দ্ব নিরসনের উপযুক্ত কৌশল নিয়ে সবাই চিন্তিত। প্রত্যেক গোত্রই এই সম্মান অর্জন করতে চায়। কেউ বঞ্চিত হতে প্রস্তুত নয়। তারা যদি সমষ্টিগত চিন্তা করত—যেখানে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, তখন এমন গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতো না। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি জাহির করার প্রবণতা থেকে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। দুনিয়ার যত সমস্যা, তার মূল কারণ হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা, গদি ও মসনদে বসার অসুস্থ প্রতিযোগিতা কিংবা একজনের স্থানে দশজন থাকার লড়াই।

এই সমস্যার মূল সমাধান ছিল হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তখন তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে সামাজিক ঐক্য ও বন্ধন স্থাপিত হতো। দূরত্ব ও বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন ও নৈকট্য তৈরি হতো।

এই নিয়ে তাদের বিরোধ দিন দিন ঘোরতর হতে লাগল। এমনকী একপর্যায়ে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব তৈরি হয়। এমন সময় ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ। পরের দিন

সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করেন। মুহূর্তেই সমস্যার সমাধান করে দেন। এমন সমাধানে সবাই খুশিতে আত্মহারা। এটা ছিল নবুয়তের পূর্বের ঘটনা। তখনও রাসূল ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু সবার মাঝে তিনি আল আমিন তথা বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সবাই রাসূল ﷺ-এর কুশলী সমাধানে অভিভূত হয়ে পড়েন। রাসূল ﷺ-কে দেখেই তারা বলেছিল—'এ তো দেখি আমাদের আল আমিন!'

তারা রাসূল ﷺ-কে বিচারক মেনে নেয়। তিনি একটা চাদরে পাথরটা রাখেন। তারপর প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিকে চাদরের এক-একটি প্রান্ত ধরতে বলেন। চাদর ধরে সবাই পাথরটা সঠিক স্থানে নিয়ে গেল। তারপর রাসূল ﷺ নিজ হাতে পাথরটা আপন জায়গায় রাখলেন। এভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই সমাধানে সবাই সন্তুষ্ট হলো। এভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সবাই অংশগ্রহণ করল। আর কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত রইল না। এভাবেই সবাই এক অনিবার্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রেহাই পেল। এই ছিল আরবদের মাঝে রাসূল ﷺ-এর অবস্থান—যা আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে কুরাইশের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন রাসূল ﷺ।

কাবার পবিত্রতা

একসময় ইসলামের আবির্ভাব হয়। কাবার পবিত্রতা, ভাব-গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বহু গুণে বেড়ে যায়। এমনকী একসময় আল্লাহর নির্দেশ আসে কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায়ের। এই আদেশে রাসূল ﷺ-এর চেহারায় খুশির ঝিলিক দেখা দেয়। তাঁর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন পূর্ণ হয়; কাবা হয় মুসলমানদের কিবলা। কাবার চারপাশে তাওয়াফ ও চক্কর দেওয়াকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়; বরং তাওয়াফ করা হজ ও উমরার গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাওয়াফ ছাড়া হজ-উমরা কবুল হবে না। পৃথিবীতে কাবা শরিফ ছাড়া অন্য কোনো ঘর তাওয়াফ করা হয় না।

হাদিসে বর্ণিত আছে—

> 'রাসূল ﷺ আয়িশা رضي الله عنها-কে বলেন—"এসো, তোমাকে দেখাই।" রাসূল ﷺ তাঁকে সাথে নিয়ে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে কাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। "হিজর"-এর বিবরণ দিলেন। হিজর হলো কাবার দক্ষিণে একটা স্থান। যদিও কাবার সাথে লাগোয়া নয়, তবুও তা কাবার অংশ। কুরাইশের সর্দাররা বাজেট স্বল্পতার কারণে পূরো কাজ শেষ করতে পারেনি। তাই সমগ্র কাবার বিনির্মাণ সম্ভব হয়নি। একটা অংশ বাদ পড়ে যায়। হিজরে প্রায় ছয়/সাত হাতের মতো জায়গাটা ফাঁকা রয়ে যায়, অথচ তা কাবার অংশ। রাসূল ﷺ আয়িশাকে رضي الله عنها বলেন—"যদি তোমার কওম নওমুসলিম না হতো—আমার ভয় হয় তারা কষ্ট পাবে—তবে কাবা নতুন করে নির্মাণের নির্দেশ দিতাম। কাবা থেকে বাদ পড়া অংশও নতুন করে জুড়ে দিতাম এবং দুটি দরজা রাখতাম; একটা পূর্ব দিকে, অন্যটা পশ্চিম দিকে।"' সহিহ বুখারি : ১৫৮৪

অন্য বর্ণনা এসেছে—

> ‘এতে আমি ইবরাহিমের মূল ভিত্তি পুরো নিয়ে আসতাম।’ অন্য বর্ণনায় দেখা যায়—‘আচ্ছা, তুমি কি জানো, কেন তোমার স্বজাতি দরজা এত ওপরে দিয়েছে?’ আয়িশা বলেন—‘আমি জানি না।’ রাসূল ﷺ বললেন—‘তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেওয়াটা নিশ্চিত করতে। কোনো লোক ঢুকতে গেলে তাকে ওপরে উঠতে দেবে। যেই ঢুকতে যাবে, অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে—‘এমনটা করেছে যেন যাকে ইচ্ছে তাকে ঢোকানো যায়, আর যাকে ইচ্ছে তাকে বের করে দেওয়া যায়!’

আয়িশা ﵂-কে দেওয়া বিবরণের শিক্ষা ও তাৎপর্য

প্রথম : ইসলাম আসার পরে রাসূল ﷺ কাবার কোনো রদবদল করেননি; বরং পূর্বের আদলেই রেখে দেন। তার কারণ, তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন—‘আমার আশঙ্কা হয়, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করবে।’

রাসূল ﷺ মানুষের আবেগ ও অনুভূতি, প্রাণের টান ও মনের ঝোঁককে গুরুত্ব দিতেন। মানুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলতেন। যেকোনো পরিস্থিতি বুঝতেন এবং সামাল দিতেন। এটা রাসূল ﷺ-এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি ভয় করলেন—পরে মানুষ যদি কষ্ট পায়? অথবা মনে করে যে, রাসূল ﷺ নিজের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির জন্য এমন করেছেন। অথচ এসবের কোনো কিছুই রাসূল ﷺ-এর সাথে যায় না। তাঁর মর্যাদা অনেক ওপরে। তারপরও তিনি কাবা ঘরের কোনো প্রকার রদবদল করেননি; বরং পূর্বের অবস্থাতেই রেখে দিলেন। নতুন কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি।

নির্বাচনের উত্তমরূপের একটা দলিল বহন করছে এই ঘটনা। অর্থাৎ মানুষ এবং মানুষের আবেগ ও অনুভূতির মূল্য ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনেক ঊর্ধ্বে। উভয়টাই শরিয়াহ সমর্থিত কাজ। ইবরাহিম ﵇-এর ভিত্তির ওপর কাবার ঘরের নির্মাণ যেমন শরিয়াহ সমর্থিত কাজ, তেমনি কোনো প্রকার রদবদল ছাড়াই পূর্বের আদলে রেখে দেওয়াও শরিয়াহ সমর্থিত কাজ। আয়িশা ﵂-কে তা-ই শেখালেন। উক্ত দুই পন্থা থেকে রাসূল ﷺ কার্যত দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলেন। আর বিবরণের দিক থেকে প্রথমটি গ্রহণ করলেন, যেন মানুষ এই ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিফহাল থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ যেন ত্যাগ করতে শেখে এবং সর্বোপরি বড়ো লাভের আশায় ক্ষুদ্র স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে।

এমনই ছিলেন রাসূল ﷺ! এই ছিল মুসলমানদের সম্মানবোধ এবং তাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে মূল্যায়নের রূপ। তাঁর মহানুভবতা এখানেই শেষ নয়। মুনাফিকদের সাথেও তিনি এমন আচরণ করেছেন। তাদের একজনকেও হত্যা করেননি। নিজেই তার কারণ স্পষ্ট করে বলেছেন।

কোনো প্রকার ধোঁয়াশা রাখেননি। তিনি বলেন—'আমি চাই না মানুষ বলুক, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গী-সাথিদের হত্যা করে!'

সঠিক ও যথার্থ নির্বাচনের জন্য শরিয়াহর এই নীতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ জানেন, প্রত্যেক জাতির অবস্থার পরিবর্তন হবে। সময় ও কালের আবর্তনে জাতির ইতিহাসে পরিবর্তন ঘটে। একটা জাতির জাতীয় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগামিতার সময় যেমন আসে, তেমনি অবনতি ও পশ্চাদপদতার যুগও আসে। বিত্ত ও প্রাচুর্যের যেমন দেখা মেলে, তেমনি দারিদ্র্য ও নিঃস্বতাও গ্রাস করে। মানুষের সময় সর্বদা এক রকম যায় না।

আর এই কথাটাই কুরআনে বিবৃত হয়েছে—

> 'যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা কিছু উত্তম তা অনুসরণ করে।' সূরা জুমার : **১৯**

তাই বলা যায়, সবচেয়ে বড়ো বোধ ও রুচি হলো নির্বাচন এবং পছন্দ করার বোধ ও রুচি। অর্থাৎ পরিস্থিতি ও অবস্থানের সাথে মানানসই ও জুতসই কথা, কাজ, ফতোয়া ইত্যাদি পছন্দ ও নির্বাচন করার রুচি ও বোধ। মানুষ অনেক সময় সত্যের নানা রূপ ও ধরনের মুখোমুখি হয়। কোনটা ত্যাগ করে কোনটা গ্রহণ করবে, এই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এ দ্বিধা ও শঙ্কা কাটানোর জন্যই কুরআন বলছে—

> 'যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তা অনুসরণ করে।'

কথা কখনো কখনো ওহি হতে পারে। সবটাই ভালো। কিন্তু কিছুটা বেশি ভালো ও কল্যাণকর, তবে তা অনেকটা পরিস্থিতিনির্ভর। মানুষের সুবিধা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং সর্বোপরি মানুষের মনের অবস্থা চিন্তা করে ভালোর তুলনায় অধিকতর ভালো ও কল্যাণকরটাই নির্বাচন করার কথা কুরআন বলে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আর এ গুণ কেবল তাদেরই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয় এবং এ গুণ কেবল তাদেরই দান করা হয়—যারা মহা ভাগ্যবান।' সূরা ফুসসিলাত : ৩৫

দ্বিতীয় : রাসূল ﷺ বলেন—'কাবার পরিধি আরও প্রশস্ত ও বড়ো ছিল।' 'হিজর' ছিল মূলত কাবার মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত। তাই মানুষ এখনও তাকে সামনে রেখে তাওয়াফ করে। কোনো ব্যক্তি যদি তাওয়াফের সময় 'হিজর'-এ ঢুকে পড়ে এবং হিজর তার ডানে পড়ে যায়, তখন তার তাওয়াফ পূর্ণ হবে না; বরং আংশিক হবে। কারণ, সে তাওয়াফের সময় কাবার একটা অংশ বাদ দিয়েছে।

তৃতীয় : রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমি দুটি দরজা রাখতাম। একটা দিয়ে মানুষ প্রবেশ করত এবং অন্যটা দিয়ে বের হতো।'

রাসূলের এই ঘোষণার একটা বিরাট তাৎপর্য আছে। ইসলাম প্রথম থেকে মানুষের সাম্য ও মর্যাদার নিশ্চিত করেছে। তার অর্থ কিছুতেই এই নয়, সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ছোটো করা। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং সবার বিবেক-বুদ্ধি, মেধা-প্রতিভা, আকার-আকৃতি, বিচারবোধ ও বিবেচনাশক্তি, চরিত্র ও খোদাভীরুতার মধ্যে তারতম্য করেছেন। কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার মূল ভিত্তি হলো, একমাত্র তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। অন্যথা সমস্ত মানুষ সমান। ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো এবং আরব-অনারব হিসেবে কোনো ভেদাভেদ নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের একমাত্র চাবিকাঠি হলো তাকওয়া ও পরহেজগারিতা।

রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছে ছিল কাবার দরজা সমান করা, যেন তা ভূমির সাথে সমান্তরাল হয় এবং মানুষ খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে, কাবার অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করতে এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হতে পারে।

আলিমদের মতামত হলো, কাবাকে পূর্বের আদলেই রেখে দেওয়া; অন্যথায় তা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজা-বাদশাদের খেলার বস্তুতে পরিণত হবে। একজন এসে এক আদলে তৈরি করবে তো অন্যজন এসে পূর্বের আদল ও কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো তৈরি করবে—যা কিছুতেই পবিত্র কাবা শরিফের মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। তাই আলিমদের মত হলো—পূর্বের আদলে রেখে দেওয়া। তার জন্য রাসূলের পূর্বোক্ত হাদিসই যথেষ্ট; অন্য কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাই হিজর এখনও খোলা রয়ে গেছে। কোনোরূপ নির্মাণ-কাঠামো তার ওপর হয়নি। এতে করে কোনো মুসলিম যদি তাতে নামাজ পড়ে, ধরা হবে সে কাবার ভেতরে নামাজ পড়ে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়েছে।

মূল ব্যাপার হলো—কুরাইশদের বৈষম্যমূলক নীতি রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি। এমন শ্রেণি-বৈষম্যের স্থান ইসলামে নেই। তাই রাসূল ﷺ তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কুরাইশরা চেয়েছিল তাদের জন্য আলাদা একটা বিশেষ স্থান করে নিতে—যেখানে আমজনতার প্রবেশ নিষেধ থাকবে; এমনকী ইবাদতের ক্ষেত্রেও। হজের একটা বিধান হলো আরাফায় অবস্থান করা। কুরাইশরা বলত—আমরা হারামের অধিবাসী, সুতরাং আমরা হারামের বাইরে যাব না। তাই আরাফার ময়দানে অবস্থান করার প্রশ্নই উঠে না। তাই তারা শুধুই মুজদালিফায় অবস্থান করতেন। কিন্তু রাসূল ﷺ কুরাইশের সাথে একমত পোষণ করেননি। তিনি আরাফায় অবস্থান করেছেন।

ইসলামপূর্ব যুগে যখন তিনি হজ করেছেন, তখনও তিনি মানুষের সাথেই অবস্থান করেছেন; কুরাইশের সাথে নয়। এমনটাই কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ কুরাইশ এবং অন্যদের সম্বোধন করে বলেন—

‘তোমরা সেই স্থান থেকেই রওয়ানা হবে, যেখান থেকে অন্যান্য লোক রওয়ানা হয়।’
সূরা বাকারা : **১৯৯**

অর্থাৎ মানুষ যেমন আরাফায় অবস্থান করে, তেমনি তোমরাও করো। আর মুজদালিফা, আরাফা থেকে তারা যেমন চলে যায়, তেমনি তোমরাও যাবে। তোমরা কিছুতেই তাদের চেয়ে ভিন্ন নও। এই দ্বীন বিশেষ কোনো শ্রেণির নয়। এই দ্বীনের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য নেই। এই দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মানদণ্ড হলো খোদাভীরুতা ও দ্বীনি জ্ঞান। মানুষ যত বেশি খোদাভীরু ও জ্ঞানী হবে, তত বেশি বিনয়ী, মিশুক এবং মানুষের প্রতি উদার ও দিলখোলা আচরণে অভ্যস্ত হবে। নিজের দোষ নিয়ে ভাববে এবং অবস্থান নিয়ে চিন্তা করবে। এই হলো ইসলাম! এই হলো রাসূলের অনুপম চরিত্রের মানবীয় দিক।

হাউজে কাওসার

সন্তোষজনক দান

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘(হে রাসূল!) দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি দাও। নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু, তারই শেকড় কাটা।’ সূরা কাওসার : ১-৩

একদিন রাসূল ﷺ কাবার চত্বরে নামাজ পড়ছেন। তখন সেখানে কাফির সর্দার আস ইবনে ওয়ায়েল এবং একদল কাফির ছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত নিয়ে কথা বলছিল। মাঝখানে একজন বলে উঠল—‘সে আমাদের ঐক্য নষ্ট করেছে, সংহতি ভেঙে দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ এক অভিনব ব্যাপার এনেছে—যা পূর্বের কেউ দেখেনি।’ এ কথা শুনে তারা একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মাঝপথে হঠাৎ করে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে উঠল—‘তাঁকে নিয়ে এত ভাবার কী আছে, তাঁর তো কোনো উত্তরাধিকারী নেই? উত্তরাধিকারীশূন্য মানুষ। মারা যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর আলোচনাও শেষ হয়ে যাবে।’

এই কথা শুনে রাসূল ﷺ খুবই ব্যথিত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

> ‘(হে রাসূল!) দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।’

তারপর দীর্ঘ সময় বয়ে গেছে। ইতিহাসের বাঁক নানা পথে ঘুরেছে। পৃথিবীতে নানা উত্থান-পতন এসেছে। এই ভূখণ্ডের মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলের স্মরণ ও আলোচনা বন্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে এই আস ইবনে ওয়ায়েল ও আবু জাহেলদের কথা কে মনে রেখেছে? তাদের আলোচনা কি কোথাও হয়? পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে, যে রাসূলের নাম জানে না?

প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে রাসূলের পবিত্র নাম উচ্চারিত হয়। প্রতিটি মুমিনের হৃদস্পন্দন হলো মুহাম্মাদের নাম। রাসূল ﷺ-এর নাম জুড়ে যায় আল্লাহর পবিত্র নামের সাথে। যখনই আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সাথে সাথে রাসূলের নামও নেওয়া হয়। দুই 'কালিমায়ে শাহাদাত'ই হলো ইসলামের প্রবেশদ্বার। আজানের মধ্যে দুই শাহাদাতের উল্লেখ পাওয়া যায়; বরং মুসলিম-জীবন পুরোটাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

সুবিবেচক নিরপেক্ষ মানুষরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী একশো ব্যক্তির মধ্যে রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছে। এতে প্রকৃত বাস্তবতার কিছুটা এসেছে মাত্র; বরং রাসূল ﷺ আদম عليه السلام-এর পরে পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল এসেছেন, সবার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী রাসূল। শুধু তাই নয়; পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত তিনি একমাত্র ব্যক্তিত্ব—যার প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলবে। ভবিষ্যতে আর এমন মানুষের আবির্ভাব হবে না। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'অথচ আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি তাঁর রিসালাত কার ওপর ন্যস্ত করবেন।' সূরা আনআম : ১২৪

আল্লাহ তায়ালাই রাসূল ﷺ-কে নির্বাচন করেছেন। শেষ নবি করেছেন। তাঁকে দিয়েই নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি টেনেছেন। সেই মহান রাসূলের সাথেই আল্লাহ সবার হাশর করুক।

খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> '(হে রাসূল!) দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।'

আপনার ছেলেগুলো মারা যাওয়াতে এরা আনন্দিত হচ্ছে। আপনাকে নিন্দা ও গালমন্দ করছে। তবে কারও তাকদিরের ব্যাপারে কাউকে গালমন্দ করা ঠিক নয়; বরং তা আল্লাহ তায়ালার হিকমাহ ও প্রজ্ঞা। রাসূল ﷺ-এর মেয়েগুলো বেঁচে আছে, কিন্তু ছেলেরা মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁদের বিয়োগে রাসূল ﷺ খুবই মর্মাহত হন, বেদনায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু রাসূল ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কিছু করেন না, কিছু বলেনও না। এমনকী তাঁদের বিচ্ছেদ ও বিয়োগে দুঃখ ও বেদনার আকাশ তাঁর মাথার ওপর ভেঙে পড়লেও তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন না। কাফিররা তাঁর সন্তান মারা যাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বদলা দিয়েছে। তিনি ঘোষণা করছেন—

> 'আমি তোমাকে দান করেছি কাওসার।'

সমস্ত দানের উৎস মহান আল্লাহ তায়ালা। অতীতে মানুষ বলত—'আল্লাহর প্রতি মানুষের ধারণা অনুসারে তাকে দেওয়া হয়।' এখন আমরা আল্লাহর দানের ব্যাপারে কেমন ধারণা পোষণ করি? রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর ব্যাপারে সর্বোচ্চ ধারণা রাখতেন। তাই যখন আল্লাহ বললেন—'আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।' এই ঘোষণা থেকে তিনি বুঝে নেন, এই দানটা বিশাল হবে; অথচ তিনি তখনও দানের পরিমাণ জানেন না। আল্লাহ তাঁর কথা ফেরেশতাদের মাঝে আলোচনা করেছেন—যা সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র রাসূলের জন্য করলেন।

এখানে লক্ষ করার বিষয়—আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'আমি তোমাকে দান করেছি।' তিনি কিন্তু 'আমি তোমাকে দিয়েছি' বলেননি। কারণ, 'ইতাউ' বা দেওয়া শব্দটা অনেক ব্যাপক। পক্ষান্তরে 'আ-তা' বা দান শব্দটা কিছুটা বিশেষ ঘরানার। যে কাউকে দেওয়া যায়। যেমন : কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি–যা বারবার পড়া হয় এবং দিয়েছি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন।' সূরা হিজর : ৮৭

কিন্তু পক্ষান্তরে দানটা হয় বিশেষ, শুধু রাসূল ﷺ-কে দেওয়া হয়েছে।

কাওসার কী

কুরআন বলা হয়েছে—'আমি তোমাকে কাওসার দান করলাম।' অধিকাংশ আলিমগণ মনে করেন, 'কাওসার' জান্নাতের একটা নহর বা নদ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারার মতোই অগণিত। এই নহরের পানি যে একবার পান করবে, সে কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।

উপরিউক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রমাণ হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু আরও একটা ব্যাখ্যা আছে। 'কাওসার' শব্দটা 'কাসরা' তথা প্রাচুর্য ও আধিক্য থেকে নির্গত; যার অর্থ হলো অধিক বা অত্যধিক কল্যাণ। তখন অর্থ দাঁড়ায়—'আমি তোমাকে অত্যধিক কল্যাণ দান করেছি।' অন্য অর্থ অনুযায়ী—'কাওসার' জান্নাতের একটা নদ, যা আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে দিয়েছেন। যখন কাফিররা বলছিল—'সে তো সন্তানহীন একটা লোক; মারা গেলেই তাঁর প্রভাব শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; তাঁকে কেউ মনে রাখবে না।' মুশরিকদের বিদ্রুপে তিনি যখন বেদনায় ভেঙে পড়লেন, ঠিক তখনই মহান আল্লাহ নবিজিকে এই কাওসার দান করেন।

'কাওসার' মানেই কল্যাণ, সবকিছুতে অত্যধিক কল্যাণ। আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে অগণিত অনুসারী দান করেছেন। আর কোনো নবিরই এত বেশি অনুসারী ছিল না; সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। ভূপৃষ্ঠের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলমান। যুগে যুগে এই ধর্ম সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। যদিও তার শক্তি-সামর্থ্য কমেছে, কিন্তু তার প্রভাব ও শক্তি কাজে লাগিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা উতরে গেছে।

আমাদের দেওয়া খোদার প্রতিশ্রুতি

একদিন আমি মক্কায় মসজিদে হারামের পাশে একটা উঁচু দালানে দাঁড়িয়ে আছি। দালানের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামের চত্বরের দিকে তাকালাম। যত দূর চোখ যায়, তত দূর মানুষের ঢল, এক অবিশ্রাম যাত্রা। সবার মুখে তাকবির ধ্বনি, আল্লাহর জিকির। মসজিদে হারামের চত্বর কানায় কানায় ভরে গেছে। যখন কোথাও কোনো ফাঁক দেখা দেয়, অমনি আরও দ্বিগুণ মানুষে তা ভরে যায়। যদি আজ সমস্ত মুসলমানের ওপর হজ, উমরা ফরজ করা হতো, তবে সমগ্র মক্কা ভূখণ্ড কুলাত না।

এই হলো অত্যধিক কল্যাণের নমুনা। খোদায়ি হুকুমে যদি রাসূল ﷺ পুনরুত্থিত হতেন, আর মক্কার এই মনোরম দৃশ্য দেখতেন—যেখানে তিনি পদে পদে কষ্ট ও বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন; যেখানে মুশরিকরা তার ব্যাপারে বলেছিল, সে তো উত্তরাধিকারশূন্য, মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর নামগন্ধ মুছে যাবে। সেখানে সেই মক্কার পবিত্র ভূমিতে কোটি কোটি মানুষ তাঁর নাম নিচ্ছে, কিন্তু বিদ্রুপকারীদের কোনো আলোচনা নেই। আলোচনা আছে বটে, তবে তা ঘৃণার। কিন্তু নবিজির নামকে আল্লাহ উজ্জ্বল ও স্থায়ী করেছেন। এই হলো খোদায়ি সুন্নত ও রীতি। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘(হে রাসূল!) মৃত্যু তোমার জন্যও অবধারিত এবং মৃত্যু তাদের জন্যও অবধারিত।’ সূরা জুমার : ৩০

রাসূল ﷺ-কে পৃথিবীর সব কল্যাণের চেয়ে অধিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। কাওসার তার একটা মাত্র। রাসূল ﷺ-এর দ্বীন আজ বিজয়ী। পক্ষান্তরের মুশরিকদের ধর্মের কোনো অস্তিত্বই নেই।

সৎকর্মপরায়ণ

কৃতজ্ঞতায় বাড়ে নিয়ামত

আল্লাহ কুরআনে প্রায় নিয়ামতের সাথে কৃতজ্ঞতাকে জুড়ে দিয়েছেন। সূরা নাহলের মতো দীর্ঘ একটা সূরায় আল্লাহ তায়ালা বান্দার বিচিত্র নিয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন এবং বারবার নিয়ামতের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওপর জোর দিয়েছেন। এমনকী এই সূরার সমাপ্তি হয়েছে এভাবে—

> ‘নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিল এমন আদর্শপুরুষ, যে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী ছিল।’ সূরা নাহল : **১২০-১২১**

তেমনি সূরা লোকমানেও একই চিত্র দেখা যায়। তাই এই সূরাকে সূরা নাহলের সঙ্গে তুলনা করে ‘সূরাতু নিয়ামিস ছুগরা’ তথা নিয়ামতের ছোটো সূরা বলা হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এই সূরাতে নানা নিয়ামতের কথা তুলে ধরেছেন। এভাবে সূরা দোহার মধ্যেও আমরা নিয়ামতের বর্ণনা পাই। এই সূরাতে রাসূল ﷺ-কে দেওয়া নানা নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। এই সূরার শেষের দিকে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘সুতরাং যে ইয়াতিম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না। এবং যে সওয়াল করে, তাকে ধমক দিয়ো না। আর তোমার প্রতিপালকের যে নিয়ামত (পেয়েছ), তার চর্চা করতে থাকো।’ সূরা দোহা : **৯-১১**

সূরা কাওসারেও আল্লাহ তায়ালা তার অত্যধিক নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেন। তার কিছু হলো, উম্মতে মুহাম্মাদির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, রাসূলের আল্লাহ প্রদত্ত অত্যধিক জ্ঞান এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সীমাহীন কল্যাণ ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে ‘কাওসার’ দান করেছেন। তার পরের আয়াতে বলা হয়েছে—

> ‘সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি দাও।’

আয়াতে উল্লিখিত দুটি বিষয় চিন্তার উদ্রেক করে—

প্রথম : নামাজ; আল্লাহর সাথে রাসূলের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচ্ছন্ন আভাস আছে এখানে। উত্তম ইবাদত ও সুচারুরূপে নামাজ পড়ার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় : কুরবানি, আল্লাহর জন্য পশু কুরবানি দেওয়া। যেমন : উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। অসহায় ক্ষুধার্তদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে এই দুটো বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজকে রাসূলের চোখের শীতলতা করেছেন। যখন তিনি নামাজে মগ্ন হতেন, তখন সমগ্র পৃথিবীকে পেছনে রেখে দিতেন, একমাত্র আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিতেন। তিনি বলেন—‘নামাজের মাঝে একটা মগ্নতা আছে।’ তিনি যখন সিজদায় নত হন, তখন তাঁর হৃদয়, শরীর সর্বোপরি তাঁর সমগ্র সত্তা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তিনি তাসবিহ পড়েন, জিকির ও দুআ করেন এবং আল্লাহর কাছে অশ্রুপাত করেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন—‘তুমি সিজদা করো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো।’ রাসূলের নামাজ কোনো দৃশ্যগত নামাজ ছিল না; বরং ছিল প্রকৃত নামাজের প্রতিচ্ছবি। তাঁর নামাজে অন্তরের, প্রাণের এবং সমগ্র শরীরের যোগ ছিল।

রাসূল ﷺ দীর্ঘ রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন; তাঁর পা ফুলে যেত। আয়িশা رضي الله عنها বলেন—‘হে রাসূল! আপনি এত কষ্ট করতে যান কেন, আল্লাহ তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহই ক্ষমা করে দিয়েছেন?’ তখন নবিজি বলেন—‘আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?’ তিনি প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘হে দাউদের খান্দান! তোমরা এমন কাজ করো—যা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।’ সূরা সাবা : ১৩

কৃতজ্ঞতার উত্তম প্রকাশ হয় হৃদয়ের নিবেদনে, অঙ্গের নোয়ানো ও বিগলিত ভাষায়। রাসূল ﷺ-এর নামাজ ছিল কৃতজ্ঞতার উত্তম বহিঃপ্রকাশ। তাঁর প্রতিটি কাজ, আমল ও জিকির ছিল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাহন। তিনি ছিলেন কুরআনের আয়াত, ‘সুতরাং তাঁর জন্য নামাজ ও কুরবানি করো’-এর জীবন্ত প্রতিবিম্ব। এ ছাড়া কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে ‘মাকামে মাহমুদ’-এ পৌঁছাবেন।’ সূরা বনি ইসরাইল : ৭৯

আয়িশা ﵂ বলেন—

> ‘একরাত হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি রাসূল ﷺ বিছানায় নেই। আমি হাতড়ে হাতড়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে তাঁর পায়ে আমার হাত লাগে। দেখি, তিনি মসজিদে আর তাঁর পা দুটি ফুলে গেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন—“হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তোষ ও ক্ষোভের বদলে সন্তোষ ও প্রসন্নতা চাই, আপনার শাস্তির বদলে ক্ষমা চাই এবং আপনার কঠিন আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারব না। আপনি নিজের প্রশংসার মতোই মহান।”’ সহিহ মুসলিম : ৪৮৬

রাসূলের প্রতি আল্লাহর দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল—

> ‘তোমার প্রতিপালকের জন্য কুরবানি করো।’

মানুষ আল্লাহর গোলামি ও বন্দেগি করে। আর গোলামি ও বন্দেগির পূর্ণতা আসে মানুষের প্রতি সদাচার করার মাধ্যমে। এখানে দুটি বিষয় জড়িয়ে আছে; একটা থেকে অন্যটা কিছুতেই আলাদা করা যায় না। আল্লাহর প্রতি নিবেদিত, আসক্ত ও ভীরু অন্তরগুলোই মানুষের প্রতি আন্তরিক ও কোমল হয়ে থাকে। অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র ও বিধবা, সর্বোপরি যাদের আল্লাহ ছাড়া কোনো সহায় নেই, তাদের প্রতি মানবিক ও দয়ার্দ্র হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সর্বদাই মানুষের কষ্ট ও দুর্দশা লাগব করে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কমায়। আপন আপন সামর্থ্য ও সাধ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়ায়। খাবার, পোশাক, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা দেয়।

সেদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘সুতরাং আপনি নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।’

নামাজ ও কুরবানি দুই বিষয়ের কথাই বলা হয়েছে। আবার নামাজে যারা আলস্য ও অনীহা নিয়ে দাঁড়ায়, তাদের নিন্দাও করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘যারা মানুষকে দেখায় এবং অন্যকে মামুলি বস্তু দিতেও অস্বীকার করে।’ সূরা মাউন : ৬-৭

এরা মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে না। তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু দিতেও অস্বীকার করে। যেকোনো ব্যাপারে কার্পণ্য করে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কার্পণ্য হলো স্ত্রী-পরিজন ও অধীনস্থদের সাথে কার্পণ্য করা।

মানুষের উপকার করা ইবাদতের শামিল

নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইবাদত মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি, খোদায়ি বড়োত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি তৈরি করে। আখিরাতের জন্য কাজ করতে প্রণোদনা জোগায়। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালোবাসায় হৃদয় পূর্ণ করে তোলে। পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানো ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। মুমিন বুঝতে পারে, সিজদা করে যেমন আল্লাহর বন্দেগি করা যায়, তেমনি অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রয়োজন পূরণ করেও বন্দেগি করা যায়; এমনকী চাওয়ার আগেই প্রার্থীর কাছে তার প্রয়োজন পৌঁছে দেয়। সবচেয়ে উত্তম দান হলো—যা প্রার্থীর মর্যাদা ও আভিজাত্য রক্ষা করে দেওয়া হয়, যার জন্য কোনো প্রকার খোঁটা দেওয়া হয় না।

ইসলামের বিধানগুলো একটার সাথে অন্যটা যুক্ত, একটা অন্যটার পরিপূরক। এটাই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে। মুমিনের দান করার উদ্দেশ্য কিছুতেই লৌকিকতা, পার্থিব মোহ, মানুষের কাছে দানবির, সমাজ হিতৈষী তকমা পাওয়া ইত্যাদি নয়। যদিও এসব আপনা আপনিই চলে আসে; বরং তার দানের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা। কারণ সে জানে, মানবসেবা জান্নাত প্রাপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়ায় তাওফিক প্রাপ্তির পথ। মানুষের পাশে দাঁড়ানো দানশীল মানুষগুলোই দীর্ঘ জীবন পায়, সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, সম্পদ ও বিত্তের মালিক হয়, দুর্ভোগ ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে দূরে থাকে এবং সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির কাছে থাকে।

তাই সিজদা ও মিনতি নিয়ে যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করা উচিত, যেভাবে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসায় হৃদয় পূর্ণ করা উচিত, তেমনি মানুষের প্রতি সদাচারণ ও মানবিকতা দিয়েও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা উচিত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘সমস্ত সৃষ্টিকুলই আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি হলো যে তার পরিবারের উপকার ও কল্যাণ করে।’ সুনানে বায়হাকি : ৭৪৪৪

এই হাদিসটা যদিও মারফু, কিন্তু এর অর্থ ও বোধ, বার্তা ও আবেদন অন্য হাদিস দ্বারা সমর্থিত। এখানে আল্লাহর পরিবার তথা ‘ইয়াল’ বলতে মূলত বোঝানো ‘আল’ তথা মুখাপেক্ষী। আল্লাহই সবাইকে খাওয়ায় এবং রিজিক দেয়। যে ব্যক্তি এই কাজ করে, সে আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। কারণ, সে আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে মানুষকে খাওয়ায়। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে মানুষকে দেয়; তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে, অসহায়তা ও নিঃস্বতার হাত থেকে রেহাই দেয়, দারিদ্র ও অসহায়তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়।

কুরআনের বাণী—

> ‘সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি দাও।’

এখানে দুই ধরনের ইবাদতের কথা বলা হয়েছে—শুধু আল্লাহর বন্দেগি ও গোলামির কথা অন্যটা মানুষের প্রতি সদাচারণ ও মানবিকতার কথা বলা হয়েছে। তারপর সূরাটা শেষ হয়েছে—‘নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু, তারই শেকড় কাটা’—এই কথা দিয়ে। এর মূল মর্ম হলো, তোমার উচিত তোমার প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ, তিনি তোমার নাম, কিতাব ও দ্বীনকে স্থায়ী ও সম্মানিত করেছেন। একপর্যায়ে মক্কা মুকাররমা হয়ে উঠে ইসলামের সবচেয়ে বড়ো রাজধানী; বরং গোটা দুনিয়ার রাজধানীতে পরিণত হয়। মক্কা এখন বৈশ্বিক নগরীতে পরিণত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নানা বর্ণের মানুষ এখানে ছুটে আসছে, লাখো মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘এবং মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে। যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে।’ সূরা হজ : ২৭-২৮

বছরের যেকোনো সময় কুরআনের এই বাণীর সত্যতা পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বীন, আপনার দেশ ও ভূমিকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের করেছে চিরস্থায়ী।

খোদায়ি অলৌকিকতা

‘নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু, তারই শেকড় কাটা।’ এর আরও ব্যাখ্যা আছে, তাৎপর্য ও নিগূঢ় অর্থ আছে—যারা আপনার সাথে শত্রুতা করেছে, পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং বলেছিল আপনি উত্তরাধিকারহীন, আপনার মৃত্যুর সাথে সাথেই আপনার আলোচনা শেষ হয়ে যাবে, তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারা শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ তাদের কোনো আলোচনা হয় না। কেউ তাদের স্মরণ করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম দুর্ভেদ্য অজেয় এক জীবনবিধানে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের সোনালি পাতায় তার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। সবাই আজ ইসলামের নাম জানে। বড়ো বড়ো সভ্যতা বিনির্মাণে তার অবদান ও প্রভাবের কথা সবাই জানে।

‘নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু, তারই শেকড় কাটা’—যারা আপনার সাথে শত্রুতা করেছে, তারাই আজকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারীহীন হয়েছে। তাদের কোনো উত্তরসূরি আজ আর নেই।

তাদের অনেক সম্পত্তি ও সন্তান ছিল বটে, কিন্তু আল্লাহ বলেন—

> ‘সেই ব্যক্তির ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দাও—যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে। আমি তাকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধন-সম্পদ দিয়েছি এবং দিয়েছি বহু পুত্র, যারা সামনে উপস্থিত থাকে। আর তার জন্য সকল কিছুর সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তারপরও সে লোভ করে, আমি তাকে আরও বেশি দিই।’ সূরা মুদ্দাসিসর : **১১-১৫**

তারা আজ কোথায়? কোথায় তাদের সন্তানরা? তাদের বিত্ত, প্রাচুর্য, মর্যাদা, স্মরণ আজ কিছু অবশিষ্ঠ আছে কি? তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অথচ রাসূল ﷺ এবং দ্বীন আজও চির ভাস্বর হয়ে দুনিয়ার বুকে টিকে আছে। আল্লাহর দেওয়া কথাই সত্য হয়েছে। রাসূলের মর্যাদাই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাসূল ﷺ মক্কায় অবরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। দুঃখ-শোকে ভেঙে পড়েছেন। এমন সময় প্রশান্তির শীতল বারি হয়ে নেমে আসে সূরা কাওসার। এই সূরার সুসংবাদ পেয়ে নবিজি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। ওহি ছিল রাসূলের নবুয়তের সত্যতার পরিচায়ক। তিনি অযথা ভিত্তিহীন কথা বলতেন না। কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘সে তাঁর নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলে না। এটা তো খালিস ওহি—যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।’ সূরা নাজম : ৩-৪

আল্লাহ তায়ালা নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার পাশাপাশি বাস্তবায়ন করেছেন। এই মুশরিক দল চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ এখনও আপন মহিমায় ভাস্বর। কুরআনের বাণী ও বিধান এখনও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে, আলো বিলিয়ে যাচ্ছে।

এটা রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার পরিচায়ক। কুরআনের অসংখ্য মুজিজার একটা; হাজার বছর পরও কুরআনের কথার সত্যতা মিলছে। এই দ্বীনের স্থায়িত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে চলেছে হাজারো স্থান। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘(হে নবি!) বলো, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, তা অপেক্ষা এটা কতই না শ্রেয়!’ সূরা ইউনুস : ৫৮

সে যদি আমার বন্ধু না হতো

অসৎ বন্ধু

জাহেলি যুগে উবাই খালফ ও উকবা ইবনে আবি মুয়িত দুজনই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। উবাই ইবনে খালফ ছিল শিরক, অহংকার ও দাম্ভিকতা এবং বাড়াবাড়ির মোড়ল। কুরাইশের যেকোনো সিদ্ধান্তে সে প্রভাব খাটাত। কুরাইশ সর্দাররা অনেক সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে শিথিলতাপূর্ণ আচরণ করত। এতে তার ঘোর আপত্তি ছিল। সে সবাইকে নবিজির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত।

অন্যদিকে উকবা ইবনে আবি মুয়িতের ছিল ভিন্ন ধাঁচের। সে তেমন কঠোর ও নির্দয় ছিল না; বরং অনেকটা শান্তিপরায়ণ ও নির্বিবাদী প্রকৃতির ছিল। উমর رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করলে কিছু লোক উকবার কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে। তারা ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল—'উমর তো ধর্ম ত্যাগ করেছে!' উকবা বলল—'এই দ্বীনের গ্রহণযোগ্যতা ও অবস্থান অনেক দূর চলে গেছে। তাই এখন আর তার বিরোধিতা এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কিছুতেই বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। একজন ব্যক্তি তার পছন্দের ধর্ম গ্রহণ করেছে, এতে দোষের কিছু নেই; বরং তাঁকে তাঁর পথে চলতে দেওয়াই শ্রেয়। সে আপন পথে চলুক।'

এরা দুজনই বন্ধু ছিল, অথচ দুজনের কথা ও আচরণে আকাশ-পাতাল তফাত। উকবা নিজে কাফির ছিল বটে, তবে উবাই ইবনে খালফের মতো মুমিনদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, কারও ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়নি।

একবার উবাই ইবনে খালফের কাছে এক লোক এসে বলল—'তোমার দীর্ঘদিনের সহচর, আড্ডায়, ভ্রমণে, এমনকী নিশিরাতের বন্ধু উকবা ইবনে আবি মুয়িত কি শুরু করেছে দেখলে? সে মুহাম্মাদকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাঁকে সম্মান দিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। কী জানি, গোপনে গোপনে সে আবার ইসলাম গ্রহণ করল কি না?

এই কথা শোনার পর উবাই ইবনে খালফ রাগে-ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে উকবার কাছে গেল। ঝড়ের বেগে উকবার ঘরে ঢুকে বলল—'তোমার ব্যাপারে তো এমন এমন কথা শোনা যাচ্ছে। তুমি মুহাম্মাদের মুখে থুতু ছিটিয়ে আসবে, অন্যথা আমি আর কখনোই তোমার মুখ দেখব না।'

এই ছিল উবাই ইবনে খালফ। দাম্ভিক, কর্কশ ও রূঢ় স্বভাবের অহংকারী এক চরিত্র। অথচ উকবা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। শান্ত ও নির্বিবাদী লোক। সেই উবাইয়ের হুমকি শুনে মনে মনে দমে গেল। তারপর বলল—'আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি।" তারপর অনুগত দাসের মতো উবাই ইবনে খালফের হুকুম তামিল করতে ছুটল। কুরআন বলা হয়েছে—

> 'এবং যেদিন জালিম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে—"হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে তো উপদেশ এসে এসেছিল, কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূর সরিয়ে দিয়েছিল।" আর শয়তান তো এমনই চরিত্রের যে, সময়ভেদে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়।' সূরা ফুরকান : ২৭-৩০

এই আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট ছিল দম্ভোক্তি ও মানুষের ধর্ম গ্রহণ ও পালনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ন্যক্কারজনক এই ঘটনা। উবাই ইবনে খালফ ও তার মতো ইসলামবিদ্বেষীরা প্রতিনিয়তই ইসলামের বিরোধিতা করেছে। এমনকী যেকোনো প্রকার শান্তিপূর্ণ ও সমঝোতামূলক উদ্যোগকেও এরা অস্বীকার করেছে। এই দৃশ্য সব যুগেই ছিল। সব দেশেই এমন কিছু লোকের দেখা মেলে। কিছু মানুষ থাকে—যারা শুধু নিজেরাই ধর্মবিমুখ হয় না; বরং অন্যদের ধর্ম পালনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জাহেলি যুগে আরবরা উদারতা, আভিজাত্য, বদান্যতা ইত্যাদি উত্তম গুণাবলি নিয়ে গর্ব করত। কাব্যচর্চা ও উন্নত মূল্যোবোধের চর্চা করত; বরং এগুলোতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতাও হতো। নিজের গোত্র, পূর্বপুরুষ, বংশ ইত্যাদির প্রশংসা করত। এসব ভালো গুণে প্রশংসিত হতেও তারা বেশ আনন্দিত হতো। অথচ উবাই ইবনে খালফ রাসূল ﷺ-এর সাথে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার কারণে আরবদের চিরাচরিত উত্তমগুলোর দিকে পর্যন্ত লক্ষ করেনি; বরং বিরামহীনভাবে রাসূল ﷺ-এর সাথে কাপুরুষসুলভ কদর্য ভাষায় ও রীতিতে আচরণ করেছে। সে এতই নীচে নেমে গিয়েছিল যে, রাসূল ﷺ-এর মুখে থুতু ছিটাতেও দ্বিধা করেনি! অথচ রাসূল ﷺ ছিলেন উচ্চবংশীয়, অভিজাত, সৎ, নিষ্ঠাবান, আমানতদার এবং সকলের কাছে বিশ্বস্ত মানুষ। কৌলিন্যে, আভিজাত্যে, মর্যাদায় কেউ তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। তারপরও উবাই ইবনে খালফের বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা হয়নি। কারণ, সে প্রতিহিংসা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলের হাতে নিহত ব্যক্তি

উবাই ইবনে খালফ রাসূল ﷺ-কে সর্বদা হত্যার হুমকি দিত। রাসূল ﷺ-ও তাকে পালটা হুমকি দেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। উবাই বলল—'খোদার কসম! আমি মুহাম্মাদকে হত্যা না করে ফিরব না।' সে রাসূল ﷺ-এর দিকে তেড়ে আসে।

নবিজি তাকে লক্ষ্য করলেন। সে গায়ে লৌহবর্ম জড়িয়ে আছে। তার সারা শরীর লৌহবর্মে আচ্ছাদিত। কোথাও কোনো ফাঁক নেই। রাসূল ﷺ তার দিকে ছোটো পাথর ছুড়ে মারেন। গলার নিচে সামান্য একটা ফাঁকা জায়গা ছিল, ওখানে গিয়ে পাথরটা আঘাত হানল। পাথরটা লেগে গলায় একটু আঁচড় লাগল। সে ককাতে ককাতে বাড়ি ফিরে গেলে। সবাই তার আঘাত দেখে বলল—'ছোটো আঘাত, কিছুই হবে না।' সে বলল—'খোদার কসম! মুহাম্মাদ যদি আমার দিকে থুতুও ছুড়ে দিত, আমি মারা যেতাম। সে কি বলেনি যে আমাকে হত্যা করবে?' সত্যি সত্যি এই সামান্য আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

উবাই ইবনে খালফ ছিল একমাত্র ব্যক্তি—যাকে রাসূল ﷺ হত্যা করেন। রাসূল ﷺ তাকে পূর্বের কথা মনে রেখে হত্যা করেনি; বরং অনেকটা আত্মরক্ষার্থে হত্যা করেছেন। রাসূল ﷺ কারও প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হননি। কারণ, তিনি ছিলেন দয়ার ভান্ডার। তিনি কারও থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন না। রাসূল ﷺ অনেকটা নিরুপায় হয়ে থাকে হত্যা করেন। কারণ, সে খোলা তরবারি হাতে রাসূলের দিকে তেড়ে আসছিল।

একমাত্র কুলাঙ্গার

উবাই ইবনে খালফকেই রাসূল ﷺ হত্যা করেন, তা-ও অনেকটা বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই ব্যাপারে দারুণ কথা বলেছেন—

> 'রাসূল ﷺ একজনকেই মাত্র হত্যা করেছেন। অধিক মানুষ হত্যা করা কোনো প্রশংসার ব্যাপার নয়; বরং মানুষকে উদ্ধার করাই হলো বড়ো কাজ। কোনো বাদশা, শাসক, নেতা কিংবা সেনানায়ক অত্যধিক হত্যার কারণে প্রশংসিত হন না; বরং কত মানুষকে উদ্ধার করেছেন, সেই জন্যই প্রশংসিত ও নন্দিত হন।' মিনহাজুস সুন্নাহ

রাসূল ﷺ সমগ্র উম্মাহকে উদ্ধার করেছেন। আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। পতন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও সার্থক করে তুলেছেন। একপর্যায়ে তাঁরা হয়ে উঠে বড়ো বড়ো আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> 'ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সেই সকল লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়োত্ব দেখাতে ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুত্তাকিদেরই অনুকূলে থাকবে।' সূরা কাসাস : ৮৩
>
> 'আর আমি চাচ্ছিলাম সে দেশে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা বানাতে এবং তাদেরই (সে দেশের ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানাতে।' সূরা কাসাস : ৮৩

রাসূল ﷺ তাঁর জীবন জাগানো মিশনের জন্যই প্রশংসিত হবেন। এই কথাটা পশ্চিমা মিড়িয়ার বিরামহীন ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডার জবাব, যারা প্রচার করে রাসূল ﷺ একজন রক্তপিপাসু যোদ্ধা ছিলেন। অথচ তিনি মাত্র একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন; তাও নিরুপায় হয়ে, আত্মরক্ষার্থে। কারণ, সে খোলা তরবারি নিয়ে দাতঁ কটমট করতে করতে রাসূল ﷺ-এর দিকে তেড়ে আসছিল। রাসূল ﷺ সমগ্র একটা উম্মাহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এবং যে দিন জালিম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে—"হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম!"' সূরা ফুরকান : ২৭

মানুষ যখন লজ্জিত হয়, তখন হাতের নখ কাটে।

কুরআন সেই আফসোস ও মনস্তাপের বর্ণনাও দিয়েছে—

> 'এবং যে দিন জালিম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে—'হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে তো উপদেশ এসেছিল, কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূর সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তান তো এমনই চরিত্রের যে, কালভেদে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়।'

তারা (উবাই ইবনে খালফ ও উকবা ইবনে আবি মুয়িত) দুই বন্ধু। একজন রাসূলের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছে এবং তার পছন্দই ঠিক ছিল। সৎ ও মঙ্গলের পথই সে পছন্দ করেছে। তাই আমাদের উচিত এই ব্যক্তিকেই অনুসরণ করা। ভালো ও সৎ বন্ধুকে গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে খারাপ ও মন্দ বন্ধুদের সঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখা; অন্যথায় আক্ষেপে পুড়তে হবে। যেমনটা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'

কত মানুষ ঈমানের আলোতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, অথচ খারাপ বন্ধুর প্রভাবে আলোর কাফেলা থেকে ছিটকে পড়েছে। সুতরাং বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

আব্রুর সুরক্ষা

নবুয়তের পূর্বেই সুরক্ষিত

হজরত জাবির ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> রাসূল ﷺ নবুয়তের পূর্বে কুরাইশদের সাথে কাবাগৃহ সংস্কারের কাজে অংশ নেন। তখন নবিজি লুঙ্গি পড়ে পাথর বয়ে নিতেন। খালি কাঁধে করে পাথর বহন করা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। কাঁধে রীতিমতো ফোঁসকা পড়ে যায়। রাসূলের দুরবস্থা দেখে তাঁর চাচা আব্বাস বললেন—"ভাতিজা! তোমার লুঙ্গি খুলে কাঁধে রাখো, এতে কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।" এ বলে তিনি রাসূলের পরনের লুঙ্গি টান দিয়ে খুলে নেন; এতে রাসূল বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। এরপর আর কখনো রাসূলকে বিবস্ত্র দেখা যায়নি...' সহিহ বুখারি : ৩৬৪

ঘটনাটি ছিল জাহেলি যুগের—যা রাসূল ﷺ-এর আব্রু রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন—তার প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, জাহেলি যুগে অন্য দশজন সাধারণ তরুণ যেসব গর্হিত কাজে জড়াত, নবিজি ﷺ কখনো তেমন কিছুতেই নিজেকে জড়াননি। আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই তাঁকে নবুয়তের পবিত্র চাদরে আবৃত করে রেখেছেন। তাই তিনি কখনো কোনো গর্হিত কাজ করেননি, মদ পান করেননি; এমনকী কখনো মদের আসরে বসেনওনি। জাহেলি যুগের পদস্খলন ও পাপাচার থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার, মহানুভবতা, পরোপকারসহ যাবতীয় সকল প্রশংসনীয় উত্তম গুণাবলির প্রতি রাসূল ﷺ আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল। এ ছাড়া বাজে অর্থহীন কাজ থেকে তিনি সতত দূরে থাকতেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও নিখাদ জীবনাচরণের ওপর গড়ে তোলেন।

রাসূল ﷺ-এর বেহুঁশ ও অজ্ঞান হওয়ার আরও একটা কারণ হতে পারে অনভ্যস্ততা। তিনি জাহেলি যুগের বিবস্ত্র দেহে থাকার সংস্কৃতিতে তাঁর অভ্যস্ততা ছিল না। আর এ ঘটনার পর তাঁকে আর কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি।

নগ্নতা কুরাইশদের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কারণে-অকারণে নগ্ন হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিকার ছিল না। এমনকী জনসমাগমেও বিবস্ত্র হতে তারা বিন্দু পরিমাণ বিব্রত বোধ করত না, বিচলিত হতো না। উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করার মতো ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন তাদের কাছে বেশ স্বাভাবিক ছিল। তাদের যুক্তি ছিল—'যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমরা আল্লাহর অবাধ্যতা লিপ্ত থাকি, সে পোশাক পরিধান করে তো আমরা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারি না।' জাহেলি যুগের এই কদর্য ও পঙ্কিল রীতিনীতি নবি ﷺ কখনোই সমর্থন করেননি। জাহেলি আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেও তিনি কখনোই তাদের এ সকল কার্যকলাপ মেনে নেননি। আল্লাহ সব সময়ই তাঁকে এসব কদর্যতা থেকে দূরে রেখেছেন।

বিবস্ত্র সভ্যতা

নিঃসন্দেহ আমরা সভ্য যুগে বসবাস করছি। বর্তমানে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আর প্রকৃত সভ্যতার মূল কাজ হলো মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। মানুষ পশু নয়। আল্লাহ তাকে লজ্জা, চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। তাই পশু ও মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। পশুসুলভ আচরণ মানুষের সাথে শোভা পায় না। পশুর মতো জীবনযাপন তাকে মানায় না। পশু থাকে বিবস্ত্র, উলঙ্গ। পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিনন্দন জামা-কাপড় আছে, সতর ও লজ্জাস্থান ঢাকার অবলম্বন আছে। উন্নত সভ্যতা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো দৃষ্টিনন্দন ও মনোহর জামা-কাপড়। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আমি তোমাদে জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয়—তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম।' সূরা আরাফ : ২৬

আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার আবশ্যক করেছেন। আমরা যদি কোনো বন্য সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করি, তবে এমন কিছু প্রাচীন জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ চলে আসে—যারা কোনো পোশাক পরিধান করত না, লজ্জাস্থান প্রদর্শনকে দোষণীয় মনে করত না; এমনকী এতে তারা লজ্জা বোধও করত না। কারণ, মানুষ যখন সুশিক্ষিত ও সভ্য হয়, তখন তার শরীরের অসুন্দর, বিব্রতকর জায়গাগুলো প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সে অধিকতর লজ্জাবোধ ও শালীনতার পরিচয় দেয়। কিন্তু আমরা এমন এক কথিত সভ্য যুগ অতিবাহিত করছি, যেখানে লজ্জা নিবারণ, সংযম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট পোশাককে অবাধ মেলামেশা ও বৈধতা, নগ্নতা ও দেহ প্রদর্শন করে কাম জাগানোর অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে বানানো হয়েছে। অধিকাংশ ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানই এখন তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে নারীর শরীরকে পুঁজি করে। যখনই কোনো নারী তার শরীরের বর্ধিত অংশ প্রদর্শন করে, তখনই সংশ্লিষ্ট ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর শো-রুমে ও টিভি চ্যানেলে অ্যাডভার্টিজমেন্টটা বেশি হয়।

নগ্নতা, প্ররোচনা, ফিতনা, আসক্তকরণ এবং প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অপব্যবহার—এগুলো যে শয়তানের ধোঁকা, প্রতারণা ও ছলনার জাল—এতে কোনো সন্দেহ নেই। শয়তান আমাদের সাথে তা-ই করছে, যা সে জান্নাতে আমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'সে তাঁদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের দেহ থেকে পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে—যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।'

পাশ্চাত্যে জায়োনিস্ট ধনকুবের ও মিডিয়া মালিক এবং অন্যান্য কথিত বুদ্ধিজীবীরা এবং প্রাচ্যে তাদের অর্থপুষ্ট এজেন্টরা মিলে গণমাধ্যমগুলোর কর্মপ্রবাহ আমূল বদলে দিয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর মূল মিশন হওয়া দরকার ছিল সাধারণ মানুষের বিবেক ও হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব, দৈনন্দিন জীবনের নানাবিদ সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার, মানুষকে সৎ ও সচ্ছল জীবন ধারণের পথ ও পন্থা জানান দেওয়ার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শমূলক টকশো প্রচার করা। অথচ গণমাধ্যম তার মূল কাজ থেকে সরে এসেছে। এখন এসব প্রকৃত মানবিক উদ্বেগের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে তারা মেতে আছে এমন এক উষ্ণ প্রতিযোগিতায়, যার মূল প্রতিপাদ্য হলো—মানুষের হৃদয় ও অনুভূতির মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং নাড়া দেওয়া। মিডিয়াগুলোর মূল প্রচেষ্টাই থাকে ভ্রষ্ট যুবকের ঘোরলাগা মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ, এই ভ্রষ্ট যুবকের কাছে জীবনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, সে এখন নিরুপায় ও অসহায়। আর মিডিয়া তার মনের এই অবস্থাকে কাজে লাগায়। ফলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থেকে দেখতে থাকে উলঙ্গ শরীর ও নগ্নতার প্রদর্শনী—যা হৃদয়কে কলুষিত করলেও চক্ষু মজিয়ে রাখে। এর পরিসমাপ্তি হয় এক চুমুক নেশা—যা মানুষকে ধৈর্য, শক্তি ও বৃহৎ উদ্যোগপূর্ণ জীবন মোকাবিলার উদ্যোগ ও উদ্যম কেড়ে নেয়; বরং এ বিষয়গুলো মানুষের মাঝে অবসাদ ও ক্লান্তি নিয়ে আসে, তাকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে ছাড়ে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার, কঠিন পরস্থিতি মোকাবিলার কোনো শিক্ষাই তাকে দেয় না।

অত শত অযথা প্রোগ্রামের মাঝে গঠনমূলক প্রোগ্রাম কোথায়? তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন কোথায়? উচ্ছল তারুণ্যে ভরপুর অনুষ্ঠান কোথায়? নিরেট কিছু দ্বীনি ওয়াজ ও ফতোয়ার প্রোগ্রামই যথেষ্ট হবে—আমি এমনটা বলছি না; বরং এমন কিছু প্রোগ্রামের কথা বলছি, যেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে, আমাদের যুবকদের নব উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গড়ে তুলবে, সর্বোপরি তার নিজ অস্তিত্বের দাবি অনুযায়ী তাকে প্রস্তুত করবে; হোক সে ঘরের কর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিংবা কোনো কার্যালয়ের কর্মকর্তা।

এমন পরিস্থিতিতে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো অনুন্নতি, দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতার বেড়াজালে আটকে থাকা মোটেও সমীচীন নয়। কারণ, সঠিক পদ্ধতিতে যদি কারও পূর্ণ তদারকি না হয়, তবে প্রবৃত্তিই হয়

তার চলার পথের শক্তিশালী নিয়ামক। এভাবেই বড়ো একটি গোষ্ঠী মিডিয়ার কাছে বলির পাঠাতে পরিণত হয়েছে—যাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পূণর্জাগরণ অতীব জরুরি।

দায় আমাদের সবার

আমরা যে শরীর ঢাকা ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কথা বলছি, এর গূঢ়ার্থ সকলেরই বোঝা দরকার। নিঃসন্দেহেই লজ্জা একজন মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত; বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে। একজন নারী যত বেশি লজ্জাবতী হয়, তার নারীত্ব তত বেশি ফুটে ওঠে, তত বেশি স্থায়িত্ব বহন করে এবং তত বেশি সে সকলের কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে।

একজন নারীর কাছে তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বিশ বছর বয়সি তরুণীর কাছেই নয়; বরং ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর বয়সি মহিলার কাছেও। এমনকী জীবনের ক্রান্তিকালে পৌঁছে যাওয়া বৃদ্ধার কাছে তার আগামীকালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী চায়, তার স্মৃতির পাতায় সুন্দরতম মুহূর্তগুলো সজীব থাকুক। তার সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনিদের সাথে কথা বলতে বিব্রত হবে—এমন কোনো কালিমার ছড়াছড়ি সে তার স্মৃতিপটে চায় না।

আমার ধারণা, অধিকাংশ মানুষ সত্যই বলে—'এ সকল চ্যানেল, গণমাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানগুলো তো তা-ই প্রচার করে—যা মানুষ খায়।' এর অর্থ হলো—যারা এগুলো গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু আমরা অধিকাংশরাই এ সকল টিভি চ্যানেলের সমালোচনা করি ঠিক, অথচ নিজেরাই টিভি পর্দার সামনে রাত কাটাই। এ সমস্ত অবাধ বিচরণের ক্ষেত্রগুলোকে গালমন্দ করি ঠিক, অথচ নিজেরাই আড়ালে এগুলোতে ঢুকে পড়ি। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈধ বিনোদন বৃদ্ধি এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হালালকৃত সহজাত বাসনা পূরণার্থে এমন কিছু পোশাকের ব্যবহার এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বিবাহ বহির্ভূত ক্ষেত্রে সাজসজ্জার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ, এ দুইয়ের মাঝে বিস্তর তফাত রয়েছে। প্রথমোক্ত বৈধ বিষয় থেকে অধিকাংশ মানুষই বিমুখ, ভ্রুক্ষেপও করে না।

যাইহোক, এ সবকিছুর জন্য দায়ী মূলত আমরা ভোক্তারাই। কারণ, আমরাই এ সকল মিডিয়াকে বরণ করি, এগুলো নিয়ে মেতে থাকি, এগুলোতে লেখালিখি করি, যোগাযোগ রাখি এবং মেইল পাঠাই। যদি আমরা আমাদের মূল্যবোধ, দ্বীন ও স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোকে বয়কট করি, তবে মিডিয়াসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের জন্য উপযুক্ত বিষয়গুলো প্রচার করতে আগ্রহী হবে।

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই নবি ﷺ সর্বদা এমন শালীনতা রক্ষা করে চলতেন, তাঁকে কখনোই পোশাকহীন দেখা যায়নি। এমনকী সব সময় যে আশঙ্কায় থাকতেন, সেটাই যখন তাঁর সাথে ঘটতে গেল, তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন—যেন যতটুকু সম্ভব লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা যায়। অথচ এমন রাসূলের উম্মত দাবিদার—যারা কিনা তাঁর সাথে হাশর হওয়ার ইচ্ছা লালন করে, তাঁর 'হাউজ' থেকে পান করতে চায় এবং কিয়ামতের দিন তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চায়, তারা সৎপথ ও অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাঁর প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধে যায়। ফলত, তারা মানুষের লজ্জাস্থান দেখে বিনোদন করার মতো ঘৃণ্য কাজ পর্যন্ত করে ফেলে।

নিরাপদ নগরী

প্রথম ও শেষ ঘর

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘বাস্তবতা এই, মানুষের (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তা সেটি—যা মক্কায় অবস্থিত। (এবং) তৈরির সময় থেকেই সেটি বরকতময় এবং সমগ্র জগতের মানুষের জন্য হিদায়াতের উপায়। তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি, মাকামে ইবরাহিমের। যে তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের ওপর আল্লাহর জন্য এ ঘরে হজ করা ফরজ। কেউ এটা অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষ হতে অমুখাপেক্ষী।’ সূরা আলে ইমরান : ৯৬-৯৭

নিঃসন্দেহেই আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা পছন্দ করেন। আর তিনি চেয়েছেন, এই নিরাপদ নগরীই হোক মানুষের মিলনস্থল এবং শান্তির আবাস। পৃথিবী বুকে তাঁর চূড়ান্ত মনোনীত ঘর হোক এখানেই। রব্বে কারিমের কাছে এটি যে পবিত্রতম, পরম ভালোবাসার এক স্থান! তাই তো তাঁর ঘোষণা—

> ‘এটিই হবে পৃথিবীর তীর্থস্থান। মানুষ এখানে হজ করবে, উমরা করবে, অহর্নিশি নামাজ আদায় করবে এরই অভিমুখী হয়ে। সর্বোপরি এটিই হবে সর্বশেষ রিসালাতের উপযুক্ত স্থান; যেখানে যুগে যুগে নবি-রাসূলগণ হজ করেছেন, সায়ি করেছেন এবং তালবিয়া পাঠ করেছেন একক সত্তা, পরাক্রমশালী আল্লাহর নামে...’

এটাই তো সেই উৎকৃষ্ট স্থান—যা সাত আসমানের ওপর হতে আরশে আজিমের সর্দার কর্তৃক মনোনীত। আর এই মহিমান্তিত ভূখণ্ড, এই সুপ্রাচীন ঘর, এই নিরাপদ নগরী—এসব তো সর্বশেষ নবুয়তের একান্ত নিকেতন...

সূরা তিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডুমুর ও জয়তুনের শপথ করেছেন। অতঃপর, শপথ করেছেন সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের। এরপর শপথ করেছেন এই নিরাপদ নগরীর। লক্ষণীয়, আল্লাহ তায়ালার এই শপথগুলোর শুরুতে রয়েছে ডুমুর ও জয়তুন। আর ফল দুটি ইঙ্গিত বহন করে এগুলোর উৎপত্তিস্থল শাম ও ফিলিস্তিনের, যেখানে নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ইবরাহিম ﷺ, ইসহাক ﷺ, ইয়াকুব ﷺ এবং মরিয়ম পুত্র ঈসা ﷺ। পরবর্তী শপথ হলো সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের নামে—যেখানে মুসা ﷺ আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথা বলেছেন।

সর্বশেষে শপথ করা হয়েছে এই নিরাপদ নগরীর নামে, যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তি ধারা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী শপথগুলো وهذا البلد الأمين তথা এই নিরাপদ নগরীর শপথের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে স্পষ্ট করে দেয়। স্পষ্টতার মাত্রা আরও বেড়ে যায় সূরা বালাদের একটি আয়াত খেয়াল করলে—

> ‘এবং আপনি এ নগরের অধিবাসী...’ সূরা বালাদ : ২

রাসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

> ‘আপনি এ নগরীর অধিবাসী। আপনি এখানেই থাকেন। আপনার চারপাশটা আপনি নিজ চোখেই দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন।’

তাই এ নগরী কোনো অচীনপুর নয়; এটি আল্লাহ কর্তৃক বিশেষিত ও নামকরণকৃত এক পবিত্র ভূখণ্ড, পৃথিবীর বুকের তিলকরূপে যেটি আজও অতুল শোভা ছড়াচ্ছে। ধরিত্রীর কেন্দ্র, ঐশী বাণীর উর্বর ভূমি।

নবি করিম ﷺ ইরশাদ করেন—

> ‘নিঃসন্দেহে ইসলাম সূচনাতে ছিল নিতান্তই অপরিচিত এক ধর্ম। অচিরেই ইসলাম তার সূচনাতেই ফিরে যাবে। গর্তে আশ্রিত সর্পের ন্যায় দুই মসজিদের মাঝেই ইসলাম আশ্রিত হবে।’ সহিহ মুসলিম : ১৪৬

অর্থাৎ কাবা শরিফ ও মসজিদে নববিই হবে কিয়ামতের প্রাক্কালে ইসলামের উর্বর ভূমি ও আশ্রয়কেন্দ্র। বোঝা গেল, নিরাপদ নগরী মূলত এই নগরী। নিরাপত্তা এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা এ নগরী রক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন। চতুর্দিকে যদিও হাজারো বিপদ কিলবিল করে, এ নগরী, এ শহর প্রতিটি মুহূর্তে তার সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ছায়া প্রদান করে। জাহেলি যুগে কাবা প্রাঙ্গনে যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতার হত্যাকারীকেও দেখত, তবুও সে প্রতিশোধ গ্রহণ বা হুমকি-ধমকির নিমিত্তে তেড়ে আসত না। যুগ যুগ ধরে কাবা শরিফ আল্লাহর কৃপায় মানুষের মিলনস্থল ও শান্তি-নিকেতন হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

এ গৃহের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো, এখানে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহিম'। একটি পাথরে জাতির পিতা ইবরাহিম ﷺ-এর পদচিহ্ন, যা আজও কাবা পুনর্নির্মাণে তাঁর শেষ ঘাম বিন্দুটুকুর সার্থকতা বহন করে চলেছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আবু তালিব বলেছিলেন—

'ইবরাহিমের নগ্নপদের ছোঁয়া,
শক্ত পাথর সিক্ত করে, কাঠিন্য সব খোয়া...'

তা ছাড়া পুরো 'হারাম' এলাকাটিকেও মাকামে ইবরাহিম বলা যেতে পারে। এতে দুই অর্থের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই।

রব্বে কারিমের অমোঘ প্রতিশ্রুতি, এই নগরী হবে প্রিয় নবির তরে সর্বশেষ বিজিত নগরী। ফলত, বিজিত হয় এ নিরাপদ নগরী। ফিরে আসে তার নির্মল মুক্তাঙ্গনে। বিলীন হয় তার পবিত্র ঘরকে কেন্দ্র করে চর্চিত সকল জাহেলি নীতির প্রভাব, পশ্চাৎপদতা ও অংশীদারিতার পঙ্কিল ছাপ। জাহেলি যুগের সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে উড্ডীন হলো তাওহিদের বিজয় নিশান। তাকওয়া ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের আর কোনো মাপকাঠি রইল না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়

এ পবিত্র নগরী যখন উন্মুক্ত হয় এবং সমগ্র উপদ্বীপে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশে সৃষ্টি হয়, এমন সময় রাসূলের নিকট ওহি আসে—

> 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল।' সূরা নাসর : ১-৪

ইতঃপূর্বে নবি করিম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে, আনত শিরে। কেননা, তিনি কোনো বাদশা নন; তিনি তো আল্লাহর অনুগত দাস ও রাসূল। অতঃপর ঘোষণা এলো—'আল্লাহর সাহায্য এলো।' অর্থাৎ কোনো মানুষের সাহায্য নয়। এ ঘোষণা আমাদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়—'বিধান একমাত্র আল্লাহর, সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে।' এ দাবি যুগে যুগে প্রেরিত সমস্ত নবি-রাসূলের দাবিকে আবারও নবায়ন করে। 'আল্লাহর সাহায্য' দুটি মাত্র শব্দ, কিন্তু কি যে ভারী!

এর পরপর সংযুক্ত হয়েছে 'ফাতহ' তথা বিজয়। এ বিজয় মূলত মক্কা বিজয়। ব্যাপারটি এমন নয়, আল্লাহর সাহায্য কেবল মক্কা বিজয়ের মাঝেই সীমিত। এটি বরং সফলতা সম্পাদনের একটি সুদীর্ঘ ধারা—যা যুদ্ধের ময়দানের বাইরেও পরিব্যাপ্ত। ক্ষেত্রবিশেষে তা এমন এক পরিপূর্ণ মানবিক প্রয়াস—যা রাসূলকে উত্তম পন্থায় দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনায়, উপযুক্ত শব্দ চয়নে, প্রজ্ঞাসংবলিত ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানে এবং প্রয়োজনে শক্তিমত্তা প্রদর্শনে সহায়তা করেছে। (আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।)

চূড়ান্ত বিজয়...

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় চলে আসার ঘোষণার পর রাসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘আপনি মানুষদের দেখবেন, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে...’

এখানে মোটা দাগে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো—সাধারণত যুদ্ধের পর অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দারা বিজয়ী দলের প্রতি অন্তরে ক্রোধ লালন করে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর দেখা গেল, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে—যা আয়াতেও ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, মানুষের সম্পদ দখল করা এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অধিবাসীদের স্বীয় বাড়িঘর ও সহায়-সম্পত্তি স্ব-স্ব মালিকানায় বহাল রাখেন। বেশি অবাক করার মতো বিষয়, যখন রাসূলকে বলা হলো—‘আপনি কি মক্কায় আপনার স্বীয় ঘরে অবস্থান করবেন?’ রাসূল ﷺ বলেন—‘আকিল কি আমাদের জন্য কোনো ভিটে-বাড়ি রেখেছে (আকিল ছিল আবু তালিবের উত্তরাধিকারী)?’

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে বহু বছর পূর্বে কেড়ে নেওয়া বাড়িঘর ও সহায় সম্পত্তি সবই পরিত্যাগ করে শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশায়—যা পার্থিব প্রভাব বিস্তারের মানসে পরিচালিত অভিযানগুলোতে খুবই বিরল এবং এটি ইসলামেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই মক্কা বিজয়ের পর মানুষের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ, এটি রাসূলের দাওয়াতি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মক্কা বিজয়ের ফলে ভীত হয়ে সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে—ব্যাপারটি মোটেও তেমন নয়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটা এতটা সহজ ছিল না। আল্লাহ ভালোই জানেন, অন্যের ওপর প্রভাব খাটানো ও শত্রুতা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কবি মুতানাব্বি যথার্থই বলেছেন—

‘অবিচারের বীজ সবাই হৃদ মাঝারেই রাখে।
দয়ার্দ্রতার অন্তরালে অন্য কারণ থাকে।’

তবুও মুসলমানরা নিজেদের জীবনাচরণ ও কার্যপ্রণালি ওই সকল নেতিবাচক গুণাবলির প্রভাব থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল খোদাভীতি, পূর্ণ ঈমান, নিরবচ্ছিন্ন অবিচলতা, উত্তম ধৈর্য, যথাযথ প্রশিক্ষণ, সর্বোপরি নিরলস প্রচেষ্টা। এর সবকিছুই রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে চর্চা করেছেন, বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে ওই সমস্ত অগ্রগামী সাহাবি, যারা মুসলিম বাহিনীসহ পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিয়েছে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে মানব ইতিহাসের প্রকৃত নেতা। সামান্য ছাগল পালন থেকে ইসলামের ছায়াতলে এসে গুণাবলির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে তাঁরা হয়ে উঠেছে উম্মাহর যোগ্য নেতা, মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। অতএব বোঝা গেল, মক্কা বিজয়ের পর মানুষের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের ফলে রাসূলের দাওয়াতি কার্যক্রম এবং পার্থিব জীবনে মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব ও সত্যের মাঝে বাতিলের অদৃশ্য দেয়ালকে অপসারণ হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ সমাপ্তি

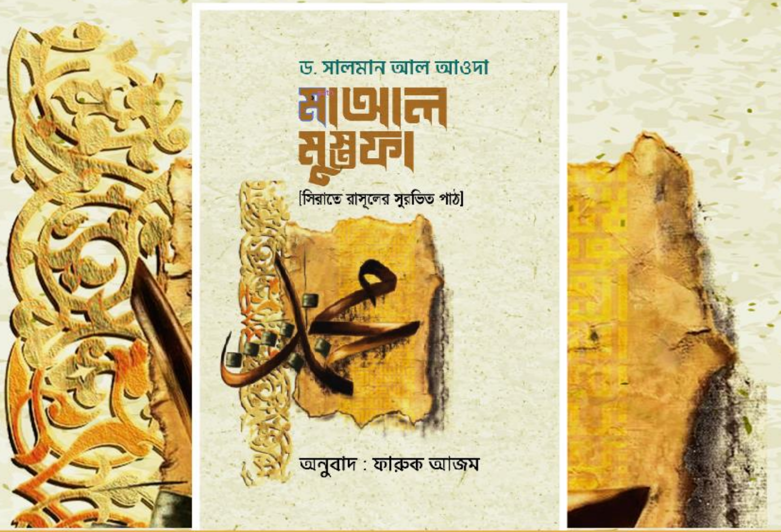
কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল।’ সূরা নাসর : ৩

রাসূল ﷺ-কে সম্বোধিত এ সমস্ত শব্দ ইঙ্গিত করে, রাসূল ﷺ জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো কীভাবে অতিবাহিত করছেন। এতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয় দানের পর রাসূলকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ক্ষমা প্রার্থনা হলো যেকোনো কর্মের শুভ সমাপ্তি। বান্দার নামাজ, হাজির হজ এবং অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব; যিনি দিনে ৭০ বার বা শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি হলো ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে।

এভাবেই ইতি ঘটল সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন; যিনি সমগ্র জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনের পতাকাকে উড্ডীন করার সংগ্রামে। অবশেষে মহান রবের নিকট পাড়ি জমান তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে। প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর লাখো-কোটি দরুদ ও সালাম...

সমাপ্ত



নবিজির জীবনী আমাদের কাছে উন্মুক্ত বই। সেখান থেকে পৃষ্ঠা উলটিয়ে যা ইচ্ছে আমরা পড়তে পারি, শিখতে পারি। প্রতিটি অধ্যায় মণি-মুক্তোয় ভরপুর।

পৃথিবীর সকল সেলিব্রেটি অন্তত কিছু না কিছু 'একান্ত ব্যক্তিগত' বলে গোপন করে। কিন্তু দেখুন না আমাদের নবিজিকে; সবকিছুই তিনি উন্মুক্ত করেছেন উম্মতের জন্য। নবিজির বহির্জীবন নিয়ে বলেছেন সাহাবিগণ, ঘরের জীবন নিয়ে বলেছেন উম্মুল মুমিনিন। তাঁরা নবিজির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছেন এবং সেগুলো দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বাবা-মা কিংবা শিক্ষকের চেয়েও নবিজিকে বেশি জানি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের চেয়েও নবিজিকে বেশি উপলব্ধি করতে পারি এবং ভালোবাসি। আমাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু 'উসওয়াতুন হাসানা' প্রিয় নবিজি।

'মাআল মুস্তফা' গ্রন্থে আমরা নবিজিকে আরেকবার জীবনের সাথে মিলিয়ে নেব, তাঁর জীবন থেকে পাথেয় কুড়িয়ে নেব ইনশাআল্লাহ।

9 789848 254943

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
www.guardianpubs.com

cover design : Hashem Ali 01855786470